



XvKv vekje`vj tq ucGBP.ww wmwj vtfi Rb` Dc`ucZ Mtel Yv Awfmx`f©

Av_-mvgmRK Ae`vi Dbqtb ga`côP`i gynyj g brix (610-1258 uLôvã)

[MIDDLE EASTERN MUSLIM WOMEN IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (610 UP TO 1258 AC)]

ZËyeavqK

Aa`vcK W. tgrt gmx b DÌ xb ugqv

dvi m fvl v I mwnZ` uefvM

XvKv vekje`vj q

ucGBP.ww Mtel K

dvZgv Bqvmgxb

dvi m fvl v I mwnZ` uefvM

tiR: 47/2014-15

XvKv vekje`vj q

wtmç†, 2019



XvKv uekpe`vj tq ucGBP.ww wVMj vtfi Rb" Dc`wcz Mtel Yv Awfm>`f©

Av_-fivgwrK Ae`vi Dbqtb ga`cP`i gyvj g brix (610-1258 wLbā)

[MIDDLE EASTERN MUSLIM WOMEN IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (610 UP TO 1258 AC)]

ucGBP.ww Mtel K

dvZgv Bqvmgxb

tiR: 47/2014-15

dvi m fvlv I mwnZ" wefvM

XvKv uekpe`vj q

wfm, 2019

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন (১৯৪৭-১৯৭৫) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (1947 UP TO 1975 AC) (MIDDLE EASTERN MUSLIM WOMEN IN

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন (১৯৪৭-১৯৭৫) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন (১৯৪৭-১৯৭৫) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন (১৯৪৭-১৯৭৫) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(W. tgrt ggrmxb D'ixb ugqv)

মুসলিম নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন

I

আইসিও, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন

KZÁZV - Kvi

c0tgB meRw³gub Avj unZiqjvi c0Z Amxg KZÁZv Ávcb KiuQ hvi ingZ I Kiáviq Avig MtelYvKg00 m=úbæKi±Z
mýg ntq0Q| Avi `if I mivj vg tck KiuQ meK00 gnivgbe nhiZ ggv=š (miv).-Gi c0Z hvi AbvitiYi gva`tgBAvgv`i
Rxe±bi Kj`iY ubwZ| eZ0v MtelYvKg00 Avgvi `xN00`±bi ubi ewQbaMtelYv I Aa`q±bi dmj |

Avig KZÁ Avgvi cig k0xq ucZv Rbve tgv: eRj jv nK tRvqví0 I gvZv Rvnbvrv LvZb Gi c0Z hvi v Avgv±K c0_exi
Avtjv t`uL.tq±Qb I t`m-Fvtj vevmivq c0Zcvj bmn tj Lvcor ukwL.tq±Qb| we±KI Z: Avgvi t`mgqv gvtqi GKvšB`Qv±ZB Avig
D`PZi MtelYvKg00Zx ntq0Qj vg| ucZv-gvZvi mn±hMvZv I Ab±c0Yv Avgvi G Kv±Ri ucQ±b tbc`_`uqvkvj uQ±jv|
Avig Zv`i cvi±j švKK Rxe±bi kvšKvgbv KiuQ|

Avgvi ucGBP.uW MtelYvKg00ZÉyavb Kti±Qb divim fiv I mwnZ` wefv±Mi Aa`vcK Avgvi cig k0xq ukýK
W. tgv± ggvmb DÍxb ugvv hvi m`q ub±`Rbvax±b Ges mgvMk ZÉyav±b Avgvi GB MtelYvKg00 cvi±Pv±j Z
ntq±Q| Avtj uPZ mg±qi bvi±`i Kv±h±j x Abv±Uvb n±Z`i i±Kti MtelYvi uk±ivbvg uba±Y, uel qe`jveY`m I
Zv c0Yq±b meB Zvi m±Pv±šZcivg±k0m=úban±q±Q|

uZvb Aa`vcbvi evB±i uel fbaGKv±WvgK I RvZvq ch±q±i bvbvb , i±ZcY00`Zvi gta`I
Avgvi Awfm`±fP cyLvbv±L ch±y±Yi gva`tg Gi mstkvab, mst±hRbcwi gvR0 I Kti Avgv±K Abv±WYZ Kti±Qb
etj B Avgvi c±y MtelYv K±gP mgv±B I Awfm` f0Pbv m±e±ntq±Q| Avig Zui c0Z Mfvi k0v I KZÁZv c0Kv±k
KiuQ|

Avgvi GKgví ávZv Rbve Rvwn`jv nK tRvqví0 Avgv±K MtelYv Kg00mgv±B Ki±Z D0y Kti±b| Zui mKj
m±Pv±šZ civgk0 c`ub±`Rbv Avgvi cvi±_q n±q`vKte|

XivKv nekpe`'ij tqi Bmj vtgi BvZnm I ms`wZ. wefvMmi ukjK Aa'vcK Rbie W. Ave`j emQi m'iti i cOZ Avig
wekI fivte KZAZv cKvk KiIQ| Zui AbjcoYv I mnthwMZv AvgtK MtelYv Kg^muv`tb Abg^uYZ KtiIQtv|
ucGBP. wW MtelYv Kg^muv`b KiZ wMtg XivKv nekpe`'ij tqi ubqgubvix Avig 00c0Pxb civi m`mf`Zvq bvi xi Ae`v00 Ges 00Av -
0vgnRK Ae`vi Dbqtb ga`c0P`i wek0 ggnij g bvi x (610-1258 wL0v0)00 ukjivbtg `w c0U Dc`vc0bi gva`tg `w tmigbvi
KtiIQ| G tmigbvi `tj vi AvqvRbm Avgi MtelYv Kg^muv`tbi mKj tytI wefvMmi mKj ukjK Zv`i mPvSZ civgk⁹
mweR mnthwMZv`vb KtiIQb| ZvB wefvMiq m`snbZ c0³b I eZ0vb tPqvig`vb h_vutg Rbie Aa'vcK W. Avay mejLv I
Aa'vcK W. tgit Avej Kij vg mi Kvi mn Aa'vcK W. tK. Gg. mibDj Bmj vg Lv, Aa'vcKW. Zivi K wRqvDi i ngvb ubqvRx,
Aa'vcK W. tgnv`\$ evniDvib, W. Avegmgvtt Awid vej m, Rbie tgnv`\$ Avnmibj nix, Rbietgn`x nimb, Aa'vcK W.
Kjmg Avej evkvi gRg`vi mn wefvMiqKgRZPI Awdm :-vde,`mn mKtj i KtQ Avig KZAZvctkqAveX|

GQvovI mnKg^e, eUzevUe, AvEjq-`Rtbi hviv AvgtK c0qvRbxq civgk0I mnthwMZv`vbi gva`tg G
MtelYv Kg^mmgvBtZ AvgtK DrmwnZ KtiIQb. Zv`i mKtj i cOZ iBtjv Avgi Avshik KZAZv| GZ0`ZixZ
XivKv nekpe`'ij q jvBteix, Rvni/zi bMi nekpe`'ij q jvBteix, DBtgb di DBtgb jvBteix, BvDqv b'vkbvj
jvBteixZ MtelYvi weItq c0qvRbxq Z`-DcvE msM0 KiZ wMtg tmLvKvi jvBteixqvbm hviv AvgtK
meftytI c0qvRbxq mnthwMZv c0vb KtiIQb, Zv`i mKtj i ubKtU Avig KZAZvctkKv KiIQ|

gnvb m0KZPAvgvi G k0tK Kej Kiab| Avgi G MtelYv Kg^evsjv fvlvfvlx mKj MtelK
I cvKef`i we`gnI DcKviti Avmtj Avig Avgi G k0 mv_R ntqtQ etj gtb Kitev|

kã mstýc

<i>Aa'v.</i>	:	<i>Aa'vcK</i>
<i>Abj</i>	:	<i>Abgv`</i>
<i>Av.</i>	:	<i>Avj vBvn I qv mvj ug</i>
<i>L.</i>	:	<i>LÐ</i>
<i>ML^a</i>	:	<i>ML^a÷vã</i>
<i>W.</i>	:	<i>W±i (wGBP.wW)</i>
<i>Avie.</i>	:	<i>Avieflê</i>
<i>`^a</i>	:	<i>`êe"</i>
<i>C_r</i>	:	<i>côv</i>
<i>e.</i>	:	<i>e½vã</i>
<i>gvI</i>	:	<i>gvI j vbv</i>
<i>gy/gjvt</i>	:	<i>gyjv±\$</i>
<i>mv.</i>	:	<i>mvj uj wû Avj vBvn I qv mvj ug</i>
<i>g_r</i>	:	<i>gZž</i>
<i>in.</i>	:	<i>ingvZžwvn Avj vBvn</i>
<i>iv.</i>	:	<i>iv`qvj wû Zvqvj v Avbû</i>
<i>iv.</i>	:	<i>iv`qvj wû Zvqvj v Avbnv</i>
<i>m±úv.</i>	:	<i>m±úvw`Z</i>
<i>vn.</i>	:	<i>vnRwi mvj</i>
	:	
Vol.	:	Volume
Ed.	:	Edited
Dr.	:	Doctor (Ph.d)
p.	:	Page
U.S.A	:	United states of America
U.K	:	United kingdom

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র.....	iii
যোষণাপত্র.....	iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....	v-vi
শব্দ সংক্ষেপ.....	vii
সূচিপত্র.....	viii
সার সংক্ষেপ.....	১
ভূমিকা.....	৫
প্রথম অধ্যায়: মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামিক যুগের নারী.....	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামের ইতিহাসে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের একটি পর্যালোচনা.....	৫৬
তৃতীয় অধ্যায়: হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খিলাফত যুগের নারীর অবস্থান.....	৭৯
চতুর্থ অধ্যায় : উমাইয়াদ ও আব্বাসিদ শাসনামলে নারীর মূল্যায়ন.....	১৮৩
পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার.....	২০২
প্রাপ্তি.....	২০৬

সার সংক্ষেপ

ইতিহাসের এক চরম সন্ধিক্ষেপে মানুষ যখন সামাজিক অসাম্য, জাতিভেদ প্রথা, হিংসা-বিদ্বেষ, দাস প্রথা, যুগের পর যুগ ধরে চলা যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি হতে মুক্তির পথ অন্বেষণ করছিল, তখন তাদের সাথে সমাজের অর্ধাংশ নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, যাবতীয় প্রচেষ্টা দ্বারা তাদের সেই অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করে।

৬১০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়তকালীন সময় হতে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দব্যাপী আরব, সিরিয়া, খোরাসান, মিশর, পারস্য, ইয়েমেনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীরা সে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদের সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তা ছিলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানবতার ইতিহাসে মধ্যপ্রাচ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রচারিত নীতি আদর্শের কারণে মানুষের কাজ করার বিস্তীর্ণতম সুযোগ সৃষ্টি হয়। (স্যার আর্নল্ড ও গিলম, ২০০০, ৩০১) হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ভাষায়, “ভবিষ্যতে অনারবের উপর আরবের ও কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না।” (আরাবি, ১৯৩৪, ৮ম খণ্ড, ২৩৯) বিদায় হজ্জের বাণীতে তার বৈষম্য নির্মূলের এ ঘোষণায় বিশ্ববাসী অনুপ্রাণিত হয়। (Ibn Ishhaq, 1981 : 102 ; তাহের, ২০০৮ : ১০৭)

ইসলাম প্রবর্তিত এ সকল বিধিবদ্ধ বিধান প্রতিষ্ঠা প্রথমে আরবের মক্কা হতে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা তদানীন্তন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকাসহ বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ নীতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। নারী জাতিও সমসাময়িক অন্যান্য সমাজব্যবস্থার চাইতে অধিকতর মুক্তির স্বাদ-আস্বাদন ও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের প্রয়াস পায়।

মানুষের চরিত্রগত পরিবর্তন, আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ, সহনশীলতা শিক্ষাদান, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা প্রসার, কুসংস্কারের অপনোদন, নারীর মর্যাদা রক্ষায় ভূমিকা পালন, সুখি-সুন্দর দাম্পত্য জীবন উপভোগ, রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাবিধান, শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহতকরণে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান নিয়ে আহতদের সেবা গুশ্রষা, কোরআন-হাদিস চর্চা ও প্রচার,

শালীনতার চর্চা ও প্রয়োগ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সমাজ গঠন ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধায়নে হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আয়শা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), মিশরের রাণী শাজারুদ্দোর প্রমুখ নারীগণ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, নব প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কোন কোন দুর্বলতার কারণে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর বেদুইন আরবগণের স্বভাব লুটতরাজ, দস্যুবৃত্তি, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইসলামের অগ্রযাত্রায় স্বল্পসময়ের জন্য হলেও তাদের নিজেদের অগোচরেই আবার বিভেদের জ্বালে জড়িয়ে গিয়েছিল। ইসলামের পটপরিবর্তনের সেই মহাসন্ধিক্ষণে হযরত আয়শা (রা.)-এর বিচক্ষণতা ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তের কারণে সামাজিক সেই অবক্ষয় থেকে নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ নতুনপথের সন্ধান পায়। এভাবে তখনকার অত্যন্ত প্রবল অনুভূতিপ্রবণ, মেধাবী, মহিয়সী নারীগণ মধ্যপ্রাচ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে অসামান্য অবদান রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাদের সেই গৃহিত কর্মপন্থা আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নে এই বিংশ শতাব্দীতেও নারী অধিকার রক্ষা, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি হিসেবে যে কোন সমাজ-রাষ্ট্রের উন্নতিতে মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মান ও অগ্রবর্তীকরণের ক্ষেত্রে তাদের সে সকল গৃহীত নীতি মালা তুলে ধরানি আমার গবেষণা কর্মের লক্ষ্য।

Abstract

In the history when people had been searching for the way of freedom from social inequality, differences in cast system, jealousy–hatred, slavery system, war and battle continuing for decade after decade came the savior of humanity, Prophet Muhammad (sw) with his knowledge, wisdom and bravery.

In 610 AC Hazrat Muhammad (sw), from the time of his prophecy throughout 1258 AC the women of Arab, Syria, khorasan, Egypt, Persia, Yemen along with different parts of the Middle east were struggling with their heart and soul to establish humanitarian society. In the version of Hazrat Muhammad (s), “there will be no superiority of Arab on non Arab, white on black”. The people of the world

were inspired by the declaration of eliminating discrimination in his farewell speech at Hajj. (Ibn Ishhaq's, 1981 : 102 ; Taher, 2008 : 107)

These Rules of Law inaugurated by Islam were established first in Mecca of Arab and gradually it spread out in different parts of Arab and then the world. As result of it, the social fundamental of the Middle East had radically changed the scenario of different social systems prevailed in different parts of the world. Women too received more taste of freedom than other contemporary social system and endeavor to prove their qualification.

Change in human character, inspiring people to the unification of Allah, teaching on tolerance, economic prosperity, expansion of education, elimination of superstition, play role in keeping honor of women, enjoy happy and beautiful conjugal life, ensuring safety of empire politically, joint participation in protecting from the attack of the enemies, serve the wounded persons in the field of war, exercise and publicize holy Quran and Hadith, practice and application of modesty etc, in all case, to form society and to affluence economy of the country, Hazrat Khadija (R.), Hazrat Ayesha (R.), Hazrat Hafsha (R.), the queen of Egypt Shajarudhor other than that women had played a huge role.

It can be said, in this regard, that in newly established governing system. Due to some weakness of the administration, after the death of Hazrat Muhammad (sm), repetitions of looting nature of Bedouin Arabs, piracy, jealousy and hatred have taken place.

In progress of Islam, by their own ignorance they got involved in disintegration again even for the small time. In the changing scenario of Islam, in that great momentum the newly established Muslim state and society had found new way

from decadency by virtue of prudence and visionary decision of Hazrat Ayesha (R.). Thus, very sensitive, meritorious, great women were able to contribute extraordinarily in changing economic socio conditions of Middle East. In discussion, reviewing and implementing their adopted action strategy can play a great role in developing any society in this 21th Century as a moderator power to establish woman right protection, honour and dignity. Highlighting their adopted principles to establish social system and in case of progress is my main objective of my research work.

ভূমিকা

মানব সভ্যতার সূচনাপর্ব হতে জীবনসংগ্রামে, সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়নে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি মানব সমাজের সর্বক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। মানব সমাজের অর্ধাংশ হওয়াতে নারীর সহযোগিতা ছাড়া একা পুরুষের পক্ষে সভ্যতার চাকা সচল রাখা কোনো কালেই সম্ভব হয়নি। কিন্তু নারীরা অসম্মানিত হলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। কন্যা শিশুর প্রতি নেতিবাচক আচরণ সবসময়েই চলছে। এজন্য সমাজে নারীকে প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে তাদের যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে মধ্যপ্রাচ্যে একদল মানবতাবাদী নারী-পুরুষ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। বিশেষত নারীরা (৬১০-১২৫৮ খ্রি.) যেভাবে তৎপর হন তা ছিলো অসাধারণ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) (৬১০-৬৩২ খ্রি.), খোলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.), উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খ্রি.), আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ও উত্তর আফ্রিকার ফাতিমীয় খিলাফত (৯০৯-১১৭১ খ্রি.) ইত্যাদি শাসনামলের মহান শাসকদের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা-চিন্তার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় নারীরা মানবজীবনের বিভিন্ন দিকে দক্ষতা অর্জন ও বাস্তবে তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকের নারীরা আরও প্রসারিত ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করছেন। কবির ভাষায়,

“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।” (সঙ্গিতা, কাজী নজরুল ইসলাম)

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নারীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। মানবজীবনে কাজের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও সুবিশাল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ উত্তরণের পর বিশ্বে আনুমানিক নয় হাজার খ্রি. পূর্বাঙ্গে মেসোপটেমিয়া^১ (Burns & Ralph, 1961 : 26) প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, পূর্ব তুরস্ক ও ইরাক, চীন, গ্রিস প্রভৃতি অঞ্চলে মানবজাতি বসতি স্থাপন করে ক্রমান্বয়ে সমাজ ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। (হাবিব, ২০১৫ : ৪০) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নারী সমাজের বলিষ্ঠ পদচারণা ছিলো লক্ষণীয়।

১. প্রাচীনকালে সুদূর মিশর হতে পারস্য উপসাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে মেসোপটেমিয়া বলা হতো। মেসোপটেমিয়া গ্রিক শব্দ যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান। এ নদী দুটির নাম ছিলো টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাতে) এ অঞ্চল দেখতে ছিলো উর্বর অর্ধচন্দ্রিকা বা অর্ধচাঁদের ন্যায়। আনুমানিক ৪০০০ খ্রি: পূর্বাঙ্গে এ এলাকায় সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

মানবসমাজে জীবন-জীবিকার প্রয়োজন পূরণে নারীরাই প্রথমে এগিয়ে আসে। তাঁদের গৃহস্থালির অভিজ্ঞতা হতেই আদি সমাজের উন্নয়নের সূচনাপর্ব শুরু হয়। তাদের দ্বারা 'প্লিস্টোসিন'^২(হাবিব, ২০১৫ : ৪০) যুগে মানবসমাজে পশুমাংসের সাথে ভোজ্যতেল ও তৃণ মশলাদি যোগে নারীগণ কর্তৃক রান্না করা খাবারের প্রচলন ঘটে। এর পরে আনুমানিক ৮০০০ থেকে ৬০০০ খ্রি: পূর্বাঙ্গে 'নিওলিথিক'^৩ (আমজাদ, ২০০৭ : ৫০-৫১) বা নবোপলীয় যুগে কৃষিকাজ বা ফসল উৎপাদনে নারীরা প্রথমে এগিয়ে আসে।

নারীরা সন্তান প্রতিপালন, ঘর সামলানো, গোত্র প্রধান, আন্তঃগোত্রীয় যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি তারা শত্রুর বিরুদ্ধে পুরুষের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতেও পিছু হটেনি। ঐ সময়ে নারীর শক্তিমত্তা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না। আদিম সমাজে খ্রি: পূ: ৪০০০ খ্রিস্ট পূর্বাঙ্গে মহিলারা ভারী বস্তু বহন করা হতে শুরু করে বিনোদনের জন্য নৃত্য-গীত করাসহ নিজেদের ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি তৈরী ও নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টিতেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো।

উইল ডুরান্টের ভাষায়, “মাতৃশাসিত এ সমাজে নারীরা শাসন, বিচার, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, খাদ্যশস্য ও কৃষি উৎপাদন, পোশাক তৈরীসহ সকল কাজ করতো আর পুরুষরা শিকার, ফল সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাজ করতো।” (Durant, 1942 : 32-34)

পরবর্তীতে কাল পরিক্রমায় কৃষিতে গবাদিপশুর মাধ্যমে চাষাবাদ শুরু হলে সমাজে পুরুষের আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। (হালিম ও নুরুল্লাহর, ২০০৮ : ৫৩) কিন্তু নারীর কাজ থেমে থাকেনি। তাঁরা সাংসারিক দায়িত্ব পালনের বাইরেও পশুপালনসহ শিল্পক্ষেত্রে, রাষ্ট্রে বিশেষ অবদান রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় যুগে যুগে জনকল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠায়, এমনকি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও সীমাহীন আত্মত্যাগ ও কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রসরতা নারীরা চলমান রাখে।

২. প্লিস্টোসিন (Pleistocene) যুগ বলতে আজ হতে আনুমানিক কুড়ি লাখ বছর পূর্বে বিশ্বের এমন একটি প্রাকৃতিক অবস্থা বোঝায় যখন পৃথিবীতে মানববসতি গড়ে উঠেনি। এ যুগে অনবরত তুষারপাত ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী জীববসতির অনুকূল পরিবেশ তৈরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

৩. নিওলিথিক বা নবোপলীয় যুগ বলতে বোঝায় এমন একটি কাল, যখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বপ্রথম মানববসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। আনুমানিক দশ হাজার বছর পূর্বের কালকে নিওলিথিক বা নবোপলীয় যুগ বলে।

কিছু নারীরা সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হতো। অপবিত্র, অশুচি, সকল দুর্ভাগ্যের জননী আখ্যা দিয়ে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের মাধ্যমে সকল সমাজ-সভ্যতায় নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হতো। (শিকদার, ২০০৪ : ৩৫) এরূপ চরম হতাশা-বঞ্চনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রচণ্ড অভাব নিয়ে গড়ে ওঠা সে সমাজব্যবস্থায় বসবাস করেও কিছু নারী তার নিজস্ব উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দ্বারা সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলো। যেমন : আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মিশরের রাণী নেফারতিতি,^৪ (উইকিপিডিয়া, Nefartiti) খ্রি. পূ. ৯ম শতকে এসাইরিয়ান রাণী স্যামুরামেট^৫ (উইকিপিডিয়া, Saumuramate) প্রমুখ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর মেধা ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণতার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়তো। কখনও বা প্রচলিত কুসংস্কার ও অবাধ স্বাধীনতা নারীর জীবনকে অবলুপ্তিত করতো। নারীর প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি এখনো বদলায়নি। ইসলামের আগমনে বিশ্বের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, ন্যায় ও সাম্যের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সকল কূপমন্ডুকতা ও বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙে স্বাধিকার অর্জনের দিকনির্দেশনা খুঁজে পায় এ মতাদর্শে। ভেদাভেদ ও বিভাজনমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার বার্তা নিয়ে খ্রিস্টীয় ৭ম শতকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র মক্কানগরীতে ইসলামের বার্তাবাহক হিসেবে আবির্ভূত হন। (আমীর আলী, ১৯৮৬ : ৮) অথচ বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচলিত রীতি এবং ধর্মীয় নীতি আদর্শেও নারীদেরকে অপাঙক্তেয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এমনকি স্বর্গ বা বেহেশত হতে আদি পিতা আদমকে বিতাড়নের জন্য নারীকে এককভাবে দায়ী করা হতো। ইসলাম ধর্ম নারীকে এ দায়ভার হতে মুক্ত করে। আদম ও হাওয়া, যারা ছিলেন মানবকুলের সর্বপ্রথম মানব-মানবী তাদের বেহেশতে অবস্থানকালীন সময়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেবে তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নি। আল-

৪. নেফারতিতি : রাণী নেফারতিতি (১৩৩০-১৩৭০ খ্রি. পূ.) দুই হাজার খ্রি. পূর্বাব্দে মিশরের তৎকালীন সম্রাট (ফারাওদের) আকহেনাটেনের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ক্ষমতাসালী সম্রাজ্ঞী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পান। সম্রাটের উপর তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব ছিলো। তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

৫. স্যামুরামেট : এসাইরিয়ান রাণী স্যামুরামেট (৮০৮-৭৯২ খ্রি. পূ.) ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৯ম শতকের দিকে ব্যাবিলনের শাসক বা সম্রাজ্ঞী। এসাইরিয়ান জাতি আদিতে ছিলো সেমিটিক জাতিভুক্ত। এরা ব্যাবিলনের কাছাকাছি আশুর শহরে প্রথম নিবাস গড়ে তোলে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে যোদ্ধা জাতি হিসেবে মেসোপটেমিয়া এলাকায় ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। তাদের রাণী 'স্যামুরামেট' ছিলেন বিখ্যাত সম্রাট 'আদাদ নিরারি'র (তৃতীয়) মাতা। পরবর্তীতে এই সম্রাটের স্ত্রীও ছিলেন। সম্রাজ্ঞী তাঁর জনহিতৈষী কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, “তোমরা এই বৃক্ষের নিকটবর্তীও হবে না, অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং-৩৫) এভাবে নারীকে মিথ্যা অপবাদ হতে মুক্ত করে তাকে মর্যাদা প্রদান করা হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, “হে মানব সমাজ, আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে পরিণত করেছি, যাতে করে তোমরা একে অন্যের পরিচয় লাভ করতে পার। অবশ্য তোমাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগার।” (সূরা আল-হুজুরাত, ১৩) এমনকি নারীদেরকে পিতা-মাতা, সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তির উত্তরাধিকারেও অংশীদার করা হয়। এমনকি এ সমাজে নারীর সম্পদ পাওয়ার উৎস বেশী রাখা হয়েছে।^৬ যেমন বিবাহে খোরপোষ, দেনমোহর প্রাপ্তি, নারীর নিজস্ব আয় হতে উপার্জিত উৎস। আল-কুরআনের ভাষায়, “পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-৩২) অথচ তাঁর উপর সংসার পরিচালনার ভার বা দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। সাধারণভাবে মুসলিম আইন অনুযায়ী ভরণ-পোষণের অর্থ হলো স্ত্রীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন, “পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করবে। কারণ, আল্লাহতায়ালা তাদের একজনকে অন্যজনের উপর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।” (সূরা নিসা, ৩৪) তাই নারীরা স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা অর্জন করায় তখন থেকে নিজেদের কর্মক্ষেত্রসহ চিন্তা-চেতনা, বিচক্ষণতা দ্বারা অগ্রসর হবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরব হতে সে নব সভ্যতার উত্থান ঘটে। (স্যার আর্নল্ড ও গিলম, ২০০০, ৯৪) মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত অঞ্চল। সঙ্গত কারণেই আমি এ এলাকার প্রতি আগ্রহী হয়েছি। আরবের প্রসিদ্ধ মক্কানগরী মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। মক্কায় পবিত্র কাবাঘরের অবস্থান, সমগ্র আরব ভূখণ্ড এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বহির্বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত।

৬. এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ), আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য ১/২ (অর্ধাংশ)। (এটি পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত উত্তরাধিকারী) মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার পিতা ও মাতা প্রত্যেকেই ওই সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ পাবে, যদি মৃতের পুত্র থাকে। আর যদি মৃতের পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিনভাগের একভাগ। তারপর মৃতের যদি কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয়ভাগের একভাগ যা তোমরা পরিত্যাগ করে যাও। কিন্তু ওসিয়ত ও ঋণ, যা তোমরা করো, তা পরিশোধের পর যদি পিতা-পুত্রহীন মৃত পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক-এর বৈপিত্র্যে এক ভাই বা বোন প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে, আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা কারো অনিষ্ট না করে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, মৃতের ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। এটি আল্লাহর দেয়া বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল। (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১-১২)

(কাউসার, ২০১২ : ১৬ ; হিট্রি, ২০০৯ : ৩৮) বর্তমান বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য বলতে যে সকল অঞ্চলকে বোঝায় প্রাচীনকালেও অনেকটা অনুরূপই ছিলো। এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা বর্তমানে এশিয়া হতে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। আরব লিগের সকল দেশ মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইরান, তুরস্ক ও ইসরাইল এই তিনটা অনারব দেশসহ মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইরাক, সউদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ইয়েমেন নিয়ে বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্য। (কাউসার, ২০১২ : ১৭) প্রাচীনকালে এ এলাকাটির নাম মধ্যপ্রাচ্য ছিলো না। তবে ভূখন্ডের আয়তন ও পরিসীমা মোটামুটি একই ছিলো। প্রাক-ইসলামি যুগে মধ্যপ্রাচ্য বলতে আরব উপদ্বীপ বা মক্কা ও মদিনা, তায়েফ, পারস্য বা ইরান, ইরাক (মেসোপটেমিয়া), সিরিয়া (আস-শ্যাম বা বৃহত্তর সিরিয়া), লেবানন, ইয়েমেন, মিশর, প্যালেস্টাইন, জর্ডান ইত্যাদি অঞ্চলকে বুঝাতো। তবে দেশগুলোর সীমানা বারবার পরিবর্তিত হতো। বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য বা Middle East শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। (জোয়ার্দার, ১৯৭৮ : ২) এ এলাকাটি বাংলাদেশ হতে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলের নারীরা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। মক্কার হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আয়শা (রা.) (জন্ম ৬১৪ খ্রি.), হযরত উম্মে সালমা (রা.), হযরত হাফসা (রা.) (জন্ম ৬০৫ খ্রি.), হযরত উম্মে হাবিবা (রা.), রাসুল (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত আসমা (রা.), হযরত সুমাইয়া (রা.), মদিনার হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা.), হযরত সুফিয়া (রা.), হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার, হযরত ফাতিমা (রা.) এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.), সিরিয়ার হযরত উম্মে আইমান, কুফায় জনপ্রহণকারী ইরানি বংশোদ্ভূত ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর কন্যা হযরত উম্মে হানিফা (জন্ম ৬৯৮ খ্রি.), ইরানের কোম নগরীর বিদূষী নারী হযরত ফাতিমা মাসুমা (জন্ম ৭৯০ খ্রি.), বসরার হযরত রাবেয়া বসরি (মৃত ৮০১ খ্রি.), আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদা (মৃত ৮৩১ খ্রি.), মিশরের রাণী শাজারুদ্দোর (রাজত্বকাল ১২৫০-৫৭ খ্রি.), গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির স্ত্রী প্যালেস্টাইনের ইসমাত-আল-দিন, সেলজুক ঝুমের আমির মালিক শাহের (১০৭২-১০৯২ খ্রি.) ইরানিয় উযির নিজাম-উল-মুলকের স্ত্রী তুরকান খাতুন প্রমুখ ছিলেন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (হিট্রি, ২০০৩ : ২২৩) এদের কেউ কেউ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ায় প্রাণ পর্যন্ত

উৎসর্গ করেছেন। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সামাজিক বৈষম্য ও তথ্যপ্রবাহের অপ্রতুলতার কারণে তাদের এ কর্মতৎপরতার সঠিক মূল্যায়ন যেমন হয়নি, তেমনি সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার ঘাটতি রয়েছে।

সমাজ পরিবর্তনে তাঁদের গৃহীত নীতিমালা ও কর্মপন্থা এবং এ কাজে তাঁদের অনুপ্রেরণা ও সফলতা লাভের পটভূমি আমাকে আন্দোলিত করেছে। আমি বিভিন্ন উৎস হতে তাদের সম্পর্কে পাওয়া নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলি আমার এ গবেষণাকর্মে সন্নিবেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ঘটনাসংশ্লিষ্ট ইতিহাস অনুসন্ধানে আমি গবেষণার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনের কার্যকারণ প্রক্রিয়া ইতিহাসের নিরিখে উপস্থাপন করেছি। যেমন মানুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে দেশান্তর হওয়া বা অভিবাসন, পেশাগত, পারিবারিক কারণ ছাড়াও মতাদর্শগত কারণ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি নানান প্রেক্ষাপটে পুরুষের সাথে নারীদেরকেও কখনও নিজ দেশ হতে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে হয়। এসব যৌক্তিক ও সময়োপযোগী বিষয় যা অতীতকাল হতেই সংঘটিত হয়ে আসছে তা আমার গবেষণাকর্মে বলার চেষ্টা করেছি। অথচ এ ঘটনাবলির সাথে জড়িত নারীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার গৌরবগাথা অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। সে ইতিহাসের যৎসামান্য আমি আমার এ গবেষণা কর্মে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। “আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম নারী (৬১০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)” (Middle Eastern Muslim women in the socio-economic development (610 up to 1258 AC) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ বা গবেষণাকর্মটি আমি আলোচনার সুবিধার্থে ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। এতে অন্তর্ভুক্ত নারীগণের আলোচনা আমি বর্ণমালার অনুপাতে সজ্জিত করিনি বরং তাদের জীবদ্দশায় যে সময়কাল তারা অতিবাহিত করেছিলেন, সেই সময়কাল অনুপাতে সাজিয়েছি। আর বানান রীতির ক্ষেত্রে আমি প্রচলিত বানান রীতির অনুসরণ করেছি। বাংলা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এর বানান রীতি অনুযায়ী আমি আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছি। এর অধ্যায় বিন্যাস হলো

ভূমিকা : বিষয় সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক বক্তব্য ভূমিকাপর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামীয় যুগের নারী

এ অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১ম, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ইরান বা পারস্য, ইয়েমেন ও আরব উপদ্বীপের সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত এই অধ্যায়ে “আইয়ামে জাহিলিয়াহ” বা অন্ধকার যুগ নামে খ্যাত আরবের এই বিশেষ সময়ে নারীর সমস্যাসমূহের উপর গবেষণাধর্মী আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামের ইতিহাসে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের একটি পর্যালোচনা

এই অধ্যায়ে প্রাক-ইসলামীয় যুগের অধঃপতিত অবস্থা হতে নারীরা যেভাবে মুক্তিলাভ করেছিলো, তার একটি বিশদ বিবরণ এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খিলাফত যুগের নারীর অবস্থান

৬১০-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাসূল (সা.) হতে খোলাফায় রাশেদিন যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় আদর্শ প্রচার, সমাজ সংস্কার, ক্রীতদাস প্রথা নির্মূল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যুদ্ধক্ষেত্রে, খলিফা নির্বাচনে, প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতাদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রশমন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অবদান স্থান লাভ করেছে।

চতুর্থ অধ্যায় : উমাইয়াদ ও আব্বাসিদ শাসনামলে নারীর মূল্যায়ণ

৬৬১-১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত উমাইয়া, আব্বাসীয় ও মিশরের ফাতিমীয় শাসনামলে সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংকট মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মহিয়সী নারীগণ যে ভূমিকা পালন করে গেছেন এ অধ্যায়ে তা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালের সমাজ উন্নয়নে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকলে সে সম্পর্কেও যৎসামান্য আলোচনা স্থান পেয়েছে। এর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী ও সমস্যা সমাধানে আশু করণীয় পদক্ষেপসমূহ উপসংহারে বলা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামিক যুগের নারী

পরিচ্ছেদ-১ : প্রাক ইসলামিক যুগে ইরান বা পারস্য সভ্যতায় নারী

পরিচ্ছেদ-২ : প্রাক ইসলামিক যুগে ইয়েমেনে নারী

পরিচ্ছেদ-৩ : প্রাক ইসলামিক যুগে আরব উপদ্বীপে (মক্কা, মদিনা) নারী

মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামি যুগের নারী

প্রাক-ইসলামি যুগে মধ্যপ্রাচ্যে আর্থ-সামাজিকভাবে অনুন্নত ছিলো। এর প্রভাব নারীদের জীবনেও পরিলক্ষিত হয়েছিলো। তবে সার্বিকভাবে নারীরা শোচনীয় ছিলো না। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে ইয়েমেন, তায়েফ, মিশর পারস্যের অধীনে ছিলো। (কাসীর, ২০০৭ : ৪৬৬) গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস বলেন, ইসলাম আবির্ভাবের সময় আরব উপদ্বীপ মোটামুটি স্বাধীন ছিলো। এ জনপদ পার্শ্ববর্তী পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলো না। (হিট্রি, ২০০৯ : ৬২) তখন ইয়েমেন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, আরব এলাকায় খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদি ধর্মের বিস্তার ঘটেছিলো। (হিট্রি, ২০০৯ : ৫৪-৫৫) প্রথমেই তদানীন্তন মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত ইরান বা পারস্য সভ্যতায় নারীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পরিচ্ছেদ-১ : প্রাক ইসলামি যুগে ইরান বা পারস্য সভ্যতায় নারী

প্রাক ইসলামি যুগে মধ্যপ্রাচ্যের পারস্য বা ইরানে আনুমানিক খ্রি. পূর্ব ১৩৬০ হতে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা বিকশিত হয়েছিলো। (Wallbank, Taylor & Baily, 1972 : 372) ১৯৩৫ সালের পর থেকে বিশ্ব মানচিত্রে পারস্য ইরান নামে পরিচিত হতে থাকে। পারস্যে আগত সেমেটিক, ভূমধ্যসাগরীয়, ইন্দো-ইউরোপিয়ান, বৈদিক আর্য (Verdic Aryan), আরমেনিয়ান (আদি দক্ষিণ ইউরেশিয়ার পার্বত্য এলাকা), আল পাইন, প্রোটো নর্ডিক বা ইন্দো-আর্য তুর্কি ইরানি, নিগ্রো ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী ছিলো ইন্দো ইউরোপিয়ান বা 'এরিয়ান'রা। (কাসেম, ১৯৮৫ : ১৩৯) পরবর্তীতে এই 'এরিয়ান' শব্দটি হতে ফারসি ভাষায় 'আরিয়ান' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। ধারণা করা হয়, Iran শব্দটি এসেছে এই Aryan হতে। (Schmitt, 1987 : 684-68 ; Ehsan, 1989 : 56) এ সভ্যতায় নারীর অবস্থা আলোচনা করার পূর্বে এখানকার ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। কেননা এ সভ্যতা, সংস্কৃতি মানব-মানবীর সর্বপ্রাচীন অবস্থা উপস্থাপন করে।

প্রাচীন ইরানের ইতিহাস

উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর ও দক্ষিণে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে আনাতোলিয়া, আয়ারবাইজান ও মিশর আর পূর্বে একেবারে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যপ্রাচ্যের একটি দৃষ্টিনন্দন এলাকা হলো পারস্য। (শাহনেওয়াজ, ২০০৩ : ১৬৬) পারস্য উপসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে খ্রিস্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বর্তমানের পারস্যসহ আরও বিস্তৃত অঞ্চলে পারস্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিলো। (Burns & Ralph, 1961 : 70) তখন বিশ্বে পারসিকদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলো না। এ এলাকার জনগণকে বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী বলা হয়। (Liddell & scott, 1882 : 1205)

প্রাচীন পারস্যের মানুষ, আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৫০,০০০ হাজার বছর পূর্বে বা কারও মতে খ্রিস্টীয় প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক বা ‘প্যালিওথ্যালিক’ যুগ, এর পরের নিওথ্যালিক বা নবোপলীয় যুগ, ক্যালকোলিথিক যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ (খ্রি. পূ. ৫০০০ অব্দ) পেরিয়ে মোটামুটি খ্রি. পূ. ২০০০ অব্দের দিকে লৌহ যুগে প্রবেশ করে। (Burns & Ralph, 1961 : 327 ; দেলোয়ার, সিকদার, ২০০৮ : ২১১ ; আমজাদ, ২০০৭ : ৬০-৬১) আনুমানিক খ্রি. পূ. ৩৫০০-৩০০০ অব্দের দিকে পারস্যবাসী সুমেরীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। (মাহমুদুল, ২০০৬ : ৬৩) সুমেরীয় রাজবংশের পতনের পর প্রাচীন ইরানে ‘ইলাম’ বা ইলামাইট রাজবংশ আধিপত্য বিস্তার করে। প্রাচীন পারস্যের দক্ষিণাঞ্চলের এই ইলামাইট সভ্যতার লোকেরা প্রস্তরগাত্র বা চামড়ার উপরে কিউনিফর্ম^১ (কিলাকৃতি) লিপিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লিখে রাখতো। (Mansoori, 2008 : 245) গ্রিক সভ্যতার ন্যায় এখানেও সম্মানিত নারীদের মূর্তি তৈরীর মাধ্যমে তাঁকে দেবী হিসেবে পূজা করার প্রচলন চালু হয়েছিলো, যা ছিলো সভ্যতার একদম আদিমতম পর্যায়। (Garrison & Root, 1987 : 150)

খ্রি: পূ: ১৩৬৫ থেকে খ্রি: পূ: ১০২০ সালের মধ্যে পশ্চিম পারস্য বা ইরান, পূর্ব আনাতোলিয়া ও ককেশাস এলাকায় ‘এসাইরিয়ান’ জাতি-গোষ্ঠী স্থানীয় পারস্য জাতি-গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

^১ . কিউনিফর্ম এমন একটি লিখন পদ্ধতি যার উদ্ভব ঘটেছিলো মেসোপটেমিয়ায়। প্রথমদিকে মাটির উপর ছবি একে একে অক্ষর ফুটিয়ে তোলা হতো। মাটির উপর লেখা খুব কঠিন ছিলো। এজন্য সূচালো লাঠি বা কাঠির অগ্রভাগ দিয়ে মাটির উপর দাগ দিয়ে অক্ষর ফোঁটানো হতো বলে তা দেখতে গৌজ বা কীলকের ন্যায় দেখতে হতো। পরে তা পারস্যে অনুপ্রবেশ করে। (ফিওদর, ১৯৮৬ : ১০৫)

(শাহনেওয়াজ, ২০০৩ : ৯১) এসাইরিয়ানদের আদি বাসস্থান ছিলো প্রাচীন ‘আশুর’ শহরে, যা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝে গড়ে ওঠা ব্যাবিলনের প্রায় দু’শ মাইল উত্তরে টাইগ্রিস (দজলা) নদীর তীরে অবস্থিত। আদি সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এসাইরিয়ানরা ‘আশুর’-এর আশেপাশে, পরবর্তীতে সমগ্র পারস্যে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালে ইতিহাসে তারা বর্বর জাতি নামে পরিচিতি পায়। (শাহনেওয়াজ : ২০০৩ : ৯১)

ক্রমান্বয়ে এসাইরিয়ানরা ইরাকের ব্যাবিলন সভ্যতা অন্তর্ভুক্ত সমগ্র এলাকা পারস্যের অধীনে নিয়ে আসে। (Burns & Rulph, 1961 : 213) বর্বর এ জাতি ১১০০ খ্রি. পূ. ইকবাতানা দখল করে পরাজিতদের দাসে পরিণত করে। ইকবাতানা ছিলো ইরানের সর্বপ্রাচীন শহর। পরে এসাইরিয়ানরা তেহরানের কাছাকাছি ‘নিনেভাহ’তে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে। পরবর্তীতে আর্য মেদেসরা ৬২২ খ্রি. পূর্বাব্দে ‘নিনেভাহ’ শহর দখল করে এসাইরিয়ানদের হটিয়ে সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। (শাহনেওয়াজ, ২০০৩ : ৯২)

মেদিয়ান সাম্রাজ্য

প্রাচীন পারস্যে খ্রিস্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের পূর্ব পর্যন্ত পারসিকরা যাযাবর অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে তাঁদের ভ্রাম্যমাণ পারসিক, পাহলভী, পার্থিয়ান, ইলামাইট, মেদিয়ান ইত্যাদি জাতিকে একক শাসনাধীনে আনতে ব্যর্থ হন। (হালিম ও নুরুল্লাহর, ২০০৮ : ৭৮) তাঁদের সংগ্রামী জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পারস্যকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা চালায় মেদিয়ানরা। এদের কেউ কেউ যাযাবর জীবন ছেড়ে পারস্যের আদি অধিবাসীদের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। পারস্য (Persia) শব্দটির উৎস Pers শব্দ হতে। পার্স ছিলো পার্সীয়দের প্রাচীনকালের ব্যবহৃত ভাষা। পারস্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ইতিহাসে পার্সিয়ান (Persian) নামে পরিচিত। (Schmitt, 1987 : 682)

সম্রাট ডিওসেস (Dioces) হলেন সর্বপ্রথম পারস্য সম্রাট যিনি ‘এসাইরিয়ান’দেরকে দমন ও পারস্যের সকল জাতিকে একীভূত করে একটি নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার প্রয়াস পান। এমনকি মেদিয়ানদের নেতৃত্বে পারসিকরা পারস্যের বহু গোত্রকে এসাইরিয়ানদের বর্বরতার হাত হতে মুক্ত করতে সমর্থ হন।

(তারিক, ২০১৪ : ৩) ইকবাতানা, রাগাই ও এসপাদানা ছিলো মেদিয়ানদের উল্লেখযোগ্য শহর। তন্মধ্যে ‘ইকবাতানা’ ছিল রাজধানী। এ শহরগুলো বর্তমান পারস্যের কেন্দ্রস্থলের ইসপাহান, তেহরান, হামাদান, যানযান পেরিয়ে একেবারে কুর্দিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ইকবাতানা শহরটির অস্তিত্ব আজও আছে। তবে এর বর্তমান নাম হামেদান (Hamedan), যার প্রাচীন নাম ছিল ‘Hegmetanah’। বর্তমানে এ শহরটি ইরানের পশ্চিমের একটি উল্লেখযোগ্য প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তেহরান হতে এটি ৩৬০ কি.মি. দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি দর্শনীয় এলাকা হিসেবে পরিচিত। মাদ সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি তেহরান হতে ২৫০ কি.মি. দূরবর্তী ইরানের ‘কাশান’ নগরীতে আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। (Hamedan, Wikipedia ; Diakonoff, 1985 : 70-90)

একামেনিড সাম্রাজ্য (৫৫৯-৩৩০ খ্রি: পূ:)

সেই প্রাচীন যুগেই আনুমানিক ৫৫৯ খ্রি. পূর্বাব্দে পারস্যে রাজাধিরাজ সম্রাট ‘সাইরাস দ্য গ্রেট’-এর নেতৃত্বে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেছিল ক্রমান্বয়ে তা তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরিদের হাতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। (Frye, 1984 : 237) বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিখ্যাত এই সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। সাইরাস দ্য গ্রেটের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তাঁর পূর্বপুরুষ ‘একামেনিস’-এর নামানুসারে ইতিহাসে ‘একামেনিড’ সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এক পর্যায়ে মেদিয়ান সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে ‘আনশান’ প্রদেশের শাসনকর্তা ক্যামবিস ও ইতিহাসখ্যাত রাণী মানদানা’র পুত্র ‘সাইরাস দ্য গ্রেট’ প্রাচীন ইরানের সমগ্র এলাকা ও আর্মেনিয়া, এসিরিয়াসহ ব্যাপক অঞ্চল ৬২৫ খ্রি. পূর্বাব্দের মধ্যে একক শাসনাধীনে আনে। এতে ভারত হতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত মেদিয়ান সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। (Diakonoff, 1985 : 125) সম্রাট সাইরাস ৫৫০ খ্রি. পূর্বাব্দের দিকে ব্যবিলনীয় শহর হতে প্রায় ৫০ হাজার ইহুদি ক্রীতদাস মুক্ত করে তাদেরকে জেরুজালেমে পাঠিয়ে দেন। (হালিম ও নুরুন্নাহার, ২০০৪ : ১৩৭) ৫৪০ খ্রি. পূর্বাব্দে তাঁর বিখ্যাত ‘মানব স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র’ জারী ও তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাও ছিলো লক্ষণীয়। (Garrison & Root, 2001 : 116)

সাইরাসের পুত্র ‘দ্বিতীয় ক্যামবিসেস’ ৫২৯-৫২২ খ্রি. পূর্বাব্দের রাজকীয় এলিট ফোর্সের অভিযানের মাধ্যমে মিশরের ফ্যারাও^৮ (মাহমুদুল, ২০০৬ : ১৯৫) শাসক এমেসিসকে আনুমানিক ৫২৫ খ্রি. পূর্বাব্দে ‘পেলুসিয়াম’-এর যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সম্রাট ক্যামবিসেস দেশে গোলযোগের খবর শুনে মিশরে বিশাল এলিট ফোর্সকে রেখে পারস্যে প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চিমধ্যে আততায়ীর হাতে নিহত হন। (Garrison & Root, 2001 : 130)

পরবর্তীতে অভিজাত পরিবারের সন্তান সম্রাট ‘দারিয়ুস দ্য গ্রেট’ পারস্যের শাসন ক্ষমতায় (আনুমানিক খ্রি. পূ. ৫২২-৪৮৬ সাল) এসে সকল বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করেন। (Frye, 1984 : 257) তিনি প্রচলিত ধর্মমত যরথুস্ত্রবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে এ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেন। তাঁর সময়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশব্যাপী পারসিক সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়, যেখানে প্রায় পঁচিশ জাতির লোকজন বসবাস করতো। বিজিত রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সম্রাট ‘দারিয়ুস দ্য গ্রেট’ সমগ্র সাম্রাজ্যকে ২১টি সেতাপী বা প্রদেশে বিভক্ত করেন যা ছিলো এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। (শাহনেওয়াজ, ২০০৩ : ১৩০) তিনি শাসনকার্যের সুবিধার্থে সেই প্রাচীন যুগে নিজ সাম্রাজ্যে ৪টি রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন। পার্সেপোলিসকে তিনি নিজের রাজধানী করেন। (হালিম ও নুরুল্লাহর, ২০০৮ : ১৩৩) প্রাদেশিক প্রধানগণ সম্রাটকে কর প্রদানের বিনিময়ে নিজেদের প্রশাসন চালানোর বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

সেই প্রাচীন যুগে তাঁর এই বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসনিক বিন্যাসের জন্য শুধু পরবর্তীকালের মুসলিম শাসক গণই নয় বরং ইউরোপের রাজারা পর্যন্ত প্রভাবিত ও উপকৃত হন। সেই মুঘল যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার উপর পারস্য প্রশাসন ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছিলো। ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পারসিক শাসনব্যবস্থার নিকটে একান্তভাবে ঋণী। (আজগর, মুখলেসুর ও লুৎফর, ২০১০ : ৩১৭) সম্রাট দারিয়ুস রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য বহু জনহিতকর সংস্কার সাধন করেন। তিনি ও তাঁর পরবর্তী সম্রাটগণের বিখ্যাত কীর্তি ছিল নীলনদ ও লোহিত সাগরের সংযোগ রক্ষাকারী প্রাচীন খালের সংস্কার। এটিই বর্তমানে বিখ্যাত

৮. মিশরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পরাক্রমশালী এক বংশের নাম ছিল ফ্যারাও বা ফেরাউন। খ্রি: পূ: আনুমানিক ৩২০০ বছর পূর্বে এরা মিশরে শাসনকার্য পরিচালনা করে গেছেন।

সুয়েজ খাল নামে খ্যাত যা আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। (হালিম ও নুরুল্লাহর, ২০০৮ : ১৩৬)

সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম জারেক্সেস সিংহাসনে সমাসীন হন। সম্রাটগণের সাধারণত পদবি থাকত ‘শাহানশাহ’। সম্রাট ‘প্রথম জারেক্সেস’ নিজে ‘দাখনিস খাশিয়ার শাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বেশিদিন শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেননি। সালামিস আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি গ্রিকদের হাতে পরাজিত হন। পরবর্তী পারসিক রাজাগণের দুর্বলতা ও চরম রাজনৈতিক অসন্তোষের সুযোগে খ্রিস্টীয় মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের খ্যাতিমান পুত্র আলেকজান্ডার ৩৩০ খ্রি. পূর্বাব্দে হাখামানসি সাম্রাজ্যের সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুসকে পরাজিত করে পারস্য অধিকার করেন। (মুহসেন, ১৩৭৮ : সৌরবর্ষ, ১৮)। এতে সমগ্র পারস্যের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে যেমন মিডিয়া মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখনকার দিনে যুদ্ধবাজ জাতিসমূহ শক্তিমত্তা দিয়ে একজন আরেকজনকে সবদিক দিয়েই পদানত করে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকতো।

সাসানিয় সাম্রাজ্য

পারস্যে গ্রিক শাসনের এক শতাব্দী পার হতে না হতেই ‘আরদেশির পাপেকান’ নামক একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা গ্রিক সম্রাটকে পরাজিত ও নিহত করে আনুমানিক ২২৬ খ্রিস্টাব্দে সাসানিয় শাসনামলের শুভ সূচনা করেন। সাসানিয় বংশের সর্বমোট চল্লিশজন শাসক ৬৫২ খ্রি. পর্যন্ত পারস্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ বংশের অবসান ঘটে সম্রাট ইয়াযদেগারদে সেভতোম-এর পতনের মাধ্যমে। (তারিক, ২০১৪ : ৩২) সাসানিয় বংশের প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন প্রথম খসরু নওশিরওয়ান (রাজত্বকাল : ৫৩১-৫৮০ খ্রি:)। তাঁর শাসনামলে পারস্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন বাইজান্টাইন সম্রাট ‘জাস্টিনিয়ান’। এ সময়ে টেসিফোন পারস্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। সাসানিয় শাসকদের অভিযানে বিশ্ব প্রকম্পিত হয়ে উঠতো। সম্রাট খসরুর বিশাল সেনাবাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করে এন্টিয়ক দখল করলে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। উপায় না দেখে সম্রাট জাস্টিনিয়ান ব্যাপক প্রচেষ্টার পর পারস্য সম্রাটের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে সক্ষম হন। এমনকি সম্রাট খসরুর বাহিনী

৫৭৫ খ্রি. ইয়েমেনের আবিসিনিয় বাহিনীকে পরাজিত করলে পবিত্র আরব ভূমির প্রসিদ্ধ ইয়েমেন, তায়েফ পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ৪৬৬)

পারস্যের সাসানিয়ান শাসক প্রথম খসরুর পৌত্র সম্রাট খসরু পারভেজের শাসনকালও (৫৯০-৬২৮ খ্রি.) ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁর সময়ে ইরানের সামরিক বাহিনী আরও বিশালতা লাভ করে। এ সময় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জনগণ সৈনিক পেশায় নিয়োজিত হতেন। সম্রাট পারভেজের শক্তিশালী সেনাবাহিনী বাইজান্টাইন রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে সিরিয়ার দামেস্ক ও জেরুজালেম দখল করে। এ বিজিত রাজ্য হতে সম্রাট খ্রিস্টান পত্নীর পরামর্শে ‘আদি ক্রুশ’ রাজধানী টেসিফোনে নিয়ে আসেন। এ সময় মিশর রাজ্যও দখলে আসে। (Erich, 1931 : 300)

এক পর্যায়ে পারসিক সম্রাটদের চরম স্বৈরাচারী মনোভাব, জনগণের উপর অতিরিক্ত করারোপ, জনগণকে যরথুস্ত্রবাদ গ্রহণে বাধ্যকরণ ও না করলে চরম নির্যাতন ও আভ্যন্তরীণ নানা দুর্বলতা সৃষ্টির কারণে পরিশেষে পারস্য সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ভেঙে পড়ে। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ১২৬)

প্রাচীন পারস্যে নারীর সামাজিক অবস্থা

প্রাচীন সমৃদ্ধশালী এ সভ্যতায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা আত্মনির্ভরশীল ও ঘরের বাইরে পুরুষের মতো কর্মে নিযুক্ত থাকলেও সামগ্রিকভাবে পেশীশক্তিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যে ছিলো নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত। (Maria, 1998 : 11) তাদের অবস্থা অনেকটা গ্রিক নারীদের অনুরূপই ছিলো। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের জীবন আরও করুণ বা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিলো। বিত্ত-বিভব, সৌখিনতা-বিলাসিতা, কঠোর শ্রেণিবৈষম্য, সামাজিক জীবনের কিছু কিছু পর্যায়ে পশুর ন্যায় আচরণ (Earnest, 1992 : 32), নানা কুসংস্কার, অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ প্রথা, ক্রীতদাস-দাসী প্রথা, ব্যভিচার ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় পারস্যের নারীরা জর্জরিত ছিলো। তাঁদের সেই অজানা ইতিহাস বিশ্ব সভ্যতার এক চমকপ্রদ সংযোজন।

শ্রেণিভেদ প্রথা ও অনাচার

সে সময়ে শক্তিশালী গোত্রের লোকজন দুর্বল গোত্রের উপর চড়াও হতো। ফলশ্রুতিতে সমাজের দুর্বল শ্রেণির কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকতো না। পারসিক জাতি সমাজের সকল শ্রেণিকে সমান মর্যাদা দানের কথা বললেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কঠোর শ্রেণিভেদ প্রথায় জর্জরিত ছিলো সমাজ। এ সময়ে অনাচার, পাপাচার, প্রকাশ্যে মদ্যপান, জুয়া খেলা এমনকি স্ত্রীকে বাজি ধরে জুয়া খেলা ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সমাজে ব্যাপকভাবে চলত। (Bab. Saekalli ; BE 928'50.) আর সমাজে প্রচলিত বারবনিতা প্রথায় আবদ্ধ নারীদের অবস্থা ছিলো করুণ।

প্রচলিত কুসংস্কার

প্রাচীন পারস্য সমাজ নানাবিধ কুসংস্কারের বেড়া জালে আবদ্ধ ছিলো। তাঁরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করা ছাড়াও যাদুটোনা এমনকি এক মানুষ অন্য মানুষের কথা দ্বারা খুব সহজেই প্রভাবিত হয়ে যে কোনো কুসংস্কার ও গভীর অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়তো। ফলে এ পরিবেশে নারীরা অশেষ কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হতো। নানাবিধ সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়া জালে আবদ্ধ করে তখন নারীর স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করা হতো। তাঁদের প্রচলিত রীতি-নীতিতে নারীকে অলক্ষুণেও ভাবা হতো। যেমন : কোনো নারীর সন্তানাদি না হলে বা এ ধরনের কোনো শারীরিক ত্রুটি থাকলে তাকে সমাজে নিদারুণভাবে হেয় করা হতো। ঋতুকালীন সময়ে নারীর জন্য পুরুষ ও সূর্যের মুখ দেখা পর্যন্ত সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। এমনকি তাঁদের জন্য আগুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, খাদদ্রব্য স্পর্শ করা ও অন্য কোনো ঋতুবতী নারীর সাথে একত্রে শোয়াও নিষিদ্ধ ছিলো। খাবারের পাত্র ধরতে গেলে তাঁকে হাতে কাপড় জড়িয়ে ধরতে হতো। এর ব্যত্যয় ঘটলে ঐ নারীর জন্য বেহেশত হারাম হবে বলে সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিলো। (ইসহাক, ১৯৯৭ : ২৪) এ প্রথাগুলো প্রতিনিয়তই নারীর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিলো। শুধু তাই নয়, তাঁর ঋতুকালীন পাপ মোচনের জন্য বছরে এক মাস তাওবা পর্যন্ত করতে হতো। এসব আচারিক বিধি-বিধান পালন করতে পুরুষরাই শুধু নারীকে বাধ্য করত এমনটা নয় বরং এক নারী আরেক নারীকে এ কাজ করতে বল প্রয়োগ পর্যন্ত করতো। (ইসহাক, ১৯৯৭ : ২৪) ইসলাম আবির্ভাব-পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের নারীদের জীবনে এমনই এক অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছিলো।

সন্তান প্রসব পরবর্তী কঠোরতা

প্রসূতি নারীর চাল-চলনের ক্ষেত্রেও বহু বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিলো। সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত নারী কাঠ পাত্র ও মাটি স্পর্শ করতে পারতো না। ঘর হতে বের হয়ে চৌকাঠ অতিক্রম করাও তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। (ইসহাক, ১৯৯৭ : ২৫) সেখানকার অসহায় নারীরা এসব নিয়মের জন্য নিজেদের জীবনকে বোঝা মনে করতো। কোনো কোনো সমাজের নারীরা এখনো এ অনিয়ম হতে মুক্ত হতে পারেনি।

লিঙ্গ বৈষম্য

বিশ্বে প্রচলিত অন্য সমাজের ন্যায় এখানেও কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের অধিক কদর থাকায় নারীরা নানাভাবে নিগৃহীত হতো। মেয়েরা কখনোই কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারতো না। বিবাহে পণপ্রথা চালু ছিলো। বিয়েতে কখনও কনের পক্ষ হতে বরপণ প্রদান করা হতো। কোনো কোনো পরিবারে কন্যার বিয়ে হয়ে যাবার পরও তাঁর উপর পিতার কর্তৃত্ব বজায় থাকতো। যেমন বিবাহের পরে নারী দেনমোহর প্রাপ্তির পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে প্রাপ্ত দেনমোহর তাঁর পিতা বরপক্ষ হতে জোর করে আদায় করতো। (Herodotus, 1930 : 98)

খ্রি. পূর্ব ৮ম শতকের দিকে ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণিও সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতির পাশাপাশি তাঁদের পারিবারিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ফলে পারিবারিক বিষয়গুলো এ সময়ে খুব জটিল হয়ে পড়ে। সমাজে প্রচলিত অপর একটি জঘন্য প্রথা ছিল বিবাহের নামে নারীকে চরমভাবে হীন কাজে প্রলুব্ধ করা। এ ধরনের বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মদান। বিষয়টি ছিলো এমন যে, যদি কোনো ব্যক্তি পুত্র সন্তান না রেখে মারা যেতো তবে তার স্ত্রী বা কন্যাকে পরিবারের কর্তাব্যক্তির জোরপূর্বক অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করতো। এ সম্পর্কের ফলে কোনো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ঐ নবজাতক শিশু মৃত ব্যক্তির পুত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে পরবর্তীতে মৃত ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো। (মুতাহহারী, ২০০৪ : ১৭৬)। এ ধরনের নোংরা প্রথা নারী জীবনের জন্য কালিমাশ্বরূপ ছিলো।

বিবাহের নামে কদর্যতা

তদানীন্তন সমাজে অজ্ঞতাপ্রসূত রীতি-নীতির ব্যাপক প্রচলন ছিলো। বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু মানুষ পশুর মতো আচরণ করতো যা ছিলো মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ। পারস্যের ইতিহাসে খ্রি. পূ. ৪র্থ শতকের মহান সম্রাট সাইরাসের পুত্র মিশর বিজয়ী সম্রাট দ্বিতীয় ক্যামবিসেস (সিংহাসনারোহণ ৫৩০-৫২২ খ্রি. পূ.) সৎ ভগ্নী অটোসাকে বিবাহ করেন, (WWW.livius.org) যা ছিলো একটি নিন্দনীয় অধ্যায়। মিশরের ফেরাউনরা তখন ছিলো পারস্যের সমসাময়িক। তাঁরাও এ ঘৃণিত বিবাহ-প্রথায় অভ্যস্ত ছিলো। কথিত আছে যে, খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের দিকে রোমান রাজা অগাস্টাস ইতালি হতে ক্রীতদাসী হিসেবে প্রাপ্ত এক সুন্দরী নারীকে মিশরের বিখ্যাত চতুর্থ ফেরাউনকে উপহার হিসেবে প্রদান করলে উক্ত নারী পরবর্তীতে মিশরের রাণী হন। এই রাণী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলে সে সন্তান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়। তাঁর মাতা সাম্রাজ্যে তাঁর প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য নিজের পুত্রকেই বিবাহ করে ফেলেন। (Josephus, Ant.Jud. 18-24.) সমাজের উঁচু শ্রেণী ব্যতীত সাধারণ সমাজেও এ প্রথা চালু ছিলো।

সমাজে নিয়মিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলেও তাতে স্ত্রীর কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। তাঁরা ছিলো পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় একটি পণ্য। সম্পদশালী পারসিকরা একাধিক স্ত্রী রাখতো। ফলে পারিবারিক জীবনে কোনো শান্তি ছিলো না। এতে স্ত্রীর অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হতো। যদিও স্ত্রীরা ভরণ পোষণ পেত। একামেনিড হতে সাসানিয় শাসনামল পর্যন্ত অধিক স্ত্রী রাখার বিষয়টি অভিজাতদের এক ধরনের অপরিহার্য নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আবার পারস্য সমাজে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে অন্য পুরুষেও সমর্পণ করতো। হয়তো এ কারণেই পারস্যে তখন কোনো কোনো নারী একজন স্বামী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্বামী রাখতে পারতো। এ পক্ষে কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তা প্রথম স্বামীর বলে স্বীকৃতি পেত। (মুতাহহারী, ২০০৪ : ১৭৫-৭৬) ইসলাম পরবর্তীতে উপরোক্ত সকল গর্হিত বিবাহ নিষিদ্ধ করে।

তালাক প্রথায় নারী

সমাজে বিবাহের পাশাপাশি তালাক আইন চালু ছিলো। তবে এখানকার তালাক আইন গ্রিকদের তুলনায় কিছুটা সহজ ছিলো। পারসিক নারীরা চাইলে স্বামীর খামখেয়ালিপনা বা নির্যাতন হতে বিচ্ছেদের মামলা

করে মুক্ত হতে বা তালাক নিতে পারতো। এ প্রসঙ্গে পারস্যের ইতিহাসে সম্রাট জারেক্সেস (৪৮৫-৪৬৫ খ্রি. পূ.) এর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ভিসতার বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান দীর্ঘ ছয় মাস ধরে চলার এক পর্যায়ে রাজপরিবারে বিবাহ উপলক্ষে আগত অতিথিদের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান, অশ্লীলতা এমনকি অতিথিরা রাণীর মাথার মুকুট জোরপূর্বক সরিয়ে ফেললে ভিসতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। পরবর্তীতে ভিসতা সম্রাটকে তালাক দেয়। তিনি স্বামী জারেক্সেস হতে তালাক বা বিচ্ছেদের প্রার্থনা করে আদালতে আবেদন করেন। সম্রাটের নিকটেই আবেদনটি যায়। যেহেতু সম্রাট পারস্যের বিচার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন, সেই হিসেবে সম্রাট জারেক্সেস আইনসভার প্রধান হিসেবে বিচারকদের সাথে আলাপ করে আইনসম্মতভাবে ভিসতার আবেদনটি অনুমোদন করতে বাধ্য হন। (Maria, 1996 : 107)

তাই বলা চলে স্ত্রীরা চাইলে প্রাচীন পারস্য সমাজে স্বামী হতে তালাক নিতে পারতো। তবে এ সুবিধাটি অভিজাত সমাজেই প্রচলিত ছিলো। আর পুরুষরা চাইলেই খেয়ালখুশিমতো স্ত্রী বর্জন বা ত্যাগ বা গৃহ হতে বের করে দিতে পারতো। আজকের নারীরা এখনও এ নির্যাতন হতে মুক্তি পায়নি।

দাস প্রথা

গ্রিক সভ্যতার মতো পারস্যের হাট-বাজারেও দাস-দাসী পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রি করা হতো। পারস্যের মেদিয়া, মিশর ও ব্যাবিলনে একামেনিড সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত দাসদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ছিলো না। পারস্যের একামেনিড ও সাসানিয় শাসনামলে দাসদের মানুষের সমান মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। তবে যরথুস্ট্র ধর্মীয় সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নির্যাতনের শিকার হতো। (Irani & Morris, 1995 : 224) বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক এ দাস প্রথা উচ্ছেদে বিশ্ববাসীর যুগ যুগ সময় লেগেছিলো।

শিক্ষার অধিকার

প্রাচীন পারস্য সমাজের নারীরা গ্রিসীয় সভ্যতার নারীদের তুলনায় কিছুটা অগ্রসর ছিলো। নারীকে শিক্ষাদানে তাঁরা প্রলুব্ধ করতো। পারস্যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিলো, কিন্তু তা এখনকার মতো নয়। নারী শিক্ষা বলতে তখন ছিলো কেবল গৃহস্থালি জ্ঞান অর্জন। সাধারণত সমাজে অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ

তাদের সন্তানদের অশ্বচালনা, যুদ্ধকৌশলবিদ্যা অর্জনের নিমিত্তে গৃহেই বিদ্যালয় স্থাপন করতো ও তাতে নিয়মিত শিক্ষক থাকতো। এসব বিদ্যালয়ে অভিজাত পরিবারের নারীগণ কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেতো। এমনকি তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যা অর্জন করে অন্যকে জ্ঞাত করানোর চেষ্টা করতো। (Herodotus, 1930 : 107-30) পারস্যের ইতিহাসে মানদানাসহ রাজপরিবারের অসংখ্য শিক্ষিত নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাই বলা যায়, প্রাচীন পারস্যে সামাজিকভাবে নারীদের মর্যাদা দানের প্রচেষ্টা চলেছিলো। যেমন : তাদের অভিজাত পরিবারে অনেক স্ত্রীর মধ্যে একজন আবার প্রধান স্ত্রী বা ‘পাদশা যান’ বলে প্রাধান্য পেতো। এছাড়াও তাদের রাণীদের আরও অনেক পদবি ছিলো। সেই যুগের অধুনা আবিষ্কৃত মুদ্রা ও শিলালিপির মাধ্যমে জানা যায়, সম্রাট প্রথম শাপুর, সম্রাট আরদাশির স্ত্রী ‘মুরশাদ’ প্রমুখের পদবি ছিলো ‘রাণীদের রাণী’। (Harmitage Museum, St. Petersburg Russia, Inv.GL. 987 ; cf. Gignoux and Gyselen, 1987 : 882) পারস্যে সাধারণ মেয়েরা ‘মুটু’, অভিজাতদের স্ত্রীরা ‘সানকি ইরিত্রি’, ‘নরিতু’ বা ‘পাদশাহ যান’ ও রাজকন্যারা ‘ডুকসিস’ নামে সমাজে পরিচিত ছিলো। (Maria, 1996 : 46) তাই কিছু কিছু নারী ব্যতিক্রমী হিসেবে সমাজে সম্মানপ্রাপ্ত হলেও আপামর নারীর জীবন অনাচার ও কদর্যতায় কলুষিত হয়ে পড়েছিলো। নারীরা প্রাচীন পারস্যে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান পায়নি।

রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী

সমগ্র বিশ্ব যখন বর্বরতা ও হিংস্রতায় আচ্ছন্ন ছিলো তখন পারস্য সমাজের নিম্ন শ্রেণির নারী ছাড়া উঁচু শ্রেণির নারীগণ যথেষ্ট রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতেন। পার্সেপোলিস, টেসিফোন ছিলো এ সভ্যতার পীঠস্থান। আনুমানিক খ্রি. পূ. ৭০০ সাল হতে খ্রিস্টীয় ৩০০ শতক পর্যন্ত পারসিক সভ্যতার দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে অসংখ্য সাহসী, মেধাবী ও প্রজ্ঞার অধিকারিণী নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যা এখনও অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। (Chronicles of Seert, 1958 : 146-7) রাণী মানদানা, অমিটিস, প্যানটিয়াহ, ক্যাসাডেনে, অটোসা, লেফটেন্যান্ট আরটুনিস, ব্যবসায়ী ইরদাবামা, নৌবাহিনীর এডমিরাল আরটেমেসিয়া, রাণী ইশার, উজীর অ্যামাজান, লেফটেন্যান্ট সুরা, রাণী পুরাণ, রাণী আযারদোখত, রাণী বুরাণ, জেনারেল

পারিসাটিসসহ অসংখ্য নারীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। যদিও ব্যতিক্রমী এ ধারা ছিলো সমসাময়িক বিশ্বের জন্য অবাক করার মতো। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

রাণী নেপ্রোসর

পারস্যের ইতিহাসে অসংখ্য নারী অধিপতির নাম জানা যায়। সম্প্রতি এখানে আজ হতে খ্রিস্টীয় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গড়ে উঠা ইলামাইট সভ্যতার বিখ্যাত রাণী ‘নেপ্রোসর’-এর ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যার ওজন প্রায় ১৭৬০ কেজি এবং এর মাধ্যমে ঐ সময়ের নারীর শক্তিমত্তা ও রাজনৈতিক সক্ষমতার চিত্র আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়। এ মূর্তিটি বর্তমানে ফ্রান্সের ‘লুভর’ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, রাণী নেপ্রোসর আরিয়ানের ইলামাইট রাজ্যের শাসক ছিলেন।” (Porada, 1962 : 61) আদিতে নারীশক্তি যে পারস্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল তা উক্ত মূর্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

রাণী মানদানা

পারস্যের ইতিহাসে একজন প্রসিদ্ধ নারী হলেন রাজকন্যা ও পরবর্তীতে রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাণী ‘মানদানা’ (আনুমানিক জন্মকাল খ্রি. পূ. ৫৮৪)। তিনি মেদিয়ান সম্রাট আযটিয়াকের (শাসনকাল : ৫৮৫-৫৫০ খ্রি. পূ.) কন্যা ছিলেন। মানদানা ৫৮৪ খ্রি. পূ: ইকবাতানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একদিন স্বপ্ন দেখেন, তাঁর সাম্রাজ্য বন্যার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। জ্যোতিষীরা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সম্রাটকে জানান যে, তাঁর সাম্রাজ্যের পতন তাঁর বংশধরের হাতেই ঘটবে। সম্রাট ভবিষ্যতে নিজের ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে তাঁর প্রতি অনুগত আনশান প্রদেশের শাসনকর্তা ক্যামবিসেস (শাসনকাল : ৫৮০-৫৫৯ খ্রি. পূ.) এর সাথে একমাত্র কন্যার বিবাহ দেন। মানদানা বিয়ের পরে স্বামীর নিকটে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। (Mandane of Media, Wikipedia)

মানদানা সন্তান সম্ভবা হলে তাঁর পিতা আযটিয়াক পুনরায় একই ধরনের স্বপ্ন দেখেন। রাণী মানদানা ও ক্যামবিসেসের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রই পরবর্তীতে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে হন সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেট (রাজত্বকাল : ৫৫৯-৫২৯ খ্রি. পূ.) যার বাল্য

নাম ছিলো ‘মিট্রিডেস’। কিন্তু সাইরাস বাল্যকালে জানতেন না যে, তিনি মেদিয়ান সম্রাট আযটিয়াকের নাতি। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সম্রাট আযটিয়াক পথের কাঁটা মনে করে নাতি সাইরাসকে মারার জন্য লোকও নিয়োগ করলেন। কিন্তু নিষ্পাপ শিশুটিকে দেখে হত্যাকারীর মায়ার উদ্বেক হলে সে শিশুটিকে না মেরে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ঘটনাচক্রে এই শিশু মায়ের কাছেই প্রতিপালিত হতে থাকে এবং বড় হয়ে প্যাসারগাডের যুদ্ধে নানাকে পরাজিত করে মেদিয়ান সাম্রাজ্য দখলের মাধ্যমে বিখ্যাত একামেনিড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। (Mandane of Media, Wikipedia) সাইরাসের এ সফলতার অন্যতম কারণ ছিলো, তাঁর মায়ের সুযোগ্য তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাদান। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস মানদানা সম্পর্কে এমনটিই বলেছিলো। (Herodotus, 1930 : 107-30) ঐতিহাসিক প্লুটার্ক বলেন, “সে সময়ে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করতো।” (Plutarc, 1871 : 61) রাণী মানদানা পুত্র সাইরাস ঘোষিত মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা স্বহস্তে ফলকে লিপিবদ্ধ করে দেয়ার দুর্লভ কাজটিও সম্পন্ন করেছিলেন। রাণীর সম্মানে পরবর্তী সম্রাট ‘দারিয়ুস দ্য গ্রেট’ নিজের কন্যার নাম মানদানা রেখেছিলো।

এ প্রসঙ্গে গ্রিক ঐতিহাসিক ডিয়াকোনফ বলেন, “মেদিয়ান যুগে রাজার কন্যা এমনকি তাদের জামাতাও তাঁর শাসনের উত্তরাধিকারিত্ব পেতো এবং বহু শতাব্দী পরে মাতৃতান্ত্রিক শাসন যখন পিতৃতান্ত্রিক শাসনে পরিবর্তিত হচ্ছিল বা পরিণত হবার পথে অগ্রসরমান ছিলো সে সময়েও অভিজাত পরিবারের নারীগণ তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি আইনগত অধিকার রক্ষা ও তা ধরে রাখার চেষ্টা করতো।” (Diakonoff, 1985 : 182)

অমিটিস শাহবানু

অমিটিস শাহবানু মেদিয়ান রাজা অসটিক শাহের কন্যা ছিলো। তাঁকে সাইরাস দ্য গ্রেট বিবাহ করেছিলো। সম্রাজ্ঞী অমিটিস সবসময়েই স্বামীর সকল কাজের প্রেরণাদায়ী ছিলো। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পারসিক রাজদরবারের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন। (Maria, 1996 : 137)

প্যানটিয়া আরটেসিয়াহ (খ্রি. পূ. ৫৪৫ আবির্ভাবকাল)

পারসিকগণ জাতি হিসেবে ছিলো অত্যন্ত সাহসী ও রণকুশলী। ‘প্যানটিয়া আরটেসিয়াহ’ নামক মহিলা ‘সাইরাস দ্য গ্রেট’-এর বিশাল সেনাবাহিনীর একজন চৌকস কমান্ডার ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য স্বামী আরিয়াস সেনাবাহিনীর জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন। (Wikipedia) প্যানটিয়ার সামরিক কৃতিত্ব ছিলো অসাধারণ। তিনি ৫৪৭ খ্রি. পূ. সালে ব্যাবিলন অধিকৃত হলে নিও ব্যাবিলনীয় শহরে আইনের শাসন বাস্তবায়ন করেন। প্যানটিয়ার ন্যায় দক্ষ যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হতো। তিনি আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। তাঁকে দেখে কেউ যাতে প্রেমে না পড়েন সেজন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুখের উপরে পর্দা ঢেকে দিতেন। কেননা তিনি ছিলেন তদানীন্তন এশিয়ার স্বনামধন্য, সুন্দরী ও বিদুষী নারী। এই সাহসী নারী রণক্ষেত্রে অন্যান্য সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি ও যুদ্ধজয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। (Maria, 1996 : 145)

তাঁরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলিট ফোর্স বা ‘আমৃত্যু বাহিনী’র কমান্ডারের ভূমিকাও পালন করতেন। তাঁরা এতোই যোগ্য ছিলেন যে, সাধারণ সৈন্যবিভাগ ও এলিট ফোর্সের ন্যায় দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করে গেছেন। ‘এলিট ফোর্স’ ছিল পারসিক সৈন্যবাহিনীর এমন একটি দল যা দশ হাজার সৈন্য সমবায় গঠিত হতো। যুদ্ধকালীন সময়ে এ দলের কোনো যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে সাথে সাথেই সৈন্যবিভাগ হতে এ সামরিক বিশেষ বাহিনীতে সৈনিক অন্তর্ভুক্ত করে দশ হাজার সংখ্যা ঠিক রাখা হতো। এজন্য একে ‘আমৃত্যু যোদ্ধা’ দলও বলা হতো। (Maria, 1996 : 146) এ ফোর্সে প্রবেশে সৈনিকদের বয়সসীমা ছিলো মাত্র সাত থেকে দশ বছর। এদেরকে যরথুস্ত্রবাদে দীক্ষা দিয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সাথে সামরিক, আধ্যাত্মিক ও প্রচলিত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে এলিট বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হতো। শুধু প্রাচীন পারস্যে কেন, অতীতের কোনো কোনো সাম্রাজ্যে এ ধরনের সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ‘জেনিসারী’ নামে এ ধরনের একটি বিশেষ বাহিনী ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ অটোমান সাম্রাজ্যে (১৩০০-১৮০৩ খ্রি.) ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো। জেনিসারী বাহিনীতে সৈন্য প্রবেশের বয়সসীমা ছিলো মাত্র দশ থেকে বারো বছর। (আশরাফউদ্দিন, ২০০৩ : ১৮৯)

ক্যাসাডেনে শাহবানু (খ্রি. পূ. ৫৪৫)

সম্রাজ্ঞী অমিটিস শাহবানুর মৃত্যুর পর সম্রাট সাইরাস পারসিয়ান অভিজাত পরিবারের সন্তান ক্যাসাডেনে শাহবানুকে বিবাহ করেছিলো। ক্যাসাডেনের পিতার নাম ছিল ‘ফারনাসপেস’, যিনি মেডিয়ান রাজ্যের একজন অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাজ্ঞী ক্যাসাডেনে রাজ্য শাসনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি অসামান্য রূপবতী ও বিদূষী নারী ছিলেন। তাঁর চার সন্তানের তিনজনই ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেন। অপর সন্তানের তথ্য জানা যায় না। তারা হলেন রাজা দ্বিতীয় ক্যামবিসেস, স্মেরডিস (বার্ডিয়া) ও কন্যা অটোসা। সম্রাজ্ঞী ক্যাসাডেনের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের সকল জাতি কয়েক মাস যাবৎ শোকাভিভূত ছিলো। প্যাসাগারডের ‘যেনদান-এ-সোলায়মান’ এ সম্রাজ্ঞী সমাহিত হন। (Erich, 1939 : 149)

প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগের পর সম্রাট সাইরাসও আর কাজে-কর্মে মনোযোগ দিতে পারেননি। বাকী জীবনটা তাঁর এভাবেই অতিবাহিত হয়েছিলো।

রাজকুমারী অটোসা (খ্রি. পূ. ৫৪৫)

অসামান্য সুন্দরী রাজকুমারী অটোসাকে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও বিশ্ব ইতিহাসে একজন ক্ষমতামূলী নারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি তাঁর পিতার অবর্তমানে অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেন। তাঁর নেতৃত্বেই পারস্য প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। তিনিই বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে সেনাপতি নিয়োগ দিতেন। স্বামী ক্যামবিসেসের মৃত্যুর পর সম্রাজ্ঞী অটোসা অভিজাত পরিবারের সন্তান দারিয়ুস দ্য গ্রেটকে (৫২২-৪৮৬ খ্রি. পূ.) বিবাহ করেন। তাঁর সকল কাজের উৎসাহদাত্রী ছিলেন সম্রাজ্ঞী অটোসা। (Erich, 1939 : 159) সম্রাট সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনয়াদ শক্তিশালী করার জন্য প্রাদেশিক প্রধানদের কর প্রদানের শর্তে প্রশাসনিক স্বাধীনতা প্রদান করেন। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য বহু জনহিতকর সংস্কার কার্য সাধন করেন। এগুলো ব্যতীত তাঁরা রাষ্ট্রমধ্যে সকলের ধর্মকর্ম পালনের জন্য প্রচলিত ধর্মমত যরথুস্ট্রবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করে নারীদের উচ্চমর্যাদা দান করেন। (Erich, 1939 : 163)

গ্রান্ড এডমিরাল আরটেমিসিয়াহ (খ্রি. পূ. ৪৮০)

গ্রান্ড এডমিরাল আরটেমিসিয়াহ একজন সংগ্রামী ও সাহসী নারী ছিলেন। তাঁর আকর্ষণীয় চেহারা, প্রখর ব্যক্তিত্ব ও সামরিক জ্ঞান তাঁকে জনগণের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। রাজদরবারে তাঁর ছিলো অপরিসীম প্রভাব। অনেকে বলে থাকেন তাঁর সাথে রাজকুমার জারেক্সেসের হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক ছিলো। জারেক্সেস অধিকাংশ সময় খামখেয়ালিপনা প্রদর্শন করলেও তদানীন্তন বিশ্বের একজন আকর্ষণীয় ও সমরকুশলী পুরুষ হিসেবে নারীদের নিকটে অত্যন্ত পছন্দের পাত্র ছিলেন। জারেক্সেস এর সামরিক জ্ঞানও অত্যন্ত প্রখর ছিলো। তিনি আরটেমিসিয়াহর দূরদর্শিতা, সাহসিকতা ও সমরকুশলতার কারণে এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন, যা বিশাল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সমর্থ ছিলো। (Maria, 1996 : 170) আরটেমিসিয়াহ রাজকুমার জারেক্সেসের মন জয় করতে পারলেও তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ব্যর্থ হন। ঐতিহাসিকগণের মতে, আরটেমিসিয়াহ নিজের পুরো জীবনকেই সামরিক জ্ঞানে বিচার করতেন যা তাঁদের পরিণয়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বলে অনেকের অভিমত। (Artesia, Wikipedia)

সম্রাজ্ঞী ইশার

সম্রাজ্ঞী ইশার এমন এক নারী ছিলেন যাকে পারস্যের রাজকুমার জারেক্সেস শত শত পাত্রীর মধ্য হতে বাছাই করে বিবাহ করেন। যোগ্য রাজবধূর অনুসন্ধানে সমগ্র সাম্রাজ্যে ‘পাত্রী চাই’ এ মর্মে সংবাদ প্রচার করলে সমগ্র বিশ্ব হতে অসংখ্য নারী এ প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়। প্রতিযোগীদের মধ্য হতে ইশার নাম্নী এক ইহুদি নারীর সহজ-সরলতা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় চরিত্র মাধুর্যে রাজকুমার মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজমুকুট পরিয়ে দেন। এই রাজকীয় বিয়ে উপলক্ষে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে পঁচিশ জাতির রাজা আমন্ত্রিত ছিলেন। এই সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছায় পরবর্তীতে সম্রাট জারেক্সেস রাজ্যে বসবাসকারী ছিয়ান্তর হাজার ইহুদিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে তাদেরকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। (Isidore, 1966 : 175 ; Jacob, 1923 : 167)

রাজকুমারী পারিন

রাজকুমারী পারিন (আবির্ভাবকাল ৪৮৮ খ্রি. পূর্বাব্দ) একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পারস্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। তিনি সাসানিয় সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর জেনারেল বাহরাম কুবিনের যোগ্য কন্যা ছিলেন। তিনি নিজস্ব গুণ ও মেধাবলে সাসানিয়ান বিচার ব্যবস্থার উপদেষ্টার পদও অলংকৃত করেন। পারস্যের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। (Jacob, 1923 : 180)

সম্রাজ্ঞী জান্দ শাহবানু

সম্রাজ্ঞী জান্দ শাহবানু (আবির্ভাবকাল খ্রি. পূ. ৫৩১) ছিলেন পারস্যের সাসানিয় শাসনামলের সর্বাধিকার ন্যায়পরায়ণ ও বিখ্যাত শাসক খসরু আনুশিরওয়ানের স্ত্রী ও খ্যাতিমান জেনারেল বাহরাম কুবিনের নাতনী। সম্রাটের উপর তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব ছিলো। তিনি সম্রাটের সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। (Al-Fassi, 2007 : 129)

সম্রাজ্ঞী শিরিন শাহবানু

শিরিন শাহবানু (খ্রি. পূ. ৫৯০ অব্দ) ছিলেন পারস্যের বিখ্যাত সাসানীয় সম্রাট খসরু পারভেজের খ্রিস্টান স্ত্রী। তিনি তখন রাজকন্যা। একদিন এক সিংহ তাকে প্রায় আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। সেই মুহূর্তে খসরু পারভেজ তাকে সিংহের খপ্পর হতে রক্ষা করেন। পরে এই অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে সম্রাট বিয়ের প্রস্তাব দিলে সম্মতি প্রদান করেন শিরিন। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ সম্রাট খসরু পারভেজ তাঁর রাজত্বকালে ‘করমানসাহ’ (ইরানের পশ্চিমে) প্রদেশে বিশাল বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে নাম দেন ‘শিরিন’। বর্তমানে এটা ‘কাসর-ই-শিরিন’ নামে আখ্যায়িত। (Chronicles of Seert, 58 ; 150)

সম্রাটের বিপদ আপদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন শিরিন। পারসিক সাম্রাজ্যের তখন বেশ দুর্বল অবস্থা। বাইজান্টাইনদের হাতে পারসিক রাজারা তখন পরাজিত হচ্ছিলেন। হিরাক্লিয়াস নামক একজন বীর সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ পারস্যের বাইজান্টাইনের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করে সিরিয়া, মিশর ও প্যালেস্টাইন পুনরাধিকার করে সম্রাটকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। শিরিনও স্বামীর সাথে দেশান্তরী হয়েছিলেন। তাদের প্রেম কাহিনী ইতিহাসের এক কাব্যিক অধ্যায় হিসেবে ব্যাপক সমাদৃত। (Al-Fassi, 2007 : 140)

রাজকুমারী বোরান

রাজকুমারী বোরান পারস্যের সাসানিয়ান রাজবংশের ছাব্বিশতম শাসক ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতিমান ও জনকল্যাণকামী নেতা হিসেবে ইতিহাসে সুপরিচিত ছিলেন। সাসানিয়ান শাসনামলের শেষ দিকের গোলযোগপূর্ণ সময়ে সম্রাট খসরু পারভেজের দুই কন্যা বোরান ও আযারমিডকড পারস্যের সিংহাসনে পর্যায়ক্রমে সমাসীন হন। তাদের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল ইতিহাসে নানা কারণে বিখ্যাত। স্বনামধন্য বোরান পার্সিয়ান ভাষায় পোরান, পুরান, পুরানদফ নামে পরিচিত। তাঁর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে খোদিত মুদ্রা সাম্প্রতিককালে উদ্ধার হয়েছে। এ মুদ্রা রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস হতে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় সমাসীন ছিলেন। (Macler, 2014 : 47) সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর মৃত্যুর পর বোরান 'টেসিফন'-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন প্রধান উযীর দ্বিতীয় কাভেদের বিধবা স্ত্রী। কাভেদ ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাসনতান্ত্রিক পদে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাজ্ঞী বোরান একজন জ্ঞানী, ন্যায়বান এবং সং স্বভাবের নারী ছিলেন। তিনি সাসানিয় শাসনামলে ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। তাঁর বড় কৃতিত্ব ছিলো রোমান-বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে সাম্রাজ্যকে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু তাঁর নিকটে রক্ষিত খ্রিস্টানদের ধর্মীয় দ্রুশ তিনি ৬২৯ খ্রি: রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকটে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। (Macler, 2014 : 48)

আযারদোখত

রাণী বোরানের পর আযারদোখত মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করেন। ধারণা করা হয়, সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর কোনো এক উপ-পত্নীর কন্যা ছিলেন এই আযারদোখত। তিনি সাম্রাজ্যে নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের চরম গোলযোগ ও রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনীও জড়িয়ে পড়েন এবং খোরাসানের শাসনকর্তা ফারুক হরমোযদ-এর হাতে নিহত হন। (Macler, 2014 : 55)

তুরানদোখত

তুরানদোখত ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্য, রুচিবোধ ও মননশীলতার জন্য এশিয়া ও ইউরোপে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। খ্রি: পূ: ১৭৩৫ সালের দিকে পারস্যে ‘টাইরা’ নামে একটি এলাকা ছিলো। টাইরা বা তুরান নাম হতেই তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। পারস্যের বিখ্যাত কবি ফেরদৌসীর শাহনামাতে তুরানদোখতের জীবনী নিয়ে চমৎকার কাহিনী স্থান পেয়েছে। (Rose, 1998 : 29-54)

সম্রাট মনোনয়নে নারী

প্রাচীন পারস্য সভ্যতার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর বিচরণসহ তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হতো তা ছিলো উল্লেখ করার মতো। এ প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যক্তি সম্রাট নির্বাচনে রাণীর ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যায়। পারসিক সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসক কে হবেন তা রাণীর ইচ্ছানুসারে মনোনীত হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্রাজ্ঞী ক্যাসাডেনে পারস্যের রাজতন্ত্রের প্রচলিত নিয়মানুসারে বড় পুত্র শাহজাদা দ্বিতীয় ক্যামবিসেসকে পরবর্তী সম্রাট হিসেবে মনোনয়ন দান করে যান। এমনকি বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী অটোসাও পারস্য সাম্রাজ্যের পরবর্তী সম্রাট কে হবেন তা ফলকবন্ধ পর্যন্ত করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বড়পুত্র আরটুবাযানেসকে বাদ দিয়ে ছোট পুত্র জারেক্সেসকে তাঁর সাম্রাজ্যের পরবর্তী সম্রাট হিসেবে মনোনীত করে যান। (Cotterell, Arthur, 1998 : 434) তাই বলা চলে, সম্রাজ্ঞী কর্তৃক পরবর্তী সম্রাট নির্বাচন সেই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি সমাজের আস্থা প্রতিপন্ন করে।

পরিশেষে বলা যায়, শত প্রতিকূলতা, হেরেমের একঘেয়ে জীবন, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রাজপরিবারগুলোর চরম অস্থিরতার মধ্যেও রাজনীতি, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর উন্নয়নে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই নারীগণ নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে গেছেন। রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণির নারীরা সাম্রাজ্য পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যুদ্ধকালীন সময়ে নেতৃত্ব প্রদান, যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান, যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা হিসেবে অংশ নেওয়া ও বীরোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি কাজ সাবলীলভাবে সম্পাদন করে গেছেন। ছেলেদের মতো তাঁদের

অনেকেই ছোটবেলা হতে তরবারি পরিচালনা, ঘোড়ায় আরোহণ হতে শুরু করে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশলও শিখতো। অথচ বিংশ শতকে পৃথিবীতে দেশে দেশে সামরিক বাহিনীগুলোয় নারী সংযুক্তি মাত্র চালু হয়েছে। কী আশ্চর্যজনক উদার ছিল পারসিক জাতি। আর তাদের নারীরাও কী নিদারুণ পরিশ্রম করে গেছেন সে সময়ে যা ছিলো অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয়!

পারসিক নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা

যুগে যুগে খুব কম নারীই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়েছেন। আর প্রাচীনকালে এ অবস্থা ছিলো আরো করুণ। অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় এখানেও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিলো না। পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বসবাসকারী তখনকার মানুষের জীবন আজকের ন্যায় এতটা সহজসাধ্য ছিলো না। জন্মের পর নারীরা পরিবারেই প্রথম বধূনার শিকার হতো। কিছু নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও তা আপামর নারীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি।

নারীর কাজ-কর্মের সুযোগ-সুবিধা

সমাজে কঠোর শ্রেণিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় শ্রেণিবৈষম্য অনুসারে নারীরা কাজ করতো। সাধারণ নারীরা সন্তান প্রতিপালন, ঘর-সংসারের কাজ, রান্না-বান্না, কৃষিকাজ, সেলাই ইত্যাদিসহ ঐ সময়ের গৃহস্থালির উপযোগী কাজসমূহ করতেন। এ কাজগুলো বর্তমান যুগের সমাজেও বিদ্যমান। গৃহস্থালি কাজের মধ্যেও তাঁরা নির্যাতনের শিকার হতো। যেমন : লাঙ্গল দিয়ে চাষের পশু না থাকলে কখনও তাদেরকেই জোয়াল টেনে জমি চাষ করতে হতো। (হামিদা : ১৯৯৬, ২৭) অভিজাত নারীগণ গৃহস্থালি কোনো কাজকর্ম করতো না। কাজ করতো চাকর ও দাসরা।

অর্থ-প্রশাসনে নারী

পারসিক সাম্রাজ্যে অভিজাত শ্রেণীর নারীগণ প্রশাসনিক কাজ করার সুযোগ পেতো। যেমন সম্রাট খসরুর খ্রিস্টান স্ত্রী সম্রাজ্ঞী বোরান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলো। তিনি রাজকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে সাম্রাজ্যে জনগণের উপর চালু করার বোঝা শিথিলসহ রাজ্যব্যাপী পুরাতন পাথরের সেতুগুলো পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থাও করেছিলেন। (Rose, 1998 : 60-70)

সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা স্বত্ব

নারীদের মধ্যে সমাজের নিচু স্তরের নারীদের চেয়ে উঁচু স্তরের নারীগণ অধিক সুবিধা লাভ করতো। সাধারণভাবে পিতা, স্বামী বা সন্তানের সম্পত্তিতে নারীদের কোনো অধিকার ছিলো না। এ সমাজে নারীরা ছিলো বাজারের হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের ন্যায়। তবে তাদের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা যেভাবে নির্ধারিত হতো তাতে প্রধান স্ত্রী ও তাঁর পুত্ররা সমান সম্পত্তি পেতো, অবিবাহিত কন্যাগণ পুত্রের অর্ধেক পেতেন, আর সেবাদানকারী স্ত্রী ও তাঁর সন্তানগণ ওয়ারিশ হতো না। তবে চাইলে পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাদের জন্য কিছু নির্দেশনামা বা হিবা করে যেতে পারতেন। এজন্য অভিজাত নারীগণের মর্যাদাদানের জন্য কখনো বা আইন করে বিধান তৈরী করা হতো। (মুতাহহারী, ২০০৪ : ১৭৫) তাদের সম্পত্তির বন্টন পদ্ধতিতে কখনো বা বিয়ের কনেরা পাত্রপক্ষ হতে দেনমোহর পেতো। এটা ছিলো সম্পদ বন্টন রীতির একটি ভালো দিক। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তির অংশ বিনা বাধায় অভিজাত পরিবারের নারীগণ পেতেন। পূর্বের ধারাবাহিকতায় পুত্র বা কন্যা কখনো জামাতাও সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচিত হতেন। যেমন : সাসানীয় সম্রাট খসরু পারভেজের দুই কন্যা বুরানদোখত ও আযারদোখত পর্যায়ক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অপরদিকে তাদের কোনো কোনো গোত্রের মধ্যে ঋণগ্রস্ত পিতা বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বা কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের জঘন্য প্রথাও প্রচলিত ছিলো। (Beck & Keddie, 1978 : 37 ; মুতাহহারী, ২০০৪ : ১৭৬) রাজধানী বা নগরে বসবাসকারী নারীগণের রাজধানী বা নগরকেন্দ্রিক জমিজমা বা সম্পত্তি রাখার অধিকার ছিলো। তাদের রাজধানীসমূহে যেমন : পার্সিস বা ফারস প্রদেশ ব্যতীত দূরের প্রদেশেও যেমন মিশর, ব্যাবিলন, সিরিয়া, মেডিয়া ইত্যাদি রাজ্যেও সম্রাজ্ঞীগণ জমি রাখতে পারতো। এমনকি জমি ক্রয়-বিক্রয় পর্যন্তও তাঁরা করতে পারতো। (Plutarc, 1871 : 85) অথচ এর অর্ধশতক পরে ইউরোপ ও রোমান নারীরা নিজস্ব ব্যবসা ও জমির মালিক হবার অধিকার হতে বঞ্চিত ছিলো। বিংশ শতকে এসেও নারীরা তাদের নিকটাত্মীয়দের সম্পদের অংশীদারিত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে, ভারতে এ সংকট আরো প্রকট।

ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার

পারস্যে কৃষি জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম হলেও প্রাচীন পারস্য সমাজের নারীরা ব্যাপকভাবে বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতো। পুরুষের পাশাপাশি নারীগণের ব্যবসা-বাণিজ্যে উপস্থিতি ছিলো উল্লেখ করার মত। সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো সবচাইতে বেশি। এ প্রসঙ্গে সাধারণ পরিবারের মেয়ে ইরদাবামার (আবির্ভাবকাল : ৪৮৮ খ্রি. পূর্বাব্দ) নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি বিশাল ভূসম্পত্তির মালিকানা সহ রাজ প্রশাসনে উচ্চপদ লাভ করতে সক্ষম হন। (Herodotus, 1030 : 121-2) ইরদাবামা তাঁর অধীনে থাকা ৪৮০ শ্রমিকের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ‘মাটিসটুককস’ নামক একটি সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে নারী শ্রমিকও ছিলো, যারা পারিশ্রমিক পেতেন। পদমর্যাদা ও সময়ের চুক্তিতে নারী শ্রমিকগণ কাজ করার বিনিময়ে রেশন পেত। তারা ব্যবস্থাপকের পদও অলঙ্কৃত করতো। প্রধান নারী ব্যবস্থাপককে পারসিক ভাষায় ‘আহাসশাহরা’ বলা হতো। (Plut., Art. 27.7; Diod. Sic., 14.26.4 ; Maria, 1996 : 72-77) সে মদসহ অধিক পরিমাণে রেশন পেতো। এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে, তখনও তাদের নারীগণ কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করতো।

ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে আরও জানা যায়, প্রাচীন ইরানে নারী মাতৃত্বকালীন সময়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত হতো। তবে পুত্র সন্তানের মায়েরা কন্যা সন্তানের মায়েদের চাইতে বেশি সুবিধা ভোগ করতো। প্রসূতি মাতা, নার্স এমনকি গর্ভবতী নারীদের পর্যন্ত তখন রেশন দেওয়া হতো। সরকারিভাবে অভিজাত নারীরা দেশে নানাধরনের সেবামূলক কাজে অংশ নিতো। সম্রাট তৃতীয় শাপুরের (রাজত্বকাল ২৮৩-৮৮ খ্রি. পূর্বাব্দ) স্ত্রী ‘জ্যেয়ারনজেম দেনাগ’ সাধারণ জনগণকে সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুদান প্রদান করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধরনের সেবামূলক কাজের রাজকীয় চিত্র সম্বলিত রূপার পাত্র পাওয়া গেছে। (Robert, 1968 : 221)

তাই বলা যায়, মেদিয়াসহ সমগ্র পার্সিয়ান সভ্যতায় অভিজাত শ্রেণীর নারীগণ পুরুষের সমকক্ষ হয়ে সব ধরনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখতে পারতেন। তবে নিম্ন শ্রেণির নারীগণ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিলো। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবেতর জীবন-যাপন করতো।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

সমসাময়িক বিশ্বের তুলনায় প্রাচীন পারস্যের সাংস্কৃতিক অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিলো। ইরানিগণ আদিকাল থেকেই ছিলো সভ্য ও সংস্কৃতিমনা। তাদের সমৃদ্ধশালী প্রশাসনিক অবকাঠামো, চিত্রকলা, শিল্প-সংস্কৃতি, কুটিরশিল্প গড়ে ওঠার পিছনে নারীর অবদান ছিলো ব্যাপক। বিশ্ব ঐতিহ্যের অনুপম নিদর্শন হলো, এখানকার মাদ সভ্যতায় ব্যবহৃত নানাবিধ উপকরণ। এ সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি তেহরান হতে ২৫০ কি.মি. দূরবর্তী ইরানের 'কাশান' নগরীতে আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। (Earnest, 1992 : 25) ঋতুবেচিত্রের দেশ পারস্যে প্রাচীনকাল থেকেই পার্সেপোলিস, ইসফাহান, ফারস ইত্যাদি প্রদেশে শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিলো।

অশ্লীলতা

পারসিক সম্রাটগণ তাদের জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদে বিলাসী জীবন যাপন করতেন। তাঁরা নিজেদেরকে মহামহীয়ান ও স্বর্গীয় ভাবতেন। রাজা বা সম্রাট ও রাণীমাতাগণ রাজদরবারে আবির্ভূত হলে সভাসদ ও উপস্থিতিকে তাদেরকে কুর্নিশ করা ছিলো বাধ্যতামূলক। রাজতন্ত্রের অপরিসীম ক্ষমতা ও মর্যাদা জনগণের নিকটে প্রতিভাত করার জন্য বাদশাহগণ দরবার হলকে হিরা, মণি, মুক্তা জহরত দিয়ে সজ্জিত করতো। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ১৭৫) রূপসী নারীগণ ছিলো তাদের ভোগের সামগ্রী। রাজদরবারে অশালীন নৃত্য, গীত করতে তাদের বাধ্য করা হতো। সম্রাটগণের মনোরঞ্জনের জন্য হেরেমে দাসী-বাঁদীদের বিশাল দল থাকতো। সম্রাট কায়খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মতো ইতিহাস প্রসিদ্ধ সম্রাটগণ পর্যন্ত নারীদের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। যেমন: সম্রাট পারভেজ এর একই সময়ে চৌদ্দ হাজার স্ত্রীর স্বামী ছিলেন। (মুতাহহারী, ২০০৪ : ১৯০) এর মধ্যে একশরও বেশি ছিলো তাঁর নিকটাত্মীয়। তাই প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে অতিষ্ঠ নারীদের জীবন তখন বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। এ ধরনের বিলাসিতার কারণে নারীরাও চরম উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে।

গ্রিক বীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ৩৩৪ খ্রি. ৫ নভেম্বর তারিখে পারস্য সম্রাট দারিয়ুস-৩ কে পরাজিত করে মেদিয়া (পারস্য) দখল করলে গ্রিকদের খোলামেলা সংস্কৃতি মেদিয়ার রুচিশীল ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে আঘাত হানে। (শাহনেওয়াজ, ২০০৩ : ২২৯) পুরণষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব ও খবরদারি করা শুরু করে। এক

পর্যায়ের নারীরা শুধুমাত্র সন্তান জন্মদান ও উপভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়। নারীদের মর্যাদা, সম্মান মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

আর সমাজের নিচু শ্রেণির ব্যক্তিদের এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ ছিলো না। কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের মাধ্যমে তাদেরকে জীবন অতিবাহিত করতে হতো।

পোশাক ও সাজসজ্জায় নারী

রাজকীয় নারীগণ অত্যন্ত সুন্দর ও কারুকার্যখচিত, খোলামেলা লম্বা হাতার পোশাক পরিধান করতো। কোনো সময় তারা মুখ আবৃত রাখতো, আবার কখনো অনাবৃত করেও চলতো। প্রাচীন এসিরিয় সভ্যতার নারীদের মুখ আবৃত করে চলাফেরার যে বৈশিষ্ট্য ছিলো, তা পরবর্তীকালের নারীদের মধ্যে অনুসৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। (হালিম ও নুরুন্নাহার, ২০০৮ : ৬৭)

নেকলেস, ব্রেসলেট, রিং, মুক্তা ও হিরা-জহরতের গহনায় সজ্জিত থাকার প্রচলনে তারা অভ্যস্ত ছিলো। তাঁরা কোমরবন্দ সম্বলিত বিশাল ঘেরের পোশাকও পরিধান করতো। পোশাকের এ রীতি উঁচু শ্রেণির নারীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ১৭৭) সাধারণ নারীরা এসব পোশাক পরিধানের কথা চিন্তাও করতে পারতো না।

কুটির শিল্প ও নারী

মানসম্মত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও তাতে নান্দনিকতা আনয়নে ইরানের কারিগরগণ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পারস্যের নারীরা এ শিল্পকার্যে নিযুক্ত থেকে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। (মুতাহহারী, ২০০৮ : ১৮১) তখন ইরানে বিশাল সেনাবাহিনী, যুদ্ধাস্ত্র, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য, নয়নাভিরাম শহর নগর ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও শাসকগণের অত্যধিক বিলাসী জীবন যাপন, জনগণের উপর অত্যাচারে সাধারণ মানুষ শাসকশ্রেণির উপর খুব বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ায় ধীরে ধীরে পারস্য শিল্প-সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিকভাবেও নারীরা তখন অধঃপতিত ও নিগৃহিত হয়ে দিন অতিবাহিত করছিলো।

নারীর ধর্মীয় অবস্থা

প্রাচীন ইরানীয় সমাজে মাজুসি বা যরথুস্ত্রীয়, মানি, মাযদাক ও ইহুদি ধর্মের প্রচলন ছিলো। এ সকল ধর্ম বা অনুশাসন নারী সমাজের প্রকৃত মুক্তির পথ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছিলো।

যরথুস্ত্রবাদ

ইরানে যে সকল ধর্মমত প্রচলিত ছিলো তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলো যরথুস্ত্রীয় মতবাদ। মনীষী যরথুস্ত্র ছিলেন এই ধর্মমতের প্রবক্তা। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তিনি ১৭৬৫ খ্রি. পূ. আবার কেউ মনে করেন তিনি ৬৬০ খ্রি: পূর্বাব্দে তদানীন্তন ইরান বা মেদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। (আবুবকর ও কাদের, ২০১৪ : ২৩৯) তবে দ্বিতীয় মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। (Diakonoff, 1985 : 70-90) তাঁর প্রবর্তিত এ ধর্ম গ্রিক ঐতিহাসিকদের নিকটে ‘যরথুস্ত্রীয়’ (Zoroastrianism) নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক কোহলারের মতে, যরথুস্ত্রীয় ধর্ম ‘মাজুসি’ ধর্মের পরিবর্তিত অবস্থা। (Jewish encyclopaedia) এরা অগ্নি উপাসক, পারস্য যার উৎপত্তিস্থল ছিলো। এজন্য এর অপর নাম পারসিক ধর্মও। বর্তমান বিশ্বে এদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম হল ‘আবেস্তা’। (জাকারিয়া ও কাদের, ২০১৪ : ২৪১) পারসিক একামেনিড সম্রাট দারিয়ুসের সময়ে যরথুস্ত্রীয় ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। (মানে ইবনে হাম্মাদ, ১৪১৮ হিঃ : ৭২৪-৭৩২) পুরো সাসানিয় শাসনামলেই এটি তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বিবেচিত ছিল। খ্রিস্টীয় ৩য় শতাব্দী হতে এরা পার্সী বা অগ্নি উপাসক নামে পরিচিত হতে থাকে। (ইবরাহিম ও আনীস, ১৯৭২ : ৮৫৫)

এ ধর্মমত মানুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী ছিলো। নারী-পুরুষ সমাজে নানান দিক দিয়ে সমমর্যাদা লাভ করবে এ ধর্মমতের ধর্মগুরু যরথুস্ত্র এমন চিন্তাধারা প্রচার করে গেছেন। (Tooran, 2008 : 27) ‘আহুরা মাযদা’ হলেন যরথুস্ত্রীয়ান প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান যিনি ফারসি ভাষায় ‘আহুরা মাযদা’ নামে আখ্যায়িত। (Ahura Mazda, Wikipedia) যরথুস্ত্রীয়ানদের মতে, আহুরা মাযদা হলেন সত্যের দেবতা, যিনি মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “মানবজাতি একই উৎস হতে আগত, তাই তারা বন্ধুত্ব ও সততার পথে পরিচালিত হবে।” জৈবিক চাহিদাকে অবদমিত না রেখে নর-নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার আদেশ দেন আহুরা মাযদা। তিনি আরও বলেন যে, “জৈব চাহিদা পূরণই বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য হতে

পারে না বরং বিবাহ মানুষকে পবিত্র রাখে।” (Christensen, 1933 : 233) এছাড়াও এ ধর্মমতে পরিবারে স্বামীদের নিকটে স্ত্রীদের উচ্চ আসন ছিলো। স্বামীদের সেবাদাসী বা আনুগত্যের প্রচলিত ধারণার বাইরে নারীদের অবস্থান ছিলো। অন্যকথায় স্ত্রীগণ স্বামীর সাথে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো না, বরং আইনের দিক সমান ছিলো এবং তাঁরা স্বামীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্তও নিতে পারতো। পারস্য সভ্যতার সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে নারীগণ যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলো, তার ভিত্তি ছিলো এ ধর্মমত। (Tooran, 1987 : 27) একামেনিড শাসনামলে এই সকল নীতিকথা কিছুটা প্রতিপালিত হতো। কালক্রমে তাদের অনুসারীগণ নানা ধরনের কুসংস্কার, অগ্নিপূজা, বহু দেবতায় বিশ্বাস, যাদুবিদ্যা, পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদি চর্চায় ব্রতী হয়। একই সাথে বাদশাতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজে যরথুস্ট্র বা মাজুসি পুরোহিতদের ভীষণ প্রভাবে সাসানীয় শাসনামলে নারীদের প্রকৃত সম্মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে ও নারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে প্রতিস্থাপন বিবাহ, পুরুষদের বহু স্ত্রী গ্রহণ, বিনা কারণে স্ত্রী বর্জন ও বিবাহ ভিন্নও স্ত্রী গ্রহণ ইত্যাদি অবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। (Maria, 1976 : 127)

এক পর্যায়ে ধর্মীয় পুরোহিতদের অত্যধিক বাড়াবাড়ির কারণেই জনগণ এ ধর্মমত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে। বিশেষত যরথুস্ট্র পুরোহিতরা সাম্রাজ্যে অন্য কোনো ধর্মমত চালুর অনুমতি দিতে চাইতো না। কোনো কোনো শাসক জোরপূর্বক জনগণকে এ ধর্মে দীক্ষাদানের চেষ্টা করতো। এ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় মানুষ মৃত্যুর মুখেও ঢলে পড়ত। (Edward, 1977 : 185) এ কারণে সাধারণ জনগণ বিশেষত অন্য ধর্মের নারী-পুরুষ শাসকশ্রেণীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলো।

বর্তমান বিশ্বে স্বল্পসংখ্যক হলেও এর অনুসারী বিদ্যমান। বর্তমানে তারা যরথুস্ট্র ধর্মাবলম্বী পরিচয়ে ইরান, ভারত ও আমেরিকা, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করে আসছেন। (আবুবকর, কাদের, ২০১৪ : ২৩৯) তাঁদের সমাজে প্রচলিত আপন ভাই-বোন, পিতা-কন্যা, মা-পুত্র ইত্যাদি মাহরম সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ প্রথা এখনো তারা নিষিদ্ধ করেনি। (Tabari, 1989 : 316-17)

মানি ধর্ম

প্রাচীন পারস্যে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে সম্রাট শাপুরের আনুকূল্যে নিজেকে নবি পরিচয়দানকারী মনীষী মানি যরথুস্ট্রবাদের বিপরীতে যে মতাদর্শ প্রচার করেন তাই ‘মানি ধর্ম’ নামে আখ্যায়িত। (Boyce & Mary, 2001 : 111) এটি বৈরাগ্যবাদী ধর্ম। এ ধর্মে নারীকে যথার্থ সম্মান, মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এ ধর্ম সন্ন্যাসবাদের কথা বলে। বিবাহ ও নারীর সাথে উঠাবসা এ ধর্মে নিষিদ্ধ করায় জনগণের মধ্যে এ ধর্ম তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। নারীদেরকে হেয় করে প্রকারান্তরে নারীর অধিকারকে এ ধর্মে ভুলুঠিত করা হয়েছে। (Idem, 1997 : 285) অবশ্য এ ধর্ম পরবর্তীতে টিকে থাকতেও পারেনি।

মাযদাক ধর্ম

প্রাচীন পারস্যে যরথুস্ট্রবাদ ও মানিবাদের পাশাপাশি মাযদাক (৪৮৮-৫২৮ খ্রি: পূ:) নামে আরেকটি দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়, যার প্রবক্তা ছিলেন যরথুস্ট্র পুরোহিত বামদাদের পুত্র মাযদাক। (Ehsan, Yarshater, 1983 : 995-997) তখন সমাজে উঁচু শ্রেণি হিসেবে গণ্য হতো শাসক, সামরিক কর্মকর্তা, পুরোহিত, বণিক, শিল্প মালিক ও অমাত্য শ্রেণি। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হেকিম-কবিরাজ, ডাক্তার ছিলো এর পরে। সর্বনিম্নে ছিল সাধারণ শ্রমিক, দাস ও ভূমিদাস শ্রেণি। রাষ্ট্রের সকল জমি শাসক, সামরিক ও পুরোহিত শ্রেণি ভোগ করতেন বলে সমাজে শ্রেণিতে শ্রেণিতে নানারূপ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিলো। নিম্ন শ্রেণির উঁচু শ্রেণিতে প্রবেশাধিকার ছিলো রুদ্ধ। তাঁদের অত্যন্ত কষ্টে ও নির্যাতিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হতো। (আমজাদ, ২০০৭ : ৬০-৬১) পারস্য সমাজে সাধারণ মানুষ শাসকশ্রেণির উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলো। পারস্য সম্রাট কোবান, যিনি ছিলেন সম্রাট খসরু আনুশিরওয়ানের পিতা তিনি সাম্রাজ্যের পুরোহিত ও সামন্তশ্রেণির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাযদাক ধর্মমতে দীক্ষা নেন ও তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে সম্রাট প্রথম খসরু তাঁর পছন্দনীয় ধর্ম যরথুস্ট্র প্রচার করতে গিয়ে মাযদাকপন্থীদের হত্যা করা শুরু করলে এ ধর্মমত বিলুপ্ত হতে থাকে। (Ehsan, Yarshater, 1983 : 999) বিশ্বে ইসলাম প্রচারের প্রথম দুই বা তিন দশক পর্যন্ত এ ধর্মমত চলেছিলো। এ ধর্মমত নারীদেরকে কোনো মর্যাদা দেয়নি।

মাযদাক দর্শনের মূলকথা ছিলো সমাজে মানুষের অর্থনৈতিক সমতা সৃষ্টি করতে হবে। এটা করতে চাইলে ধনীদের নিকট থেকে সম্পদ নিয়ে দরিদ্রদের দিতে হবে। তাঁদের মতে এ সমতা তৈরী হলে সমাজে সম্পত্তি

নিয়ে হানাহানি, মারামারি বন্ধ হবে। (Wherry, Rev. E.M, 1882 : 66) এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ ধর্মমতে নারীর দায়িত্বভার তাদের নিজের ক্ষেত্রে তুলে দিয়ে এক চরম পন্থা থেকে আরেক চরম পন্থার দিকে নারীদেরকে ধাবমান করেছিলো।

এ ধর্মমত বিশ্বে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। তবে এ কথা নির্দিধায় বলা যায় বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিকাশের ১৩৬০ বছর পূর্বেই ইরানে প্রচারিত মাযদাক ইজমই ছিলো তখনকার বিশ্বের অন্যতম সাম্যবাদী মতবাদ। (Idem, 1997 : 285)

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম রাষ্ট্র পারস্যের চোখ ধাঁধানো ও জমকালো এই সভ্যতায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কখনও নারী-পুরুষের সমতা লক্ষ্য করা যায় আবার কখনও তাঁদের মধ্যে এতো ব্যবধান ছিলো যা নারী জাতির নিপীড়িত অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। পারস্য সমাজ তখন উঁচু শ্রেণীর নারীগণ বীরদর্পে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সফলতা লাভ এমনকি চ্যালেঞ্জিং পেশায় নিযুক্ত হয়ে এ সভ্যতার বিকাশে অবদান রাখতে সক্ষম হন, কিন্তু সাধারণ শ্রেণির নারীরা সার্বিকভাবে ছিলেন অবহেলিত। সকলেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলো। মানবতার ধর্ম ইসলামের আবির্ভাবে এ সকল সামাজিক অনাচার ও বৈষম্য বহুলাংশে দূরীভূত হয়।

পরিচ্ছেদ-২ : প্রাক ইসলামি ইয়েমেনে নারী

প্রাক ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যে ইয়েমেনের নারীদের অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ছিলো। মধ্যপ্রাচ্যে বহু পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা অনুসারীসহ এ অঞ্চল আলোকিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন হযরত ইব্রাহিম (আ:), হযরত মূসা (আ:), হযরত ইসা (আ:), হযরত ইসমাইল (আ:)। দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন একটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে নেপথ্যে তাদের ভূমিকা ছিলো। আর সমগ্র আরবের মধ্যে ইয়েমেনের আবহাওয়া ছিলো আরবের মধ্যে বসবাসের জন্য আরামদায়ক। এর ভূমিও খুব উর্বর। পাহাড় হতে নির্গত পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে এখানে উত্তম সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতার কারণে ইয়েমেন প্রাচীনকালে ইউরোপবাসীর নিকটে সুপরিচিত

ছিলো। পশ্চিমারা এ শহরটিকে ‘এরোগা ফেনিক্স’ বলতো। যার অর্থ ছিলো সুখী আরবভূমি। (হিট্টি, ২০০৩ : ৬২) কেউ কেউ এ শহরটির ভগ্নাবশেষ দর্শনে শহরটিকে ইতালীর ভেনিস নগরীর সাথে তুলনা করেছে। প্রাচীন ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ নদীবন্দর ছিলো এডেন যার উপকণ্ঠে সাবার রাণী বিলকিসের রাজধানী অবস্থিত ছিলো। (ইবনে কাসীর, ২০০৭, ৪০৬) হিয়াযী আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলো আদনান। তিনি হযরত ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম (আঃ)-এর ৪০ তম অধঃস্তন বংশধর ছিলেন। আদনানের নাম হতে বিখ্যাত এডেন নগরীর নামকরণ করা হয়। এদেরই বংশধর ছিলো মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশ। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ৩৮২)

প্রাচীন ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ নগর সাবা রাজ্যের রাণী বিলকিস সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। রাণী সাবা একজন জনদরদী শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি দেশকে সুসমৃদ্ধ করতে নিজের রাজ্যে মা’আরিব নামক বাঁধ, আরব হতে সিরিয়া, ইরাক ও মিশর অবধি ইয়েমেনের সড়কপথ নির্মাণ ছাড়াও নৌপথে ভারত, মিশর ও চিনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়। একটি উন্নত নগর, সভ্যতা বিনির্মাণে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। (মুস্তাফিজ, ১৯৯২ : ৯৭)

প্রাক ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যে ‘পেট্রা’ নামে একটি ঐতিহ্যশালী প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ ইয়েমেন হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের চলাচলের পথে আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মালভূমির ৩০০ ফুট উঁচুতে পেট্রা শহরটির অস্তিত্ব বর্তমানে দৃষ্টিগোচর হয়। আরবে খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষদিকে প্রায় ৪০০ বছর ধরে এ জমজমাট শহরের অবস্থান ছিলো। (হিট্টি, ২০০৩ : ৬২)

তাই ইয়েমেন শহরের প্রাচীন অবস্থা হতে আমরা বুঝতে পারি, সেখানে একটি উন্নত জনপদ গড়ে উঠেছিলো যার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সমগ্র আরবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো। তবে সাধারণ নারীরা এখানেও শোচনীয় অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতো।

পরিচ্ছেদ-৩ : প্রাক ইসলামি যুগে আরব উপদ্বীপে (মক্কা-মদিনা) নারী

আরব উপদ্বীপের অবস্থান ও পরিচিতি

এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত বৃহত্তম আরব উপদ্বীপ, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান সাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং জর্ডান মরুভূমি, উত্তরে ইরাক ও সিরিয়ার মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত ছিলো। আরব হলো একটি সেমেটিক শব্দ, যার অর্থ ‘পরিত্যক্ত মরুভূমি বা যে সকল জাযাবর জাতি এখানে ওখানে জীবিকার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতো তাদেরকে আরব বলা হতো। (ওল্ড টেস্টামেন্ট, ২১ : ১৩ ; হিট্রি, ২০০৩, ৬) আরব উপদ্বীপকে ‘জাজিরাতুল আরব’ও বলা হয়। এটা তিনদিকে পানি দ্বারা বেষ্টিত। (Khuda, 1980 : 2) ভৌগোলিকভাবে উত্তর আরব, মধ্য আরব ও দক্ষিণ আরব এই তিন ভাগে আরব বিভক্ত ছিলো। উত্তর আরবের অধিকাংশ এলাকা মরুভূমি। মধ্য আরব হিজাজ, নজদ ও আল-আকসা এ তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিলো। বিখ্যাত মক্কা, মদিনা ও তায়েফ ছিলো হিজাজ প্রদেশের প্রধান শহর। জেদ্দা ও ইয়েনবু ছিল আরব উপদ্বীপের প্রধান বন্দর। (নূর নবী, ২০০৯ : ৩১) এ এলাকার আবহাওয়া শুষ্ক ও অনূর্বর থাকায় মানুষের মেজাজ-প্রকৃতিতে এর প্রভাব ছিলো লক্ষ্যণীয়। এখানকার সামাজিক, পারিবারিক, বৈবাহিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত নাজুক। এমনকি ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মতাদর্শ পর্যন্ত তাদের উপর সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। পৃথিবীর সুধীমহলে প্রাক-ইসলামি আরব আল-আইয়ামুল জাহিলিয়াহ’ বা ‘অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ’ নামে পরিচিত। ‘আইয়াম’ অর্থ দিন, সময়, কাল আর জাহিলিয়াহ শব্দটি ‘জাহল’ ধাতুমূল হতে নির্গত যার অর্থ অজ্ঞতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া বা কোনো কিছু সম্পর্কে না জানা, জ্ঞান বিবর্জিত হওয়া, কোনো কিছু সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস রাখা, যে কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে না করা ইত্যাদি। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮৬ : ৪) আবার ঐতিহাসিক নিকলসন ‘একে শিষ্ঠাচারের বিপরীত বলে’ অভিহিত করেছেন। (নিকলসন, ১৯৬৬ : ৩০) অর্থাৎ যে যুগে মানুষ পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছিল, যাদের নিকটে কোনো ধর্মগ্রন্থ ছিলো না সে যুগকে ‘আল-আইয়ামুল জাহিলিয়াহ’ বলা হয়। আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, “তারা খেয়াল খুশীমত চলে ও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।” (আল-কুরআন, ৫৩ : ২৩)

আরবিয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

আরবের জাহিলী সমাজে নারীদের সাথে যে নির্মম আচরণ করা হতো। সেগুলোর অন্যতম ছিলো

কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া

কন্যা সন্তান জন্ম দেয়াকে তারা অত্যন্ত লজ্জা ও অপমানের বিষয় ভাবতো। কন্যার প্রতি তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা এত চরমে পৌঁছেছিলো যে, কারও ঘরে কন্যা জন্মালেই নবজাতক কন্যার পিতা শিশুটিকে জীবন্ত কবর বা অন্য উপায়ে দুনিয়া হতে সরানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। কন্যা সন্তান হত্যা করা তাদের নিকট এত গৌরবের ছিলো যে তারা প্রকাশ্যেই এটা করতো। এটা অনেকটা প্রচলিত নিয়মেই দাঁড়িয়েছিলো ও আরবে সংঘটিত এ অনাচার একটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। এভাবে মানুষ হত্যার জন্য সমাজ তাদেরকে কোনো শাস্তিও দিত না। অর্থাৎ এর পশ্চাতে সমাজের স্বীকৃতি ছিলো। আরবের প্রসিদ্ধ কিন্দা, তামিম গোত্রে কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেয়ার নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিলো। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ৩৮৬) তবে আরবের সর্বত্র ঢালাওভাবে এ প্রথাটি প্রচলিত ছিলো না।

এর পশ্চাতে আরবীয়রা নানান খোঁড়া যুক্তি দেখাতো

প্রথমত তারা ভাবতো, দরিদ্র পরিবারে কন্যা শিশু হলো একটা বাড়তি ঝামেলা। উপার্জনের জন্য পুত্রই ভালো। নারীর চরম অসহায়ত্ব ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চিত্র ফুটে ওঠে এ বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডে। প্রাচীন আরবে মানুষ এতই নিষ্ঠুর ছিলো যে, অনেক গোত্রেই কন্যা সন্তান জন্মানোর পর তাকে পুঁতে মেরে ফেলতো। বলা হতো গোত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে তারা এটা করে। জাহিলী আরবে যে কন্যা সন্তান জীবন্ত পুঁতে মারার প্রচলন ছিলো তা আব্বাসীয় যুগে সংকলিত প্রাচীন কাবছেছ ‘দীওয়ানুল-হামাসা’-এ লিখিত বিবরণ হতে জানা যায়। প্রাচীন আরবের এ বর্বর প্রথা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রুভেন লেভী বলেন, সমাধি হলো কনের সর্বাপেক্ষা উত্তম বর এবং কন্যাদের সমাধিস্থ করা একটি সম্মানজনক কাজ।” (রুবেন, ১৯৯৫ : ৪৪) নারীর জীবনের এ বর্বরোচিত চিত্রটি পবিত্র কুরআন শরীফে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“যখন কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে গ্লানিহেতু নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? সাবধান! তারা যা ভাবে তা কতই না নিকৃষ্ট।” (সূরা নহল, আয়াত নং ৫৮-৫৯) এ সম্পর্কে রুভেন লেভী আবারও বলেন, “আরবদের ভয় ছিলো কন্যা সন্তান তাদের দারিদ্র্য ও লজ্জার দিকে নিয়ে যাবে। অথবা কন্যারা যুদ্ধে ধৃত হয়ে শত্রুদের দাসী হিসেবে ব্যবহৃত হবে যা অনাদিকালের জন্য গোত্রের লজ্জার বিষয় হবে।” (রুবেন, ১৯৯৫ : ৪৪) এখনও কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে অনেকের মুখ কালো হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত অবস্থাসম্পন্ন অনেক পিতা-মাতাও আপন ঔরসজাত কন্যাকে মেরে ফেলতো এজন্য যে, কন্যা শিশু তাদের জন্য লজ্জা ও অপমান বয়ে আনবে, কেননা কন্যারা তাদের সমাজে যুদ্ধবন্দী হয়ে অন্য গোত্রের দাসীতে, শত্রুদের পত্নী বা উপ-পত্নীতে পরিণত হতো। চরম বিশৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে প্রাচীন যুগে সমাজের শক্তিশালীরা সুযোগ পেলেই দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এ অত্যাচার ও জুলুমের সম্মুখীন ছিলো। বিশেষত নারীদের সম্মান অধিকতর করণ অবস্থায় পর্যবসিত হতো। নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণের সহজাত প্রবৃত্তি ও পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক শক্তির দুর্বলতা, সমাজে নারীর নিরাপত্তার যথার্থ কোনো ব্যবস্থা না থাকা, ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হওয়ায় ইত্যাদি কারণে নারীর উপর জোর বা শক্তি প্রয়োগ করা সহজ হতো। (ইউসুফ, ১৯৯৫ : ৪৫) এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন নারীকে আজও হতে হয়।

তৃতীয়ত চরম অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও নির্ধূর কর্মে লিপ্ত আরবীয়রা কখনও মানত পূরণের জন্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে শিশু কোরবানি করতো। এ কাজে নারীরাও অনেক সময় शामिल হতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়াল্লা বলেন, “নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব মানুষ যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে।” (সূরা আল-আনআম, আয়াত নং ১৩৭)

জাহিলিয়া যুগে কন্যা সন্তান জীবন্ত কবরস্থ করার কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ এতদসঙ্গে দেয়া হলো। কায়েস ইবনে আসেম নামক জনৈক আরব জাহিলী যুগে আট-দশটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করেছিলো। কন্যার মা যে একজন নারী সে কায়দা-কৌশল করেও পাষাণ পিতার খপ্পর হতে কন্যাদেরকে

বাচাঁতে পারেনি। (মুল্লা, ১৯৫৭ : ৭৭) তখন এমনই একটি সময় ছিলো যে কারও বিপদে সে নারী বা শিশু যাই হোক না কেন সমাজের অন্য মানুষেরা এগিয়ে আসতো না। সে সময়ের সমাজে মানবতা এমনই ভুলুষ্ঠিত ছিলো।

এরকম আরও কিছু দুঃজনক ঘটনা হাদিস শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যা শুনলে যেকোনো বিবেকবান মানুষের হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠবে। এক আরব ব্যক্তি জাহিলী যুগে কিভাবে স্বীয় কন্যাকে জীবন্ত কবরস্থ করেছিলো সে নিষ্ঠুর ঘটনা একদিন রাসূল (সা:) কে শোনান। তা শুনে রাসূল (সা:) কেঁদে ফেলেন। তাঁর দাড়ি মোবারক অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাটি ছিলো, লোকটির একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে ছিল যাকে ডাকলেই সে কাছে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরতো, আদর করতো। কিন্তু এ কি নিষ্পাপ স্নেহ, ভালোবাসা নিষ্ঠুর পিতার অন্তরের কুমনোবৃত্তিকে দমাতে পারেনি। পিতা একদিন মেয়েকে দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে জীবন্ত কবর দেয়ার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। কন্যাটি পিতার কষ্ট লাঘব করার জন্য তাঁর ঘাম মুছে দিতে লাগলো। এতেও নিষ্ঠুর পিতার অন্তরে স্নেহ জাগল না। সে জোর করে মেয়েটিকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। মেয়েটি আঝা বলে আর্তচিৎকার দিল। কিন্তু পাষণ পিতার অন্তর তখন নেকড়ে বাঘের খাবায় পরিণত হয়েছে। (মুল্লা, ১৯৫৭ : ৭৮)

তবে সে সময়ে কন্যা শিশুদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করার হাত থেকে বাচাঁনোর জন্য সমাজের অন্য লোকদের মধ্যে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয় যারা বহু মেয়েকে জীবন্ত কবর হওয়া থেকে রক্ষা করেন। জাহিলী যুগের প্রসিদ্ধ কবি ফারায়দাকের দাদা হযরত ছা'ছা' এরকম জীবন্ত দাফন হওয়া থেকে ৯৪টি কন্যাকে রক্ষা করে নিজে তাদের প্রতিপালনের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। (ইউসুফ, ১৯৯৫ : ৪৫)

অনিয়ন্ত্রিত বিবাহপ্রথা

পুরুষেরা অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিবাহ করতো ও ইচ্ছামত তাদেরকে পরিত্যাগ করতো। 'গায়লান সফী' নামক জনৈক সাহাবী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিলো। (খালেক, ১৯৯৯ : ১২০) তৎকালে বেশ কয়েকটি অনিয়ন্ত্রিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিলো। তখনকার বিবাহব্যবস্থা ছিলো বিবর্তনের ইতিহাসে একটি অবস্থান্তর প্রক্রিয়ার আওতাধীন। আরবেও স্ত্রী কেবল দাসী, বাদী ও মানববংশ বৃদ্ধির উপাদানস্বরূপ ছিলো। বিবাহ বলতেই বোঝাত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্পর্কে

সুবিক্ত আইনজ্ঞ Sir Abdur Rahim যথার্থই বলেন, “Side by side with a regular form of marriage which fixed the relative rights and obligations of the parties and determinative the status of the children. There flourished types of sexual connexion under the name of marriage. (Rahim, 1961 : 5)

ঐতিহাসিকদের মতে প্রাক-ইসলামি আরবে নিয়মিত বিবাহের পাশাপাশি তিন ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো যা ছিলো বড়ই অনিশ্চিত। নিয়মিত বিবাহে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতো ও সে অনুরোধ গ্রাহ্য হলে স্ত্রীর কল্যাণের জন্য মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করতো। তবে এ মোহরে কনের কোনো অধিকার থাকতো না। এটা তার পিতা নিয়ে নিত। (নাদভী, ১৯৮১ খ্রি:/১৪০১ হিঃ : ২৯৬) এভাবে নারীকে তার প্রাপ্য অর্থ হতে বঞ্চিত করে তাকে সহায়-সম্বলহীন করে রাখা হতো।

অপর তিন প্রকার বিবাহে নারীকে অত্যন্ত ঘৃণিত জীবন যাপন করতে হতো যা ছিলো একপ্রকার পতিতাবৃত্তির সমতুল্য। তা ছিলো

প্রথমত বংশে অভিজাত বা নীল রক্ত আমদানির জন্য কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একজন অভিজাত ব্যক্তির কাছে পাঠাতো। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী হতে দূরে সরে যেত এবং নির্ধারিত লোকটি দ্বারা স্ত্রী গর্ভধারণ করলে স্বামী তখন স্ত্রীর নিকটে আসতো।

দ্বিতীয়ত অনির্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষ এক সাথে এক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো উক্ত নারীর সন্তান প্রসব হলে সে যাকে লক্ষ্য করে বলতো, তুমি আমার সন্তানের পিতা তা হলে সে পুরুষকেই উক্ত সন্তানের পিতার দাবি মেনে নিতে হতো।

তৃতীয়ত বহুগামী নারীদের সন্তান হলে আকৃতি বিশারদকে ডাকা হতো। সে সন্তানের আকৃতি দেখে যার ঔরসজাত বলে স্থির করতো উক্ত ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে পারতো না।

এছাড়াও মুতা বিবাহ বা অস্থায়ী বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিলো। সহোদরা দুই বোনকে তারা বিবাহ করে একসঙ্গে রাখতে পারতো। এরকম অন্য নিকটাত্মীয়দেরকে তারা বিবাহ করতে পারতো। (রহীম, ১৯৮৫ : ৩৭) বিবাহের নামে এসব ছিলো পশুর মতো আচরণ।

পরবর্তীতে মুসলিম সমাজে এ সকল কুৎসিত, নিন্দনীয় বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। আর সে সকল সংস্কারে সহযোগিতা করেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট নারীরা।

তলাক/বিচ্ছেদ

প্রাক-ইসলামি যুগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। (গাজী শামসুর, ১৯৮৫ : ২৪)

ইলা : স্বামী-স্ত্রীকে শপথ করে বলতো, তোমার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ রইলো না। এতে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। একে ইলা বলে।

জিহার : স্বামী স্ত্রীকে বলত, ‘তুমি আমার মাতার পিঠের মতো দেখতে।’ একথা উচ্চারণের সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।

খোলা : স্ত্রীর বিবাহবন্ধন হতে মুক্ত হবার কোনো অধিকার না থাকলে কখনও স্ত্রীর পিতা-মাতা স্বামীকে বুঝিয়ে মোহরানার দাবি ত্যাগ করে বা নেয়া হয়ে থাকলে তা ফেরত দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার ব্যবস্থা করতো। এটা খোলা তলাক।

তলাক প্রথায় নারীর মর্যাদা সাংঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ ছিলো। তলাকপ্রাপ্তা নারী তলাকদাতার অনুমতি ছাড়া আরেকটি বিবাহ করতে পারতো না। বিধবা নারী একপ্রকার মৃতপ্রায় হয়েই বাকি জীবন অতিবাহিত করতো। তাকে পূর্ণ এক বছর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করতে হতো। এ সময় ছিলো তার ইদ্দতকাল। (গাজী রহমান, ১৯৮৫ : ২৪) এরপর তাকে পিতার নিকটে ফেরত দেয়া হতো বা অনেক সময় দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতিও দেয়া হতো না। সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৎপুত্রের যৌন উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত হতো বা কখনও সৎপুত্র তাকে বিবাহ করতো। (গাজী রহমান, ১৯৮৫ : ২৪) তলাকপ্রাপ্তা নারীকে এভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হতো।

কুসংস্কার

কুসংস্কার নিয়ে মানুষ খুব মাতামাতি করতো। তদানীন্তন সামাজিক কুসংস্কারে নারীর জীবন ছিলো অত্যন্ত বিষময়। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সমাজের ন্যায় নারীর ঋতুশ্রাব হলে তাকে ভীষণভাবে ঘৃণা করা হতো। ঐ সময়

তাদেরকে ঘরের বাইরে ছোট ছোট তাঁবু টাঙিয়ে সেখানে রাখা হতো। এই অবস্থায় তাদের সাথে কেউ মিশত না। তখন তাঁবুতে তাদের জন্যে খাদ্য-পানীয় নাকে রুমাল দিয়ে সতর্কতার সাথে নিয়ে আসা হতো। তারা মনে করতো ঋতুমতী মহিলারা কোনো কিছু স্পর্শ করলে সেটি অপবিত্র হয়ে যায়। এমনকি ঐ স্থানের বাতাসও দূষিত হয়ে যায়। এজন্য নারীকে কোনো দূরবর্তী ঘরে রেখে আসতো তারা। (হুমাযুন, ২০০১ : ৮২ ; নাদভী, ১৯৫১ : ২৯৬)

সামাজিক অনাচার

অধিকাংশ আরব তাদের নিজস্ব রুচি, কুসংস্কার, স্বাধীনতাবোধ, পৌত্তলিক ধর্ম, ধর্মহীনতা, নানাবিধ দুষ্কর্ম ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকতো। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮৬ : ৩০) এ সমাজে নারী স্বাভাবিক বিয়ে সম্পাদন করে স্বামী-স্ত্রীর সুখী জীবনযাপন করতে বাধাপ্রাপ্ত হতো। সমাজে নিয়মিত বিয়ের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি ছিলো। তখনকার পুরুষেরা যে কাউকেই বিয়ে করতে পারতো এমনকি বিনা বিবাহে অসংখ্য সন্তানের পিতাও হতে পারতো। অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় আরব ভূখণ্ডে সামাজিক অনাচারের শেষ ছিলো না।

আরবদের নিকটে মদপান, জুয়াখেলা ছিলো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। জুয়াখেলার জন্য হরহামেশা স্ত্রী, কন্যাকে বিক্রি করে ফেলতে আরবদের বিবেকে একটুও বাঁধতো না। পুরুষেরা শরাবখানায় আড্ডা দিত আর নর্তকীরা নৃত্য ও গান-বাজনা করতে থাকতো। সাথে সাথে জুয়া ও লটারি খেলাও চলতো। অনেক পুরুষ স্ত্রীকে বাজি ধরে জুয়া খেলতো। তারা পরস্পর সন্মোগ করতো ও তার সৌন্দর্য বর্ণনায় কবিতা রচনা করতো। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮৬ : ৪৫) উন্মুক্ত স্থানে তাঁরা পোশাকহীন অবস্থায় গোসল করতো। যুদ্ধে জয়ী হলে পরাজিত পক্ষের স্ত্রী ও কন্যাদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে যথেষ্টভাবে ভোগ করতো।

সমাজে পতিতাবৃত্তি চালু ছিলো। তারা আপন তাঁবুর উপরে পতাকা উড়িয়ে রাখতো। তাদেরকে ভোগ করার অধিকার সকলের ছিলো। একবার মারশাদ নামক জনৈক সাহাবী একজন পতিতাকে বিবাহ করতে চাইলে তৎক্ষণাৎ কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন, “এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিকই বিবাহ করে। (সূরা আন-নূর, আয়াত নং ৩)

অন্যান্য সমাজের ন্যায় তদানীন্তন আরবের অভিজাত পুরুষরাও স্বীয় দাসীদেরকে পতিতালয়ে প্রেরণ করে অর্থ উপার্জন করতো। যেমন মদিনায় হিযরতের পূর্বে সেখানে বসবাসরত মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই তাঁর উমায়কা ও মুসায়কা নামী দুই দাসীকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করে অর্থ উপার্জন করতেন। (ইমাম মুসলিম, ২০০২ : ৪২২)

এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞাস্বরূপ আল-কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, “স্বীয় দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বল প্রয়োগ করো না।” (সূরা আন-নূর, আয়াত নং ৩৩) সমাজে নারীর এরূপ নিম্নগামী অবস্থা ছিলো।

কাহিনা বা ভবিষ্যৎবক্তার প্রতি বিশ্বাস

তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ জাদুবিদ্যা, কাহিনা বা ভাগ্য গণনায় প্রচলিত বিশ্বাসী ছিলো। সে সময়ে মানুষের জীবন ছিলো অনিশ্চয়তাপূর্ণ। তারা যে কোনো কাজের সূচনায় কাহিনাদের দারস্থ হতো। এ কারণেই সেই সমাজে কাহিনা নামে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিলো। পাহাড়ী এলাকার জনগণ এদের বশ্যতা স্বীকার করে চলতো। সাধারণ মানুষ যাবতীয় বিপদাপদ, দুঃখ-দুর্দশায় হতাশ হয়ে ভবিষ্যত জানতে ভবিষ্যৎবক্তা বা কাহিনাদের উপর নির্ভর করতো। এজন্য সমাজে কাহিনা বা ভাগ্য গণনাকারীর খুব কদর ছিলো। সাধারণত মহিলারা এ পেশায় নিযুক্ত হয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতো। (আমীর আলী, ১৯৯২ : ৯৫) ১৫০ খ্রি. পূর্বাব্দের দিকে আরবে ‘কাহিনা’ বা ভবিষ্যৎবক্তা হিসেবে ‘বারাত’ নামের এক নারী স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলো। মানুষের ভবিষ্যৎ গণনায় অতি অল্প সময়ে সে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলো। (Asghar Ali, 1992 : 34-36)

ধর্মীয় অবস্থা

আরবরা ইহুদি, খ্রিস্টান, সাবায়ী, একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলো। এ অঞ্চলে পৌত্তলিকতার প্রসার ছিলো বেশী। (লুৎফর, ১৯৯৭ : ৭) মক্কা একটি প্রাচীন শহর। এখানে পবিত্র কাবাঘর অবস্থিত যার ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। (আল-কুরআন, ৩ : ৯৬) আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা হতে জনগণ প্রতি বছর হজ্জ পালন বা তীর্থ ভ্রমণে মক্কা আসতো। একেশ্বরবাদের পাশাপাশি আরবীয়রা তাদের পৌত্তলিকতার কারণে পবিত্র কাবাগৃহে ৩৬০ টি

মূর্তি স্থাপন করেছিলো। হুবল ছিলো এদের প্রধান ও কিছু মূর্তিকে আরবিয়রা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে পূজা অর্চনা করতো। এদের নাম ছিলো আল-উজ্জা, আল-লাত ও মানাহ (হিট্টি, ২০০৩ : ৯২) এ এলাকায় বসবাসকারী ‘সিদ্দিক’ বা বিশ্বাসী উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব পরবর্তীতে ইসলামের রূপকার হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ধর্মাচরণ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ছোটবেলা হতেই একেশ্বরবাদী ছিলেন। হযরত উরওয়া (রা:) বলেন, খুওয়াইলিদের কন্যা খাদিজার জনৈক প্রতিবেশী আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি একদিন শুনতে পেলেন যে, রাসূল (সা:) খাদিজাকে বলছেন : হে খাদিজা! আমি লাত ও উজ্জার পূজা করি না। কখনও করবো না। (আহমদ, ১৯৬৭, ২২২)

অর্থনৈতিক অধিকার

পিতা, স্বামী ও পুত্রদের সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার ছিলো না। সমাজের ঘৃণিত প্রাণীরূপে নারী বিবেচিত হতো বলে তাদের কারও সম্পত্তিতে অধিকার ছিলো না। স্ত্রীর অধিকার রক্ষায় কোনো বিধিসম্মত আইনও আরবে ছিলো না। (গাজী শামসুর, ১৯৮৫ : ২৬)

দরিদ্রতা

কিছু কারণে আরবের কিছু অঞ্চল চরম পশ্চাৎপদ হিসেবে পৃথিবীবাসীর নিকটে চিহ্নিত ছিলো। আরবে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ছিলো বেশি। এখানকার শতকরা ৭৫ ভাগ ছিলো মরুবাসী বা যাযাবর। আরব মরুময় এলাকা বিধায় এখানকার সমতলভূমি চাষাবাদের অনুপযোগী ছিলো। জলসেচের অভাব, কৃষিকার্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে তারা অভাবী ছিলো। পাহাড়ের গর্তেও তারা বসবাস করতো। অবহেলিত এ সকল মানুষ পেট পুরে খেতেও পারতো না, পরিধেয় বস্ত্রের কষ্ট সহ্য করতে হতো! এ যাপিত জীবনযাত্রা তাদের রচিত কবিতায়^৯ (নাদভী, ১৯৫১ : ২৯৪) স্থান পেয়েছে।

আরবের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী শহর ও যাযাবর সকল শ্রেণির নারী-পুরুষ হজ্জের সময় কাবাঘর তাওয়াফ করতো। অভাবী নারীরা বস্ত্রের অভাবে নগ্ন হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হতো। এ সময়ে নারীরা চিৎকার করে বলতো, এমন কেউ কি আছে যে আমাদেরকে বস্ত্র দিতে পারবে? এ কবিতার মাধ্যমে বোঝা

৯. আজ আমার শরীরের কিয়দংশ অথবা পূর্ণাঙ্গ উন্মুক্ত থাকবে, কিন্তু কাউকেও তা দর্শনোপভোগ করে আনন্দ লাভ করার অনুমতি দেই না।”

যায় দারিদ্র্যের কারণে তাঁরা অনেকটা বস্ত্রহীনভাবে চলাফেরা করতে বাধ্য হতো যা তাদেরকে পীড়িত করতো।

অভাবের তাড়নায় তাঁরা চুরিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। এছাড়াও পশুপালন, পশুচারণ, শিকার, বনজ উৎপাদন সামগ্রী বিক্রয়, লুটতরাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সুদী কারবার করে যাযাবর শ্রেণি জীবিকা নির্বাহ করতো। (Khuda, 1980 : 2) শহর এলাকার লোকেরা অর্থনৈতিকভাবে অতটা অনুন্নত ছিলো না। আরবীয়রা পুত্র সন্তান নিয়ে প্রচণ্ড রকম গর্ব ও অহঙ্কার করলেও কন্যা সন্তানের সাথে অমানবিক আচরণ করতো। তাদের নিকটে কন্যা সন্তানের কোনো মূল্য ছিলো না। প্রাচীন আরবে নারীদের জীবন ছিলো অত্যন্ত অধঃপতিত। চরম দারিদ্র্যের কারণে নারীরা জর্জরিত ছিলো।

আরবদের দিন

আরবরা লেখাপড়া জানতো না। একরোখা ও স্বাধীন জাতিসত্তার কারণে সামান্য উট, ছাগল, পানির ঝর্ণার দখল নিতে গিয়েই এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেত যা দীর্ঘকালব্যাপী সংঘটিত হতো। ঐতিহাসিক গীবনের মতে, অজ্ঞতার যুগে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিলো যা তাদের বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ ছিলো। (Gibbon, 1870 : 324) আর যুদ্ধ একবার লেগে গেলে তা বন্ধ হতে কখনও অনেক সময় লাগতো। এটিকে আমরা ‘আরবদের দিন’ বলতে পারি। যেমন পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বানু বকর এবং উত্তর-পূর্ব আরবের বানু তাঘলিব গোত্রের মধ্যে ৪০ বছরব্যাপী একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। বাসূস নামীয় এক বৃদ্ধার উটকে তাঘলিব গোত্রের জনৈক গোত্রপতি আহত করলে এ যুদ্ধ শুরু হয়। এটি বাসূসের যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (হিট্রি, ২০০৯ : ৮৩)

পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানে চুরি, লুটতরাজ, অপহরণও বেশি হতো। হিয়ায ও নজদ প্রদেশসহ সমগ্র উত্তর ও মধ্য আরবের অধিকাংশ লোকজন এ স্বভাবের ছিলো। তাদেরকেই বর্বর, অজ্ঞ বলে ইতিহাসে অভিহিত করা হয়েছে। তারা নীতি-নৈতিকতা, আচরণ ইত্যাদি দিক দিয়ে এতো অধঃপতিত হয়ে পড়েছিল যে, নারীরা বেশি বঞ্চনার শিকার হতো। সামান্য দোষ-ত্রুটির কারণে নারীদের উপর চরম অত্যাচার, নির্যাতন চালাতে আরবীয়রা দ্বিধাবোধ করতো না। অনেক সময় ঘোড়ার লেজের সাথে

নারীদেরকে বেঁধে টানা হেঁচড়া করা হতো। (মুল্লা, ১৯৫৭ : ২৯১) এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হতো তাদের। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র ছিলো না তাদের মধ্যে।

শুধু আরব কেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এরকম বিভেদ ও অজ্ঞতার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলো। সঙ্গত কারণেই একজন উত্তম চালিকাশক্তির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিলো। হিট্টির ভাষায়, “রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজ করছিলো। ফলে একজন মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র ছিলো প্রস্তুত এবং মানুষও মনের দিক হতে তাঁকে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত ছিলো।” (হিট্টি, ২০০৩ : ১০০) আবদুল মনাফ কুরাইশদের একটি শাখার দলপতি ছিলেন। আবদুস শামস, নওফেল, মুত্তালিব ও হাশিম নামে তার চারজন সন্তান ছিলো। হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিব, তার পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ। আর তার পুত্র ছিলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত ইসলাম ধর্মের প্রচারক বিশ্বনবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)। হযরত মুহাম্মদ (সা:) বিদায় হজ্জে (হিজরি ১০ খ্রিস্টাব্দ) ঘোষণা দিয়েছিলেন, “ হে মানুষ! শুনে রাখো অন্ধকার যুগের সকল বিষয় ও প্রথা আজ হতে বিলুপ্ত হলো।” (মুসলেহউদ্দীন : ১৯৮৬, ১২১ ; <http://populy.us/single-blog/biday-hajj>)

প্রাক-ইসলামি আরবকে ঢালাওভাবে আইয়ামে জাহিলিয়াহ বলা যায় না। কারণ

মানবিক মূল্যবোধ ও পরস্পরের প্রতি আচরিত আদর্শের প্রেক্ষাপটে সেই সমাজ ব্যবস্থাকে আইয়ামে জাহিলিয়াহ নামে নামকরণ করা হয়ে থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের অসংখ্য গুণাবলীর পরিচয় মেলে।

প্রাক-ইসলামি আরবে হাতেম তাই এর মতো দানশীল ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। (কাসীর, ২০০৭ : ৪০৬) মক্কার নিকটে আরাফাত ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত ওকায নামক মেলায় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি, স্থানীয় কবিরা অংশগ্রহণ করতো। এ মেলায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রাপ্ত ‘সাবায়ে মুয়াল্লাকাত’ বা শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতা কাবার গাত্রে বুলিয়ে রাখা হয়েছিল যা প্রাচীন আরবী সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ রচনা হিসেবে পৃথিবীর সুধীমহলে সমাদৃত হয়ে আছে। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮২ : ১০)

আনুমানিক খ্রি. পূ. ৪০০০ বছর পূর্ব হতে আরবে জনবসতি গড়ে উঠেছিলো। আদি সেমেটিকরা এখানে বসবাস করতো। প্রাচীনকাল হতেই আরবিয়রা ছিলো প্রসিদ্ধ জাতি। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নিকটে

আরবের অবস্থান তখন চিহ্নিত হতো ইথিওপিয়ার (প্রাচীন নাম আদিস আবাবা) কাছাকাছি অবস্থিত পূর্বের একটি দেশ হিসেবে বিশেষত জেরুজালেম অঞ্চল হতে। তাদের নিকটে আরবী ভাষায় আরবের আরেক নাম ছিলো শারক বা ‘সারাসেন’ যার অর্থ হলো বেদুইন। (হিট্রি, ২০০৩ : ৪৬)

অতীতে ফিনিশিয় নামে চিহ্নিত, গৌরবময় একটি জাতি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। এই ফিনিশিয়রা ছিলো আরবিয় বংশোদ্ভূত। গ্রিক, রোমানরাও আরবিয়দের সাথে পরিচিত ছিলো। আরবদের বাণিজ্যিক পণ্য পশ্চিমের দেশে রপ্তানি হতো। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮৬ : ৩) আরবের অবস্থানগত কারণে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে সবসময়েই এ অঞ্চল যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছে। যেমন প্রাচীনকালে আনুমানিক ৪৮০ খ্রি. পূ. পারস্য সম্রাট দারিযুস দ্য গ্রেট, সম্রাট জারেব্লেস মধ্যপ্রাচ্যের মধ্য দিয়ে গ্রিস আক্রমণের জন্য অভিযান প্রেরণ করেছিলো।

এ এলাকার কিছু কিছু নারীর নাম জানা যায় যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান ছিলো। (Hogarth, 1922 : 29) আনুমানিক ২০০০ খ্রি. পূর্বাঙ্কে হযরত ইব্রাহিম (আ:) (জন্ম আনুমানিক ২১৬০ খ্রি. পূ.) এর স্ত্রী হযরত হাজেরা (রা.)-এর কথা উল্লেখযোগ্য। (Muhammad, 1959 : 519 ; a brief history of the hajj-time/content.time.com) তিনি শিশু ইসমাইল (আ.) কে নিয়ে নির্জন মক্কায় নির্বাসিত জীবনের কঠিন অধ্যায় সফলতার সাথে অতিবাহিত করেছিলেন বলে জনবসতিহীন মক্কায় প্রাণের স্পন্দন ঘটেছিলো। একই সাথে মুসলমানদের অত্যাব্যশ্যকীয় ইবাদত হজ্জের রোকন বা আরকান হিসেবে তাঁর সে পদক্ষেপগুলো গৃহীত হয়। হযরত ইসমাইল (আ.) পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সাথে পবিত্র কাবাঘরের সংস্কার করেন। তখন হতে মক্কায় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “এবং স্মরণ করো সেই সময়কে, যখন কা’বাগৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো ; এবং আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি আমার ঘরকে তাদের জন্য পরিষ্কার করে রাখবে যারা এর চারদিক প্রদক্ষিণ করবে, বসে ধ্যান করবে, রুকু সিজদা করবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১২৫)

তখনকার আরবে ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো বলে মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। তাছাড়া তৎকালীন ‘যুর্বিয়ান’ ও ‘আরস’ গোত্রের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যা ৫৬৮ থেকে

৬০৮ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমাগত ৪০ বৎসরব্যাপী চলমান ছিলো। এই কঠিন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে আরবের প্রসিদ্ধ তাজ গোত্রপতি হারিসের কন্যা বুহায়সার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার কারণে। বুহায়সা তাঁর স্বামী ‘যুর্বিয়ান’ গোত্রের প্রধানকে এ অমানবিক যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন। (আখতার, ১৯৮৮ : ১০) মক্কায় ইসলাম-পূর্ব আরবে আফলাকাত নাম্নী আরেকজন নারী প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখতো। সে যথেষ্ট বিচক্ষণতার সাথে বিচারকার্য সমাধান করতো। (Asgar Ali, 1992 : 40)

ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে মক্কার কুরাইশদের নামডাক ছিলো। বলা চলে, প্রায় দুই হাজার বছর ধরে তারা ব্যবসা করে আসছিলো। আরবে কৃষিকাজের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জনসাধারণ অধিক নির্ভরশীল ছিলো। কেননা আরব ছিলো একটি মরুময় এলাকা। এজন্য বহির্বিশ্বে ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে তাদের পরিচিতি ছিলো। এখানকার বেশ কিছু নারী ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তেমনি নারী ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.), হিন্দা প্রমুখ। (নুসরাত, ১৪২০/২০১৩-২০১৪ : ৫৭) প্রাক-ইসলামি যুগ হতেই তিনি ব্যবসা করে মক্কার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পান। তবে এটা সমাজের সামগ্রিক চিত্র ছিলো না। সম্পূর্ণভাবে তাঁরা পরনির্ভরশীল ছিলো।

ইসলামের আগমনে এখানে সমৃদ্ধি ঘটে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যাবলি মানুষের জীবনমানকে উন্নত ও পরিশীলিত করে। আরবের গুরুত্ব ও সম্মান বহির্বিশ্বে পূর্বেকার সময় হতে বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (জোয়ার্দার, ১৯৭৮ : ১) এর পশ্চাতে মুসলিম নারীদের ভূমিকা ছিলো অসাধারণ। নারীদের গৃহের বাইরে যাবার অনুমতি দেবার পাশাপাশি কাজেকর্মে অনুপ্রাণিত করা হয়। মূর্খতা, অজ্ঞতা, পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, পাপাচার প্রভৃতিতে নিমজ্জিত মানবজাতির জীবনের সকল পর্যায়ে মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে।

তবে আরবের কোন সময়কে আল-আইয়ামুল জাহিলিয়াহ বলা হয় তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণ সন্দিহান। তাই বলা চলে, মানুষ হিসেবে চিরকালই নারীদের ধারণাকে দেখা হয়েছে দুর্বল, ঠুনকো এক সত্তা হিসেবে। শত বৈরীতার মধ্যে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে তাদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামের ইতিহাসে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়নের একটি পর্যালোচনা

ইসলামের ইতিহাসে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের একটি পর্যালোচনা

আনুমানিক ৫,০০০ খ্রি. পূর্বাব্দের দিকে পৃথিবীতে ছিলো মাতৃতান্ত্রিক শাসনের স্বর্ণযুগ। (Durant, 1942 : 33) প্রাচীন সভ্যতার সর্বত্র সম্মানিত নারীদের মূর্তি তৈরীর মাধ্যমে তাঁকে দেবী হিসেবে পূজা করার প্রচলন চালু হয়। এ ছিলো সভ্যতার একদম আদিমতম পর্যায়। (কল্যাণী, ১৯৯৮ : ২৬) কালক্রমে প্রাচীন পৃথিবীতে নারীরা অবজ্ঞা ও নিছক উপহাসের এক বস্তুরূপে পরিণত হয়। একসময়ের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়। মানুষে মানুষে বিভাষন তৈরী হয়। এর প্রভাবে বিশ্বে নারীদের জীবন-যাপনেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে, তা ছিলো বর্তমানের নারীদের জীবনযাত্রার তুলনায় সম্পূর্ণভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। (হামিদা, ১৯৯৬ : ২৭) উঁচু শ্রেণির কিছু কিছু নারী সমাজে উন্নতি করলেও আপামর নারীর জীবন ছিলো শোচনীয়। প্রাচীন বিশ্বের সর্বত্র মানবজীবনে সুখ ও শান্তির প্রত্যাশায় খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হতে ১২শত শতক পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অসংখ্য নারী এক অভাবনীয় ভূমিকা পালন করেন। নিঃস্বার্থভাবে সৃষ্টিশীল কাজকর্ম, ব্যাপক সংগ্রাম, কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমাজ-সভ্যতা গঠনে নারীর সম্পৃক্ততা থেমে থাকেনি। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিশেষ প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় পরিবর্তন সাধনে তারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সময়ে পুরুষের পাশাপাশি অসংখ্য মুসলিম নারী যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, সামাজিক বিভেদের স্বীকার অবহেলিত মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। তাদের প্রচারিত আদর্শের প্রভাবে সমাজের একশ্রেণির মানুষ দীর্ঘদিনের মনস্তাত্ত্বিক অচলায়তন ভেঙে নতুন পথে অগ্রসর হতে তীব্রভাবে উৎসাহিত হন। (আমীর আলী, ১৯৯২ : ১৯) পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সকল প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়।

সামাজিক অধিকার :

নারী-পুরুষ উভয়ের প্রথম অধিকার হলো তাঁর সামাজিক অধিকার। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গঠন করে। মানুষের একজনের আরেকজনের নিকটে প্রয়োজন অপরিসীম। বিশ্বের প্রত্যেক সমাজই কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি দ্বারা পরিচালিত যা মানুষের চলার পথকে সহজ, নিরাপদ ও প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তনের সুযোগ রাখে। মানুষ আপন প্রয়োজনের তাগিদেই আদিকাল

হতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গঠন করে আসছে। মানব জীবনের লক্ষ্য সুখ-শান্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ। সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, হীন, নীচ প্রমুখ সকল ব্যক্তির মধ্যে একই কামনা বাসনা যে কোন মূল্যে জীবনে শান্তি-স্বস্তি লাভ ও সে অনুযায়ী জীবন ধারণ। এখন সামাজিক জীবনে কি নারী, কি পুরুষ প্রত্যেকের কিছু অধিকার বিদ্যমান থাকে। এ অধিকার ভিন্ন মানবতা রক্ষা পেতে পারে না। আর নারীর সামাজিক অধিকার না থাকলে সে সমাজে কোন শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা কিছুই বজায় থাকে না। ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল বিধিবিধান রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। কারণ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শুরুতে সমগ্র বিশ্বের নারীই ছিলেন নিগৃহিত ও অধিকার বঞ্চিত। তখনকার সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলো ছিলো অত্যধিক মাত্রায় কুসংস্কারনির্ভর যা নারীর জীবনকে বিষিয়ে তুলতো। (Rachal, 1999 : 21) এসবের কারণে নারীরা প্রতিনিয়ত অপমানিত হতো। সমাজে মানুষ হিসেবে নারীর কোন অধিকার ছিলো না। অধিকার সংক্রান্ত কোনো দাবীও তারা কোনোদিন কারো নিকটে করতে পারতো না। ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক সমাজ সব স্থানেই নারীর অবস্থা মোটামুটি এক ধরনের ছিলো। খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেতো। (Shanar, 1969 : 31) বিশেষতঃ আরব সমাজে তাদের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক। নেতৃত্বের পরিবর্তন ও মানবতার কল্যাণে নারীর সামাজিক অধিকার বিষয়ক তত্ত্বগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সে সময়ের সমাজের নারীর প্রতি বৈষম্য অনেকাংশে লাঘব হতে শুরু করে। শুধু আরব নয়, সমগ্র বিশ্বেই তখন বিশ্বনেতা, মানবতার পথপ্রদর্শক মহামানব মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের মাধ্যমে ইসলাম সমাদৃত হচ্ছে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মাঝে। নারীর জীবনেও ভিন্ন এক পরিবর্তন আসতে শুরু করে তখন হতে। নারীরা মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে সংসারে, পরিবারে, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে, ইবাদতে, শিক্ষা গ্রহণে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, ঘরের বাইরে গিয়ে নানাবিধ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্ত হয় তখন হতে ব্যাপক পরিসরে।

পারিবারিক অধিকার

পরিবারে নারী কখনো মা, স্ত্রী, কখনো বা কন্যা। এই হলো নারীর পারিবারিক পরিচয়। মানব সভ্যতার প্রারম্ভ হতেই সমাজ, পরিবারে নারীর এ পরিচয় চিহ্নিত। পরিবার হলো সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। সমাজের ক্ষুদ্রতম বা একক সংগঠন হলো এটি। পরিবারের সাথে মানুষের সবচেয়ে বেশী নিবিড়

যোগাযোগ থাকে। এজন্য সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিবারের পঠন পাঠনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। আর ইসলামি সমাজ পুরোপুরি পরিবারকেন্দ্রিক। ইসলামি দৃষ্টিকোণে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ, সভ্যতা বিনির্মাণের মূল বুনিয়ে দিলে পরিবার। আদি পিতা ও মাতা আদম-হাওয়া বা এ্যাডাম-ইভ হতেই বিশ্বে সর্বপ্রথম পরিবারের গোড়াপত্তন ঘটে। কালক্রমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী আদম-হাওয়ার বংশধর হতে পরিবার ছড়িয়ে পড়ে ও সমাজ-সভ্যতার শুভ সূচনা হয়। (সূরা আন-নিসা, আয়াত-১) ইসলাম আদর্শ পরিবার গঠনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিধির মধ্য দিয়ে একটি আদর্শিক পরিবার সমাজে জন্ম নেয়। নিম্নে এ সমাজে ব্যক্তি হিসেবে নারীকে বিভিন্নভাবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, যার আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠিত হয়।

মা হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার

সন্তানের পরিচর্যা, আত্মবিকাশ ও তাঁর যাবতীয় চাহিদা নির্বাহে মাতা-পিতার ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষতঃ একজন মানব শিশুকে প্রকৃষ্ট মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে পিতৃ-মাতৃ স্নেহের গুরুত্বই সর্বগ্রাে। যে মানুষটি সন্তান ধারণ, প্রতিপালন, রাত্রি জাগরণ হতে শুরু করে সন্তানের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম, ছুটাছুটি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাধনা, নিজের শত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে সন্তানের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে তিল তিল করে বেড়ে উঠতে, কল্যাণে নিঃস্বার্থচিত্তে নিজেকে বিলিয়ে দেন তিনি হলেন-মা, ব্যক্তি হিসেবে একজন নারী। শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করতে মায়ের ভূমিকাই থাকে মূখ্য। তাই মাতার প্রতি কি ধরনের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। যে মাতৃক্রোড়ে শিশু বেড়ে উঠে তাকে সর্বাবস্থায় সম্মান দেখানো সন্তানের কর্তব্য। এমনকি বৃদ্ধাবস্থায়ও তাকে সেবা-শুশ্রূষা দান সন্তানের অবশ্য পালনীয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে সন্তান কখনও পিতা মাতা হতে পৃথক স্থানে বসবাস করলেও তাদের সাথে ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাত করাসহ খোজ খবর নেয়া ও তাদের জীবনকে নির্বিঘ্ন করার যাবতীয় ব্যবস্থা করা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। তাই ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। (গাজী শামসুর রহমান, ১৯৮১ : ১৯) একজন প্রকৃত মুসলমান ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারে না। বিশ্ববাসীর নিকটে চির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপকার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি জন্মের পর মাতৃদুখে প্রতিপালিত হলেও তাকে তদানীন্তন আরবের প্রথা অনুযায়ী মক্কার বনু সাদ গোত্রের

বিবি হালিমাকে নির্বাচিত করে তার নিকটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ হালিমার এলাকার আরবী ভাষা ছিলো প্রাঞ্জল, শুদ্ধ ও আবহাওয়া ছিলো মক্কার তুলনায় কিছুটা ভালো। এখানে তিনি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। তবে মাঝে মধ্যে মায়ের নিকটে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। মুহাম্মদ (সা:) মায়ের নিকটে ৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে একেবারে চলে আসেন। কিন্তু অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ছয় বছর। আর মৃত্যুকালে তার মাতার বয়স হয়েছিলো মাত্র ২০ বছর। (মুজতবা ও মোশাররফ, ১৯৭৮ : ৩২১)

বিবি হালিমাকে তিনি মায়ের মতই সমাদর ও সম্মান জানাতেন। যখনই বিবি হালিমা সাদিয়াহ (রা.)-তাঁর নিকটে আসতেন তিনি গায়ের চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দিতেন। তিনি দুধ ভ্রাতাদের পর্যন্ত অত্যন্ত সমাদর করতেন। এ সম্পর্কে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য : “হযরত আবু তোফাইল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে একবার জি'রানায় গোশত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় একজন মহিলা রাসুল (সা.)-এর নিকটে আসলেন। তিনি তখন তার সম্মানার্থে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং অতিথি মহিলাকে তাতে বসতে দিলেন। আমি বললাম এই মহিলা কে? লোকেরা বলল, ইনি তাঁর দুধ মা।” (সুনানে আবি দাউদ) এভাবে মাতৃস্থানীয় পর্যায়ের কাউকে ইসলামে সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-ইসলামি যুগে মানুষ যখন মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যে সীমাহীন অবহেলা করতো তখন ইসলামে জন্মদাত্রী মায়ের সেবা ও সম্মান প্রদানের জন্যে সন্তানদেরকে দায়িত্বশীল হতে বলা হলো। সেই চোদ্দশত বছর পূর্বেই জন্মদাত্রী মায়ের প্রকৃত সম্মান জানানোর জন্যে মানব সন্তানদেরকে সচেতন ও পিতা মাতার যত্নের দিকে খেয়াল ও অনুভূতিশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। প্রকৃত মুসলমান কখনও এ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়াল্লা আল-কোরআনে বলেন, “বলে দিন তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন এসো তা আমি পড়ে শুনাই। তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করবে।” (সূরা আল-আনাম, আয়াত-১৫১) এ আয়াতে আল্লাহতায়াল্লা নিজের অধিকারের কথা বলার পর পিতা মাতার হক বা অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়াল্লা বলেন, “তোমাদের পালনকর্তা আদেশ করছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি

তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নশ্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।” (সূরা বনি ঈসরাইল, আয়াত নং ২৪-২৫) এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, একবার জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকটে এসে প্রশ্ন করে : হে আল্লাহর রাসূল! আমার সদাচার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? জবাবে তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার মাতা। লোকটি চতুর্থবার প্রশ্ন করে, তারপর কে? উত্তরে তিনি এবারে বলেন, তোমার পিতা।” (বুখারি, ৫ম খন্ড, পৃ-২২২৭) এ হাদিস হতেই উপলব্ধি করা যায়, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিধি কত ব্যাপক। মাতা-পিতা যখন বার্ষিক্যে উপনীত হয় বা চরম অর্থ সংকটে পড়ে তখন তারা যাতে কোন ধরনের অর্থ কষ্টে না পড়ে সেদিকে খেয়াল ও অনুভূতিশীল হতে হবে। তাই সামাজিক জীবনে মাতা-পিতার অধিকারের গুরুত্ব এবং তাদের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কুরআন-হাদিসে এভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমনকি কোন মুসলিমের মাতা-পিতা যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয় তবুও তাদের পার্থিব প্রয়োজন ও অভিযোগ শুনতে হবে এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে মাতৃজাতিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে ইসলাম।

এ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.) বলেছেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে আমার মাতা অমুসলিম অবস্থায় আমার নিকটে এসেছিলেন। আমি প্রিয় নবি (সা.)-এর নিকটে গিয়ে বললাম, আমার মা এসেছেন। অথচ তিনি ইসলামের উপর বেজার। আমি কি তার সাথে আত্মীয়তাজনিত আচরণ করতে পারি? জবাবে মুহাম্মদ (সা.) বলেন, হ্যাঁ। নিজের মার সাথে তুমি আত্মীয়তাজনিত ব্যবহার করতে পার।” (বুখারি, ২য় খন্ড, পৃ. ৯২৪ ; মুসলিম ২য় খন্ড, পৃ. ৬৯৬)

কন্যা হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার :

যে কোন পরিবারে পিতা-মাতার আদর-ভালোবাসা পাওয়া সন্তানের একটি অধিকার। কিন্তু আদিকাল হতেই নারীর প্রতি বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটেছিলো তার আপন পরিবারেই। এখনও কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণের কথা শুনলে অনেক পিতা-মাতা, মুরুব্বীদের মুখ কালো হয়ে যায়। কন্যাকে দুর্বল প্রজাতির

জীব বলা হয়। খোদ আরবে তো কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করলে এ শিশুকে আপদ ভেবে ও ভবিষ্যতে অনিষ্টকর হিসেবে বিবেচনা করে মাটিতেই তারা পুতে ফেলতো। কন্যা সন্তানের উপর এ সকল বর্বরোচিত অত্যাচার নির্মূল করার জন্য ইসলামে যে সকল সংস্কারমূলক কর্মসূচী গৃহীত হয় তা হলো :

কন্যা সন্তানের সম্মান বৃদ্ধি :

সন্তান পৃথিবীতে আসলে তাদেরকে আগলিয়ে রাখা যে কোন অনুভূতিশীল পিতামাতার সহজাত প্রবৃত্তি। পশুও তা অনুধাবন করে। কিন্তু পৃথিবীতে দুঃশাসন, নৈতিকতার চরম অধঃপতনের কারণে কোনো কোনো সমাজের মানুষ তার সহজাত মায়া, ভালোবাসার অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। বহুভাবে পিতামাতাকে উদ্বুদ্ধ করা হলো দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করতে।

১. হত্যা রোধ :

ইসলাম মানুষের মনে তার প্রতিটি কাজে পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করে। এজন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেয়াকে জঘন্য হত্যাকাণ্ড বলে ঘোষণা দিয়ে পরকালে এর জন্যে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করলেন এবং হত্যাকে সামাজিক আইনেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেন। ইসলাম এভাবে মাতা-পিতার অন্তরে মানবজীবনের মর্যাদাবোধ জাগ্রতের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (সা.) কন্যা সন্তান হত্যা রোধে ঘোষণা দিলেন, “কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।”(আবু শুজা শিরওয়াইহি, ১৯৮৬ : ৩৭) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। কন্যা সন্তানের উপর এ সকল বর্বরোচিত অত্যাচার নির্মূল করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ইসলামের বাণীসহ প্রেরণ করেন। যার ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পায় নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধা ও আত্মমর্যাদাবোধ, যার আবেদন সার্বজনীন। কন্যা সন্তানকে পুরুষের মতোই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে ইসলাম। আল্লাহর ভাষায়, “জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে-কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সূরা আত-তাকবির ৮-৯)।

২. প্রতিপালনের গুরুত্ব বৃদ্ধি :

নারীর কোনো মূল্য ছিলো না বলে প্রাক ইসলামি আরব বা আইয়ামে জাহিলিয়াহ যুগে কন্যাকে অভিশপ্ত ভাবা হতো। পিতা-মাতার অন্তর হতে এ হীনম্যতা দূর করতে রাসুল (সা.) তাদের লালন-পালনে পিতামাতাকে জোর তাগিদ দিয়ে গেছেন। কন্যাদের দেখাশুনা করার ব্যাপারে রাসুল (সা.) বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে গেছেন তার অনুসারীদেরকে। হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিস এখানে তুলে দেয়া হলো। তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে অথবা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা সন্তান অথবা দু'টি বোন রয়েছে, তাদেরকে উত্তমভাবে লালন পালন করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ভয় করে, তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত।

রাসুল (সা.) বলে গেছেন, যে ব্যক্তি তার দুই কন্যাকে তাদের বয়ো:প্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকবো। এ কথাটি বলে তিনি নিজের হাতের আংগুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। (সহিহ মুসলিম, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮)

৩. কন্যা সন্তান পালনে উৎসাহিতকরণ :

সন্তান প্রতিপালনে অত্যন্ত ধৈর্য্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রয়োজন হয়। আল্লাহতায়াল্লা মাতা পিতার অন্তরে তা আপনা আপনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানুষ সন্তানের সুযোগ-সুবিধার জন্য সবসময় ব্যাকুল থাকে। এ ব্যাকুলতা, দায়িত্ববোধ পুত্র কন্যা উভয়ের জন্য সমান হওয়া প্রয়োজন। তাই ইসলামে পিতামাতাকে কন্যা প্রতিপালনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার জন্য অন্তরের হীনম্যতা দূর করার কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “হে নবি, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং অন্য পুরুষের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে নিজ স্বামীর নামে চালিয়ে দেবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন আপনি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত : ১২)

কন্যাশিশু লালন পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ বিষয়ে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য: “ইবনে শুরাইত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কারো গৃহে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা তোমাদের উপর সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ট কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ যা একটি সবল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের দায়িত্ব নেবে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।” (সুলাইমান আত-তিবরানী, ১৯৮৫ : পৃ. ৬১ ; আলি ইবনে আবি বকর, ১৪০৮ হি: ৮ম খন্ড, পৃ. ১৫৬)

৪. কন্যা সন্তান জন্মের পর তাকে সাদরে গ্রহণ :

ইসলাম পূর্ব যুগের চির অবহেলিত নারী, লাঞ্চিত, ঘৃণিত নারী জাতির মুক্তির জন্যে ইসলাম বহু পদক্ষেপ নেয়। কন্যা সন্তান যত্নের সাথে লালন পালন করলে সেও পুত্র সন্তানের সমকক্ষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে এ বিষয়ে ইসলামে জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু সমাজে আদর্শ বজায় না থাকলে মানুষে মানুষে চরম বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তাই মানুষের অন্তরে খোদাভীরুতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে, যেন মানুষ অন্য মানুষকে অহেতুক কষ্ট না দেয়। শিশুকে আদর যত্নের সাথে আদর্শিক ভাবে মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রতি খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র তাই নয়, নিরুপায় কন্যার ভরণপোষণের প্রতি তাগিদ দিয়ে মহানবি (সা.) বলেন, আমি কী তোমাদের সর্বোত্তম সাদকার কথা বলবো না? তা হলো, তোমার কন্যা (যে নিরুপায় হয়ে স্বামীর গৃহ থেকে) তোমার কাছে ফিরে এসেছে। তুমি ব্যতীত তার রোজগার করে খাওয়ানোর আর কেউ নেই। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, পৃ. ১২০৯ ; মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৭৫)

এভাবে ইসলাম প্রত্যেক মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। তদানীন্তন সমাজের নিগৃহীত মানবতা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন হতে মুক্তি লাভ করে। অথচ বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে আমাদের এই বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভাবে এ আদর্শে প্রত্যেক মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের নিগূহিত মানবতা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন হতে মুক্তি লাভ করে।

৫. কন্যা সন্তানকে মর্যাদা প্রদান :

মানবতার এ আদর্শে কন্যা সন্তানকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কন্যা সন্তানের জন্ম যে অবাঞ্ছিত, দুর্ঘটনার ব্যাপার নয় তা মানুষের মন মগজ থেকে দূরীভূত করার ঘোষণা ইসলামেই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সন্তান হিসেবে সে পুত্রই বা কন্যাই হউক, তাকে ভালোবাসা, স্নেহ মমতা দিয়ে মানুষ করতে ইসলামে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেই সময়ের জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত মানুষকে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হবার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মাতৃক্রোড়ে যেই আসুক না কেন তাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর ভাষায়, “আসমান ও জমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহতায়ালার। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র, কন্যা মিলিয়ে মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা বক্ষ্যা বানিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিশালী।” (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ৪৯-৫১)

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার :

ইসলামে যে ক্ষেত্রে নারী জাতিকে সকল লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অবমাননা ও অবহেলা হতে রক্ষা করে তাদের অধিকার ও মর্যাদা সর্বাশ্রয় বিস্তৃত করেছে তা হচ্ছে স্ত্রীর পর্যায়। ইসলাম-পূর্ব যুগে পরিবারে স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিলো না। তারা ছিলো নিছক বিনোদনের বস্তু, দাসী-বাদী ও মানববংশবৃদ্ধির উপাদানমাত্র। তাদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করা হতো। তাদের মানুষ হিসেবেই স্বীকার করা হতো না। ইসলামই সর্বপ্রথম পারিবারিক জীবনে নারীর প্রকৃত অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করে তাকে যাবতীয় নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক যন্ত্রণা হতে উদ্ধার করে। নারী-পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি। পারিবারিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে শুরু করে সাংসারিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড, সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে সহাবস্থান হলো ইসলামে পারিবারিক জীবনের আদর্শ।

বিবাহে স্ত্রীর অধিকার

আল্লাহর ভাষায়, “স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।” (বাকারা : ২২৮) এতদিন ধরে জাহিলিয়াত আরবসহ সমগ্র বিশ্বে নারীরা যেভাবে অমর্যাদা ও অশ্লীলতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো তা হতে নারীদেরকে মুক্ত করে ইসলাম। নারী সমাজে স্ত্রীরূপে পরিচিতি লাভ করে বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত। এজন্য সমাজবিজ্ঞানে পরিবারের পঠন পাঠনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। (ড. ফজলুর রহমান খাঁন, সমাজ ইতিহাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ-৫২) আদিযুগ থেকেই সমাজে বিবাহ প্রথার ভিত্তিতে পরিবার গঠন চলে আসছে। আল্লাহতায়াল্লা রাসুল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন: আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রাসুলের এমন সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। (রাদ, ৩৯) পরিবার হচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন। ইসলামে পরিবার গঠন করে সমাজ পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। পরিবার একটি সভ্যতা বিনির্মাণের মূল বুনিয়াদ। বস্তুত: নারী পুরুষের একটি নির্দিষ্ট বয়সে জন্মগতভাবে পরস্পরের প্রতি একটি আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। এ চাহিদাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইসলামে পরিবার গঠনের ভিত্তি বিবাহে আবদ্ধ হতে মানুষের জন্য অত্যাবশ্যিক করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়াল্লা আবারও বলেন, “আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কী মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (আন-নহল, ৭২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা:) আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন: হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে লোক স্ত্রী গ্রহণে সামর্থবান, তার অবশ্যই বিবাহ করা কর্তব্য। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে নীচ ও নিয়ন্ত্রিত করতে ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে অধিক সক্ষম। আর যে লোক তাতে সামর্থবান নয়, তাহার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা তার জন্য যৌন উত্তেজনা নিবারণকারী। (বুখারী, ৫ম খন্ড, পৃ-১৯৫০)

বিবাহ বন্ধনে নারীর অধিকার :

ইসলাম বিবাহের নামে অবাধ যৌনাচার হতে নারীকে মুক্ত করেছে। ইসলাম পবিত্র ধর্ম। মানুষের কল্যাণের জন্য এর বিধানাবলী নির্দিষ্ট ও অলঙ্ঘনীয়। একটি মুসলিম বিবাহ সামাজিকভাবে সম্পাদন করার নিয়ম। পিতা-মাতা বা অভিভাবক এবং দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি ভিন্ন ইসলামে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। কনে বা পাত্রপক্ষ হতে বিবাহের উকিল নিযুক্তের মাধ্যমেও বর ও কনের উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা যায়। উকিল বা বর-কনের নিজেদের তরফ হতে ইজাব, কবুল অর্থাৎ প্রস্তাবনা ও প্রস্তাব গ্রাহ্য করার মাধ্যমে এ বিবাহ সিদ্ধ হয়। এ সম্পর্কে রাসুল (সা:) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, “স্বৈরিণী-ব্যভিচারিণীরাই নিজেদের বিবাহ কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত নিজেরাই সম্পন্ন করে থাকে।” (আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকি আল-কুবরা, মক্কা, ১৯৯৪, ৭ম খন্ড, পৃ-১২৫) হযরত আনাস ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, “চার ব্যক্তি ছাড়া বিবাহ হয় না। তারা হলো: প্রস্তাবকারী, অর্থাৎ বিবাহেচ্ছু বর, অভিভাবক এবং দুইজন সাক্ষী।” (বুখারি, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ-১৫৫৬)

বিবাহে নারীর স্বামী নির্বাচনের অধিকার

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা যাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হতো তাদের ইচ্ছামাফিক তাদেরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হতো। তাদের স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিলো না। ইসলাম এ ধরনের একচেটিয়া অভিভাবকত্ব অস্বীকার করেছে এবং কোন মেয়েকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়ার অধিকার তার পিতা, ভ্রাতা বা অন্যান্যদের নেই সে সম্পর্কে মানুষের সচেতন করার কথা বলেছে। কন্যার ইচ্ছা অনুযায়ী ও মতামত সাপেক্ষে তার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করে ইসলাম তার চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এভাবে মুসলিম বিবাহে নারীকে একজন স্বাধীন প্রতিনিধি গণ্য করা হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, পূর্বে স্বামীসঙ্গ প্রাপ্তা কনের স্পষ্ট আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না এবং অ-প্রাপ্তা কনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেওয়া যাইবে না। আর কনের অনুমতি হলো তার চুপ থাকা। (বুখারি, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ-২৫৫৬)

নিষিদ্ধ বিবাহ :

ইসলাম পূর্বে রক্ত সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলেও সৎমাতা বা স্ত্রীর ভগ্নী এমনকি দুই সহোদরকে একই সঙ্গে বিবাহে তাদের বাঁধা ছিলো না। আল-কুরআনে নিম্নোক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, “ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ১) মাতা ২) কন্যা ৩) ভগ্নী ৪) ফুফু ৫) খালা ৬) ভ্রাতুষ্পুত্রী ৭) ভাগিনেয় ৮) দুধ ভগিনী ৯) শাশুড়ী ১০) সৎকন্যা ১১) পুত্রের স্ত্রী ১২) দুই ভগ্নীকে এক সাথে বিবাহ করা ১৩) সৎমাতা।

স্ত্রীর মর্যাদা ও তার প্রতি সদ্যবহারে উদ্বুদ্ধ

পারিবারিক জীবন হলো মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণের উৎস। ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি আর এ শান্তি পথের অগ্রযাত্রা শুরু হয় পরিবার হতে। স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও তার প্রতি সদ্যবহার করার জন্য স্বামীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামে পারিবারিক জীবনে স্বামীকে গৃহের কর্তা বা পরিচালকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে স্বামীরা কতৃৎ চালাতে গিয়ে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন চালাবে। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান পরিবৃত পারিবারিক জীবনের চাকা সচল ও গতিশীল রাখতে স্বামী, স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একজন ছাড়া আরেকজন অচল। তাই মহান আল্লাহতায়াল্লা যথার্থই বলেন, “নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (বাকারা, ২২৮) এ সম্পর্কে হাদিসে বিষয়টি ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাসুল (সা.) ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, হযরত ‘আমর ইবনুল আহওয়াস তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় তার পিতা রাসুল (সা.)-এর সাথে ছিলেন। রাসুল (সা.) খুতবাতে মহান আল্লাহর প্রশংসার পর ওয়াজের মধ্যে বলেন, তোমরা মেয়েদের প্রতি সদ্যবহার করো। কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছ হতে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা ছাড়া অন্য কিছু মালিক নও যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয়। যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত হও তাহলে তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং অল্প মাত্রায় প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে ফিরে আসে তাহলে তাদের ব্যাপারে অন্য কোন চিন্তা করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।”

(তিরমিযি, প্রাণ্ডু, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৬৭) হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকেই পাহাড়াদার এবং রক্ষক। তোমাদের প্রত্যেকেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে। আমির বা শাসক একজন রক্ষক (তাকেও তার রক্ষণাবেক্ষণের পুঞ্জানুপুঞ্জ হিসাব দিতে হবে)। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের রক্ষক। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের এবং সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তোমরা প্রত্যেকেই পাহাড়াদার আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার পাহাড়াদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ” (ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আননবি, রিয়াদুস সালেহীন (ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫, ১১ খন্ড)

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ :

পরিবারের কর্তাকে তাঁর সাধ্যমতো খরচ করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর খাতাব (রা.)-এর নিকটে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আবি ওবায়দুল্লাহ আসতেন। তিনি জীণ-শীর্ণ পোশাকে আসতেন। তাকে হযরত ওমর (রা.) এক হাজার দিনার দান করলেন। তা হতে সে ভালো পোশাক ও উত্তম খাবার কিনলো। বিষয়টি রাসুল (সা.)-কে জানানো হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তার উপর রহম করুন। আল্লাহতায়ালার যতটুকু তাকে সমর্থ দিয়েছেন, ততটুকু যেন সে ব্যয় করে। (ইবনে কাছীর, তাফসিরুল কুরআনুল করীম, ১৪২০ হিজরী, ১৫৩) ইসলাম ধর্মে পারিবারিক জীবনে স্বামী কর্তা বা পরিচালক বলে তার উপরই স্ত্রী, পরিবার-পরিজনের দায়িত্বভার ন্যস্ত। সাধারণভাবে মুসলিম আইন অনুযায়ী ভরণ-পোষণের অর্থ হলো স্ত্রীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। মহান আল্লাহতায়ালার ভাষায়, পুরুষরা নারীদের পরিচালক-এই কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এক দলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আরো এজন্যে যে, পুরুষরা তাদের পশ্চাতে ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সতি নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে।” (আন-নিসা, ৩৪) নারীর মাতৃত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার পুরুষের হাতে। সংসার গঠনে নারীর যে অবদান তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নারীকে সংসারের জন্য আয় করা হতে মুক্তি দেয়া হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালন, সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসব, লালন-পালন করা ইত্যাদি কাজের সাথে উপার্জনের কঠোর দায়িত্বভারসহ পারিবারিক দায়িত্ব পালন তার জন্যে কষ্টকর হতে পারে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “সন্তানের পিতাকে

ন্যায়সঙ্গতভাবে মায়েদের ভরণ-পোষণ করতে হবে।”(আল-বাকারা, ২৩৩) আবারও আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, স্বচ্ছল আর সে যদি কোন কিছু করে তা করতে বাঁধা দেয়া হয়নি ইসলাম ধর্মে।

মানবাধিকার ও নারী :

নারী জীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশা নেমে আসত যদি সে দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রীতদাসীতে পরিণত হতো। তদানীন্তন বিশ্বের গ্রিস, রোমান, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের সর্বত্র দাস বেচাকেনার জন্য বড় বড় বাজার গড়ে উঠেছিলো। মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার ইতিহাস অনুসন্ধান জানা যায়, আদিম যুগে সব মানুষ সমান অধিকারসম্পন্ন ছিলো। তখন মানুষ কর্তৃক মানুষকে দাসে পরিণত করাটা ছিলো অসম্ভব। মানুষ আস্তে আস্তে কৃষি ও চাষাবাদের সূচনা করলেও একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে দাসে পরিণত করার কথা চিন্তাও করতে পারতো না। মানুষ যা উৎপাদন করতো তাতে তার ভরণপোষণ চলতো কায়ক্লেশে। ক্রমশ নদীর তীরের উর্বর ভূমিতে চাষাবাদ এবং হাতিয়ার আবিষ্কার ও এর উৎকর্ষ সাধিত হলে মানুষের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামন্তবাদের সূচনাও ঘটে তখন হতে। সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির দুর্বলদের নানাভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধির পথকে সুগম করতে থাকে। গড়ে ওঠে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। উদ্ভব হয় ক্রীতদাস-দাসী প্রথা। (হালিম ও নুরুল্লাহর, ১৯৯৫ : ১৬৪) আর জাতিতে জাতিতে তুচ্ছ কারণে ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহ হতো বলে যুদ্ধবন্দীরা দাসে পরিণত হতে থাকে। পাশাপাশি দেশের স্বাধীন ঋণগ্রস্তদের নানা অজুহাতে দাসে পরিণত করার প্রথা চালু হয়। এদেরকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী দাস বেচাকেনার বাজার গড়ে উঠে। এক হিসেবে জানা যায়, এশিয়া মাইনরে এথেন্স হতে ২০ হাজার দাস-দাসী এনে বিক্রি করা হয়েছিলো। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায় বাজারে নারীর বেচাকেনা চলত। সুন্দরী নারীরা চড়া দামে মনোরঞ্জনের জন্য বিক্রিত হতো। (Bertram, 1877 : 36-37) এদেরকে নিয়ে পতিতালয়ের গর্হিত ব্যবসা চলত।

দাস-দাসীর প্রতি মনিবের অত্যাচারের কাহিনী হতে মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতনের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তখন ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহ হতো বলে পরাজিত শক্তির পুরুষ ও তদীয় স্ত্রী কন্যারা বিজিতদের দাস-দাসীতে পরিণত হতো। দাসীরা কখনও ছিলো মনিবের উপভোগের সামগ্রী। এমনকি তাদেরকে জন্ম দিতে হতো দাস-পুত্র ও দাসী কন্যা। (শামসুল, ১৯৯৯ : ১২৩) তখনকার যুগের সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ খনি হতে

পাথর সংগ্রহ, জাহাজের ভারী দাঁড় টানা দাসদের দিয়ে করানো হতো। সর্বশ্রেণির নারী যেমন পুরুষের হাতে ঢালাওভাবে অত্যাচারিত হতো তেমনি পুরুষ শ্রেণির হাতে দাসরা অত্যাচারিত হতো। শাসিতের সাথে শোষিতের এ বিশাল ব্যবধান মানবেতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। (রেবতী, ১৯৯২ : ১০৩) দাসপ্রথা সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আমীর আলীর মন্তব্যটি প্রশিধানযোগ্য। তিনি বলেন, “সমাজের বর্বর অবস্থায় এর বীজ বিকশিত হয়েছিলো এবং জড়বাদী সভ্যতার অগ্রগতিতে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও এর সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিলো। আর যাদের আইন-সংক্রান্ত ও সামাজিক প্রথাসমূহ আধুনিক জীবনচর্চা ও সামাজিক প্রথাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে সেই ইহুদি, গ্রিক, রোমান, প্রাচীন জার্মান জাতি দাস প্রথাকে স্বীকার ও চালু করেছিলো।” (আমীর আলী, ১৯৯৬ : ৩৫৭) বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মহানবী (সা:) ও তাঁর সহযোগি কীর্তিমতী নারীদের প্রচেষ্টাতে সর্বপ্রথম দাস-দাসী প্রথা ক্রমবিলুপ্ত করার কার্যক্রম গৃহীত হয়।

অর্থনৈতিক অধিকার :

ইসলাম নারী সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে মর্যাদাদান করেছে, যা তদানীন্তন অন্য কোনো সমাজ-সভ্যতায় ছিলো না। নারীরা পিতা মাতা, স্বামী সন্তান হতে ওয়ারিশ এর অংশ প্রাপ্যতা হতে বঞ্চিত হতো। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তারা ছিলো অন্যদের নিকটে বোঝা স্বরূপ।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভের অধিকার

ইসলামে পূর্ব পুরুষের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারী পুরুষ উভয়ের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। উত্তরাধিকারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ পুরুষরা যেমন উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে, তেমনি নারীর জন্যেও উত্তরাধিকারের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ “পুরুষদের জন্যে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যেমন প্রাপ্য অংশ রয়েছে। তেমনি নারীদের জন্য পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে। চাই তা কম হোক অথবা বেশি হোক, উভয়ের এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত) (সূরা নিসা, আয়াত নং-৭) আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ), আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য ১/২ (অর্ধাংশ)। (এটি পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত উত্তরাধিকারী) মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে

তার পিতা ও মাতা প্রত্যেকেই ওই সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ পাবে, যদি মৃতের পুত্র থাকে। আর যদি মৃতের পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিনভাগের একভাগ। তারপর মৃতের যদি কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয়ভাগের একভাগ যা তোমরা পরিত্যাগ করে যাও। কিন্তু ওসিয়ত ও ঋণ, যা তোমরা করো, তা পরিশোধের পর যদি পিতা-পুত্রহীন মৃত পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক-এর বৈপিত্র্যে এক ভাই বা বোন প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে, আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা কারো অনিষ্ট না করে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, মৃতের ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। এটি আল্লাহর দেয়া বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল। (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১-১২) এমনকি নারীদেরকে পিতা-মাতা, সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তির উত্তরাধিকারেও অংশীদার করা হয়। এমনকি এ সমাজে নারীর সম্পদ পাওয়ার উৎস বেশী রাখা হয়েছে। যেমন বিবাহে খোরপোষ, দেনমোহর প্রাপ্তি, নারীর নিজস্ব আয় হতে উপার্জিত উৎস। আল-কুরআনের ভাষায়, “পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-৩২) অথচ তাঁর উপর সংসার পরিচালনার ভার বা দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। সাধারণভাবে মুসলিম আইন অনুযায়ী ভরণ-পোষণের অর্থ হলো স্ত্রীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন, “পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করবে। কারণ, আল্লাহতায়াল্লা তাদের একজনকে অন্যজনের উপর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।” (সূরা নিসা, আয়াত নং-৩৪) তাই নারীরা স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা অর্জন করায় তখন থেকে নিজেদের কর্মক্ষেত্রসহ চিন্তা-চেতনা, বিচক্ষণতা দ্বারা অগ্রসর হবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

মোহরানায় স্ত্রীর অধিকারের স্বীকৃতি

ইসলামে নারী পুরুষের বিবাহ বন্ধনকে সম্মানজনক স্বীকৃতি ও স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর কল্যাণের জন্য যে অর্থ বা ধন-সম্পদ প্রদান করা হয় তাকে মোহর বলে। ইসলামে মোহরকে ‘আজর’ বলা হয়। মহান আল্লাহর ভাষায়, “এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ

করবে, তাকে তার নির্ধারিত অধিকার দান করো। (আন-নিসা, ২৪) এ আয়াতে আরবি ‘আজর’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ পুরস্কার বা প্রতিদান। মোহর এজন্যই ধার্য করা হয় যার মাধ্যমে নারী তার স্বামীর প্রতি এক ধরনের আশ্বস্ততা অনুভব করে ও আত্মমর্যাদার সাথে স্বামীর সাথে সংসার করতে আগ্রহান্বিত বোধ করে। বিবাহের সময়েই মোহর আদায় করা সুনত। তবে বিবাহ সম্পন্ন করার পরেও তা স্বামী আদায় করতে পারবে। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের কারণে আল্লাহতায়াল্লা বিবাহের সাথে সাথেই স্বামীদেরকে মোহর পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অথচ প্রাক ইসলামি যুগের বিবাহের কাঠামোয় মোহর প্রদানের রীতি চালু থাকলেও তা কনে না পেয়ে পেতো তার অভিভাবক। সম্ভবতঃ কনের পিতা বা অভিভাবক কন্যার বিক্রয়মূল্য হিসেবে ঐ অর্থ গ্রহণ করে। ইসলাম এ ধরনের কন্যা বিক্রয় নিষিদ্ধ করে বিবাহ প্রথায় মোহর নারীর ন্যায্য পাওনা বলে স্বীকৃতি দিয়ে বিনিময় পণ্য হতে নারীকে মুক্তি দেয়। আল্লাহর ভাষায়, “আজ তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস হালাল করা হলো। আর ধর্মভীরু, সতি নারীও তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। তবে শর্ত হচ্ছে-তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।” (আল-মায়দা-৫)

বিবাহে মোহর স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী ধার্য হবে যাতে সে সহজে তা পরিশোধ করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়াল্লা বলেন, “এবং স্ত্রীদের মোহর মনের সন্তোষ সহকারে আদায় করো। (আন-নিসা) স্বয়ং রাসূল (সা.) মোহর না দিয়ে কোনো বিবাহ করেননি। তাই কোনো মুসলমানকেই এ দৃষ্টান্ত অমান্য করা উচিত নয়। হযরত হাম্মাদ ইবনে জায়দের বর্ণনায় বলা হয়েছে, একবার রাসূল (সা.) বিবাহের ইচ্ছা পোষণকারী সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মোহরানা দেওয়ার মতো কোন জিনিস তোমার নিকট আছে কি? তিনি তখন কিছুই হাজির করতে না পারলে রাসূল (সা.) বললেন, “দেখ একটি লোহার আংটি জোগাড় করতে পারো কিনা।” (মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ- ১০৪০) এতেই বোঝা যায় মোহরানা ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে না। ইমাম মালিকের মতে, মোহরানার ন্যূনতম পরিমাণ হলো চার দিনার। তবে আকদের সময় মোহর ধার্য না হলেও পরে অবশ্যই ইহা ধার্য করতে হবে এবং স্বামী তা পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীর স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ বিলিবন্টনের প্রথমেই মোহরানার অংশ প্রাপ্ত হবে। (নুরুল মোমেন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৬)

অর্থনৈতিকক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বানিজ্য পরিচালনা করার অধিকার, পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তান ও ভাই-বোনদের সম্পত্তিতে ইসলাম নারীর জন্য নির্ধারিত অধিকার সংরক্ষণ করেছে যা অন্য কোন সমাজব্যবস্থা, সভ্যতা ও ধর্মে করা হয়নি। আজকে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন নারীকে কেন ইসলাম পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি প্রদান করে? কিন্তু একটু গভীরভাবে বিষয়টি চিন্তা করলে বোঝা যায় মূলত: এটি কোন বৈষম্য নয়। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন ও তা পরিচালনা করার প্রক্রিয়া। কারণ পরিবার পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় বা অর্থ খরচ করার দায়িত্বভার সম্পূর্ণভাবে পরিবারের কর্তা পুরুষের উপর ন্যস্ত থাকে। পুরুষকে জীবিকার্জন করাতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে নারীদেরকে পরিবারের দায়িত্বভার হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে তাকে শিক্ষিত ও স্বনির্ভর হতে বাঁধানিষেধ নেই। আর নারী প্রয়োজনে সংসার পরিচালনা করতেই পারে, তা বাঁধা না দেওয়া হলেও তাকে এ গুরুদায়িত্ব ইসলাম ধর্মে দেওয়া হয়নি।

বিষয়টি যদি আমরা একটু ব্যখ্যা করে বলি, তাহলে তা আমাদেরকে নারী পুরুষের মধ্যে ইসলামী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিধি বুঝিয়ে দেবে। ধরুন এক ব্যক্তি তিন লাখ টাকা রেখে মারা গেলেন। তার কন্য পেলো এক লাখ ও পুত্র পেল দুই লাখ। পুত্র নিজের বিবাহে স্ত্রীকে দেনমোহর পরিশোধ করতে গিয়ে অর্থ ব্যয় করে ফেললো, কিন্তু তার ভগ্নীটির বিবাহের ক্ষেত্রে তাকেতো অর্থ ব্যয় করতে হলোই না, বরং সে আরও অর্থ পেলো। আল-কোরআনের ভাষায়, “তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, এবং তাদের কোনো সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এটা তারা যা ওসিয়ত করে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ, এসব তোমরা যা ওসিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোনো পুরুষ অথবা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক বৈপিত্র্যে ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশের, এটি যা ওসিয়ত করা হয় তা দেওয়ার পর, ঋণ পরিশোধের পর, যদি এটি কারও জন্য হানিকর না হয়। এটি আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।” (সূরা নিসা : আয়াত নং-১২)

নারী ও বহুবিবাহ :

প্রাক-ইসলামি বা আইয়ামে জাহিলিয়াহ যুগে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ছিলো না বলে যার যা খুশী করার সুযোগ পেতো। একাধিক স্ত্রীকে একসাথে রাখার বিধান ইসলামে নেই। প্রয়োজনের তাগিদে তা করলেও তা এতো কঠোর শর্তাধীন যেকোনো তাকালে কোন পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ করা খুব কঠিন বিষয়। বহুবিবাহ পরিবারে মারাত্মক কুরক্ষিত তৈরী করে বলে তা করতে পরোক্ষভাবে নিষেধই করা হয়েছে। একজন মানুষ আজীবন কষ্ট করবে সেটিও ইসলামে বাঞ্ছনীয় নয়। ইসলাম মানবতার ধর্ম। সকলকে নিয়ে সুখী জীবনযাপনের সাধনা করতে বলা হয়েছে এ আদর্শে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ। দুইটি শর্ত সাপেক্ষে ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রথমত: প্রথমা স্ত্রীর সাথে স্বামী যদি কোনো কারণে অসুখী হয়ে পড়ে যেমন স্ত্রী যদি অসুস্থ, অকর্মণ্য, অযোগ্য বা উভয়ে যদি অসুখী জীবন যাপন করে তবে স্ত্রীকে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে বলা হয়েছে। ইসলামে অবৈধ মিলন নিষিদ্ধ। কেউ যদি বিবাহ করা সত্ত্বেও চরিত্র কলুষিত হওয়ার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রাখে। তবে ইসলাম এ অবস্থা হতে তাকে পরিত্রাণ দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছে দ্বিতীয় বিবাহের মাধ্যমে। জেনা বা ব্যভিচার সম্পর্কীয় আইন সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত এবং আল্লাহর আদেশ মোতাবেক তোমরা যেন তাদের প্রতি করুণাপরায়ণ না হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করে থাকো; এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে একদল যেন উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।” (আন-নূর, আয়াত নং-২)

ইসলামে নারীর ধর্মীয় অধিকার :

নারীকে যাবতীয় অভিশাপ হতে মুক্ত করা হয়। এতদিন ধরে বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্ম বা সভ্যতায় স্বর্গ বা বেহেশত হতে বিতাড়নের জন্য নারীকে এককভাবে দায়ী করা হতো। ইসলাম ধর্ম নারীকে এ দায়ভার হতে মুক্ত করে। মানব সৃষ্টির শুরুতে আদম ও হাওয়া বা ইভকে বেহেশতে অবস্থানকালীন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন তারতম্য করা হয়নি। আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, “তোমরা এই বৃক্ষের নিকটবর্তীও হবে না, অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।” (বাকারা, ৩৫) সমাজে বসবাসরত চরম বৈষম্যের শিকার নারীগণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ও

তাদের সাথে সকলে যাতে ভালো আচরণ করে সে বিষয়ে জোর তাগিদ দেয়া হয়। ধর্মীয়ভাবে নারীরা যে সকল মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে তা হলো :

সৃষ্টিগত দিক দিয়ে নারী পুরুষের সমান :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ সৃষ্টি করার পশ্চাতে মহান আল্লাহর বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। বিভিন্ন বিপরীতমুখী গুণ ও স্বভাব দিয়েই আল্লাহ তা'য়ালার তাঁর অনন্য সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই সে বিশ্বে আল্লাহ'র খলিফা ও প্রতিনিধিত্বের মহান সম্মানে ভূষিত। আল-কোরআনের ভাষায়, “ আমি জীন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” নারী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র গঠন ও আকার-আকৃতিগত কিছু বৈষম্য বিদ্যমান, কিন্তু তাদের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি ও ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদিতে কোন অমিল নেই। আল-কুরআনে নারীদের মর্যাদার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এভাবে, “হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।” মহানবি (সা.) বলেছেন, “নারী পুরুষের সহোদরা” (ইমাম তিরমিযী, সুনানে-তিরমিযী, ১ম খন্ড, বৈরুত (দারু ইহইয়াইত-তুরাছিল 'আরাবী) তাবি, পৃ.১৯০; ইমাম বায়হাকী, সুনানুল-বায়হাকী আল-কুবরা, ১ম খন্ড, মক্কা (মাকতাবাতু দারিল-বায়), ১৯৯৪, পৃ.১৬৯)

মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষের সাম্যতা

যেখানে নারী প্রকৃতই মানুষ কিনা, তার আত্মা আছে কি না? থাকলেও তা কোন শ্রেণীর-এ নিয়ে সন্দেহে নিপতিত ছিলো প্রাক ইসলামি সমাজ, সভ্যতার বড় বড় দার্শনিকরা সেখানে মানবতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাম্যের কথা এবং সবরকমের ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখ্যানের কথা ইসলামে ঘোষণা করা হলো। তাই মানুষ হিসেবে নারীও অতীব মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধের অধিকারী। কেননা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। সে সকল সৃষ্টিকুলের মধ্যে সেরা। সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার নারী ও পুরুষকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবেই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তাই অর্ধেক মানবতা নারী কখনো লান্চিত, অপমানিত ও নির্যাতিত হতে পারে না। তাইতো ইসলাম সঠিক পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে

নারীজাতিকে অধঃপতিত অবস্থা হতে উত্তোরণের ব্যবস্থা করেছে। সৃষ্টা প্রদত্ত তাদের এ মর্যাদা হরণ করার অধিকার কারও নেই। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুসম করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না, বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে সম্মানিত আমল লিখনবন্দ। তারা জানে, যা তোমরা কর। সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে এবং দুষ্কর্মশীলরা থাকবে জাহান্নামে।” (সূরা ইনফিতর, আয়াতঃ ৬-১৪) এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবকে শরীরের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনগত সুসামঞ্জস্য ও আকার-আকৃতির দিক দিয়ে এমন বৈচিত্রপূর্ণময়রূপে তৈরী করেছেন, যাতে মানুষ পরস্পরের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। অথচ কোন মানুষ তার অবস্থানগত সুবিধার কারণে অন্য মানুষের প্রতি যদি অন্যায়-অবিচার করে, তবে অবশ্যই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষের সকল কর্মফল আল্লাহ তা'য়ালা রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন, যার হিসেব দ্বারা তারা জান্নাত বা জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তা'য়ালা উপরোক্ত আয়াতে মানুষকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়েই সমমর্যাদার অধিকারী

নারী-পুরুষ উভয়েই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় সৃষ্টি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার যাবতীয় সৃষ্টিকুলকে পৃথিব্যের বুকে জীবনযাপন ও চলাচলের সুবিধার জন্য বিভিন্ন উপকরণাদি, ফল-ফসলাদি দিয়ে তার সীমাহীন করুণা ও রহমতবর্ষণের ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য করেননি, তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রদত্ত বিধানেও নারী-পুরুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের মধ্যেও কোন তারতম্য বা পার্থক্য করেননি। মহান আল্লাহ বলেন, “তিনি তো দুনিয়াতে সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২৯) নারী জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এই অধিকারকে নিয়ে কারও কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত এই অধিকার প্রদানের মধ্যেও কোন তারতম্য বা পার্থক্য করেননি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে বলেন, “আমি বণী আদমকে সম্মানিত করেছি। আর ভূ-ভাগে ও সমুদ্রে (দূরত্ব অতিক্রমের জন্য) তাদেরকে যানবাহন দিয়েছি, পবিত্র জিনিসের রিযিক দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদের মর্যাদা দিয়েছি।” (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াতঃ ৭০)

মিথ্যা অপবাদ হতে নারীকে মুক্তি :

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে যে আরবে, গ্রীসে, পারস্যে, ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নতর পর্যায়ে। তাঁদের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে কেউ সেভাবে এগিয়ে আসেনি। তদানীন্তন সমাজ, ধর্ম, সভ্যতায় নারীরা পরিণত হয়েছিল হাসি ঠাট্টার পাত্ররূপে। কেউ তাদেরকে বলত সমাজের গলগ্রহ, কেউ বা বলত সকল পাপের উৎস হলো নারী-এমনি নানান ধরনের অশ্লীল উপাখ্যান, চরম মিথ্যাচার, কুৎসিত মন্তব্যে নারীর জীবন জর্জরিত ছিল। এমনকি বলা হতো আদম (আঃ)-কে জান্নাত হতে বহিস্কারের জন্য এককভাবে নারীই দায়ী। বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ-সভ্যতায় প্রচলিত এই সকল ভ্রান্ত ধারণার অবসান ও নারীকে অপমানের হাত হতে মুক্তি দেবার জন্য ধর্মীয়ভাবে ইসলাম ধর্মে যে ব্যবস্থা ও সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “শয়তান তাদের দুজনকেই সেই বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে পদস্থলন ঘটালো এবং তারা যে স্থানে ছিল সেখান হতে বহিস্কার করালো।” আল্লাহ তা’য়ালার এ সম্পর্কে আরও বলেন, “শয়তান তাদের উভয়কে কুপ্ররোচনা দিলো যাতে তারা লজ্জাস্থানকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে।” (সূরা বাকারাহ, আয়াত : ৩৬)

তৃতীয় অধ্যায় : হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খিলাফত যুগের নারীর অবস্থান

- হযরত খাদিজা (রাঃ)
- হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ)
- হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ)
- হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা (রাঃ)
- হযরত হাফসা (রাঃ)
- হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)
- হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ)
- হযরত মায়মুনা বিনতে আল-হারিস (রাঃ)
- হযরত জুওয়াইরিয়াহ (রাঃ)
- হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ
- হযরত সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত (রাঃ)
- হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ
- হযরত খাওলা বিনতে আযওয়ান
- হযরত যয়নব (রাঃ)
- হযরত রুকাইয়া (রাঃ)
- হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)
- হযরত ফাতিমা (রাঃ)
- হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)
- হযরত সুফিয়া (রাঃ)
- হযরত উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল
- হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খিলাফত যুগের নারীর অবস্থান :

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে ৬১০-৬৬১ খ্রি: পর্যন্ত সময় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বে বিশেষত: মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়-সমতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে এ সময়ে অসংখ্য নারী কাজ করেছিলেন। সে যুগে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য নারীদের অবদান এখানে তুলে ধরা হলো

হযরত খাদিজা (রা:) (জন্ম ৫৫৬ খ্রি: ও মৃত্যু ৬১৯ খ্রি:)

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তদানীন্তন মধ্যপ্রাচ্যের মক্কার অধিবাসী হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা:)-এর নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হয়। সে সময়ে প্রচলিত সকল ধর্মমত, প্রকৃতি পূজারী ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়, কাহিনা বা ভাগ্য গণনাকারী ব্যক্তিবর্গ, হানিফ সম্প্রদায় সকলেই সমাজে প্রচলিত বর্বরোচিত দাস প্রথা, ঘন ঘন সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুটতরাজ, নারী অপহরণ, কন্যাশিশু হত্যা, চরম দরিদ্রতা, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদি অনাচার দূর করতে ব্যর্থ হয়। (রুবেন, ১৯৯৫ : ৪৪) পৃথিবীতে মানবজাতির এই ক্রান্তিলগ্নে হযরত খাদিজা (রা:) সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। তিনি ‘হাতির বছর’ বা ‘আমুল ফীল’-এর পরের বছর আনুমানিক ৫৫৬ খ্রি: মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু আসাদ গোত্রের এক অভিজাত ও বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। (ইবনে সাদ, ১৩২১ হিঃ : ১৩২) তাঁর ডাকনাম ছিলো ‘উম্মুল হিন্দা’ বা ‘উম্মুল কাসেম’। তাঁর পিতা ছিলেন ‘খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ইবনে আবদুল উযযা ইবনে কুসাই’ আর মাতার নাম ছিলো ‘ফাতেমা বিনতে যায়েদা’। তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসে তাঁর হিন্দ ও হারিস নামে দুই সন্তান জন্ম নেয়। এই হিন্দ পরবর্তীতে মুসলমান হন। এবং খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর বিত্তশালী ব্যক্তি আতিকের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। দ্বিতীয় স্বামী আতিকের ঔরসে তাঁর ‘হিন্দা’ নামে আরেকজন কন্যাসন্তান ছিলো। (মুল্লা, ১৯৫৭ : ১২৪) কেউ কেউ বলেন দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো। পূত:পবিত্র জীবনযাপনের জন্য সমাজে তিনি ‘তাহিরা’ বা পবিত্রা নামে খ্যাত ছিলেন। (বালায়ুরী, ১৯৩৭ : ১২১) পরিবারের নৈমিত্তিক কাজের বাইরেও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ

দ্বিতীয় স্বামী ও তিন ভাইয়ের অকালমৃত্যু, সন্তানদের দেখাশুনা, বৃদ্ধ পিতার অক্ষমতায় পারিবারিক বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি দ্বিতীয় স্বামীর রেখে যাওয়া সহায়-সম্পদ দেখভালের দায়িত্বভার এ সময়ে তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তাঁর পিতা আনুমানিক ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ফিজার যুদ্ধে ইন্তেকাল করলে তাঁর কাজের পরিধি ও দায়িত্ব-কর্তব্য আরও বৃদ্ধি পায়। (ইবনে সাদ, ১৩২১ হিঃ : ১৩৭) এ সময় তাঁর বিবাহের জন্য অসংখ্য প্রস্তাব আসলেও তিনি তাতে রাজী হননি। পরবর্তীতে এই বিদূষী নারী মক্কায়ে 'সিদ্দিক' ও 'আল-আমিন' নামে খ্যাত প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের যুবক মুহাম্মদ মুস্তফা বিন আবদুল্লাহ (সা:) (৫৭০-৬৩২ খ্রি:) এর সাথে ব্যবসায়িক সূত্রে পরিচিত হন। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সততা, ন্যায়পরায়ণতা, উত্তম ব্যবহার, ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা তাঁকে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করেন। এ সময় উভয় পক্ষের পরিচিতা নাফিসা নান্দীয় বান্ধবীর মাধ্যমে হযরত খাদিজা (রা:) মুহাম্মদ (সা:) কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদ (সা:) তখন স্বীয় চাচাদের সাথে পরামর্শক্রমে এ বিয়েতে সম্মতি প্রদান করেন। (ইবনে সাদ, ১৩২১ হিঃ : ১৫২) হযরত খাদিজা (রা:)-এর বয়স ছিলো তখন চল্লিশ বছর। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব, কোমলতা, শৃঙ্খলাবোধ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, পবিত্রতা ইত্যাদি কারণে হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। (নু'মানী, ১৯৫২ : ১৮৮) অথচ মাত্র পঁচিশ বছরের একজন পরিশ্রমী যুবক, চরিত্র মার্ধ্য ও কর্মগুণে সকলের প্রিয়ভাজন হযরত মুহাম্মদ (সা:) অনায়াসে একজন অল্পবয়সী, কুমারী কন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন। তা না করে তিনি বিধবা হযরত খাদিজা (রা:) কে বিবাহ করা যৌক্তিক ভাবেন। তাঁর সম্পর্কে Michel Hart বলেন, "My choice of Muhammad to be on the top the list of the "worlds most influential person in history" may come as a surprise to some people, but he is the only person in history who was supremely successful in both the religious and secular levels." (www.Danielpipes.org) হযরত খাদিজা (রা:)-এর পক্ষে তাঁর চাচা আমর ইবনে আসাদ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর পক্ষে চাচা আবু তালিব এর অভিভাবকত্বে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিয়েতে দেনমোহর হিসেবে ২০টি উট বা কারও

মতে পাঁচশ'ত স্বর্ণমুদ্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫ : ১৮৯) চাচা আবু তালিব এ বিবাহে খোতবা পাঠ করেন।

সমাজ সংস্কারে এ বিবাহের গুরুত্ব

সে সময়ে হযরত খাদিজা (রা:) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:) হতে বয়সে বড়, এমনকি সন্তানসহ বিধবা এক নারী। সামাজিকভাবে সমালোচিত এ কঠিন বিষয়গুলো তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। এখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা ও একে অন্যের প্রতি অনুরাগই মুখ্য ছিলো। অথচ এই আধুনিক যুগেও নারী-পুরুষ এ রকম বয়সের ব্যবধানে বিবাহ করলে তীব্র নিন্দার মুখে পড়তে হয়। অথচ তাঁরা আজ হতে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে যে প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন তা চিরস্থায়ী আদর্শের এক বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয়। মক্কার একজন বিত্তশালী নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে স্বামী সেবাসহ সন্তানদের প্রতিপালন, গৃহস্থালিসহ যাবতীয় দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতেন। (ইবনে হাজার, ২০০০ : ২৮৩) তাঁদের ঔরসে যয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমাতুয যোহরা নামে চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যারা পরবর্তীতে সমাজ উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হন। আর পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে কাসেম ও আবদুল্লাহ। তাঁরা অকালেই মৃত্যুবরণ করেন। (Ibn Ishhaq's, 1981 : 65)

ধর্মীয় আদর্শ প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর অনুপ্রেরণার উৎস

হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকেই হযরত খাদিজা (রা:)-স্বামীর সকল কাজে অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। তিনি স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর উপযুক্ত সঙ্গী হিসেবে তাঁর যাবতীয় সংগ্রামে, বিপদাপদে প্রাণপণে সহযোগিতা করতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা:) ইতোমধ্যে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু এক পর্যায়ে হযরত খাদিজা (রা:) বুঝতে সক্ষম হন, তাঁর স্বামীর সংসারধর্ম ভালো লাগছে না। নিপীড়িত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তার সাহায্যের আশায় সংসার ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা পরিত্যাগ করে হযরত মুহাম্মদ (সা:) দূরে নির্জন স্থানে যেতে ইচ্ছুক হলে তাতে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি জানতেন ক্ষত-বিক্ষত সমাজে সাংঘর্ষিক সমস্যাগুলোর সালিশী সমাধানের জন্য সকলেই তাঁর স্বামীর শরণাপন্ন হন। কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে আজকের পুলিশ বিভাগের ন্যায় তাদের

‘হিলফুল ফুযুল’ নামক সংঘও গঠিত হয়েছিলো, যার সদস্য হয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেন যুবক হযরত মুহাম্মদ (সা:)। এ সংঘ একবার খাসসাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সাথে মক্কায় হজ্জ করতে আসা তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকে নবীহ নান্নী দুর্বত্তের হাত হতে উদ্ধার করে। (হালাবি, ১৩৩৮ হিঃ : ৪৬) কিন্তু শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চতুর্দিকের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছিল না।

এ অবস্থায় রাসূল (সা:)-এর মানসিক উদ্ভিগ্নতা লক্ষ্য করে হযরত খাদিজা (রা:)-স্বামীর সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি নিজের কাঁধে পুনরায় ব্যবসা পরিচালনার ভার তুলে নেন। সে সময়ে ইসমাইলীয় বংশে বা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর পূর্বসূরিদের মধ্যে সত্য প্রত্যাশায় ধ্যানমগ্নতার ধারা প্রচলিত ছিলো। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ৫৫) হযরত মুহাম্মদ (সা:) দুর্গম পথ অতিক্রম করে মক্কা হতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নির্জন পর্বতের একটি ছোট গুহা ‘হিরা’য় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখান হতে তিনি কখনও লোকালয়ে ফিরলে বিচক্ষণ হযরত খাদিজা (রা:) তাঁকে প্রচুর শুকনো খাদ্য-সামগ্রী দিতেন যেন তার নির্জন ও দুর্গম এলাকায় কোনো সমস্যা না হয়। (ইবনে কাসীর : ২০০০ : ১৩) এভাবে দশ বছর চলার পরে তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ফেরেশতা জিবরাইল মারফত হেরা গুহায় প্রথম ঐশীবাণী প্রাপ্ত হন, যখন তাঁর বয়স ছিলো চল্লিশ অর্থাৎ কাল ৬১০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিক বা ১৭ রমযান (যা পরবর্তীতে নির্ধারিত হয়েছিলো) (Lings, 1983 : 44) আল্লাহর ভাষায়,

أَقْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

“পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রব বা পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট পিণ্ড বা রক্ত থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।” (সূরা আলাক্ফ, আয়াত নং ১-৫) অন্য সূত্র হতে জানা যায়, ফিরিশতা জিবরাইল (আ:) তাকে বললেন, আপনি পাঠ করুন। হযরত মুহাম্মদ (সা:) বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। হযরত জিবরাইল (আ:) তাকে সজোরে আলিঙ্গন করে পড়তে বললে তিনি পুনরায় বলেন, “আমি তো পড়তে জানি না। এ ঘটনা তিনবার হলো। (বুখারি, ১৩৮৭ হিঃ : ৩২৭) এ ঘটনার

আকস্মিকতায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) এত ভয় পেলেন যে, তাঁর জ্বর এসে গেল। এ অবস্থাতেই তিনি এ বাণী মুখস্ত করতে সক্ষম হন। এ ওহী ছিলো তখনকার সমাজ পরিবর্তনের সূচনা সনদ।

ভবিষ্যৎ চলার পথ নির্ধারণে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগীতা দান

হযরত মুহাম্মদ (সা:) প্রথম এ ওহী অবতীর্ণের পর কাঁপতে কাঁপতে গৃহে ফিরলেন। তখন হযরত খাদিজা (রা:) তাঁকে দেখে তাঁর গায়ের উপরে কমল বিছিয়ে প্রথমে তার সুস্থতার ব্যবস্থা করলেন ও সব শুনলেন। কী ঘটেছে বিচক্ষণ হযরত খাদিজা (রা:) তা আন্দাজ করতে পারলেন। এতদিন ধরে যে আশায় হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে তিনিও কষ্ট করছিলেন সে মুহূর্তটি আজ উপস্থিত, তা তিনি উপলব্ধি করলেন। নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা এ ঐশী বাণীর মাহাত্ম্য অনুধাবন করে সাথে সাথে তিনি তার ভয় দূর ও সাহস সঞ্চয় করার জন্য বলেন, আপনি ভীত হবেন না, আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি মৈত্রী স্থাপন করেন, অক্ষম ও দুঃস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদের আশ্রয় দান করেন এবং কষ্টের মধ্যেও সত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।” (বুখারি, ১৩৮৭ হিঃ : ৩২৭ ; মুত্তা, ১৯৫৭ : ২০৩)

পরক্ষণেই তিনি স্বামীসহ শান্তিপথের অগ্রযাত্রায় প্রথম ওহী অবতীর্ণের পর ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনার লক্ষ্যে তাদের উভয়ের শুভাকাজক্ষী আরবের জ্ঞানী এবং হিব্রু ভাষায় পণ্ডিত হযরত খাদিজা (রা:)-এর পিতৃব্যপুত্র ওরাকা ইবনে নওফিল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযার নিকটে যান। তাওরাত ও ইঞ্জিল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ওরাকা ইবনে নওফিল সব শুনে বলেন, মুহাম্মদ তো সত্যের বার্তাবাহক। মূসার নিকটও এ ঐশীবাণী প্রেরিত হয়েছিলো। তিনি আরও বলেন, আফসোস! যখন তাঁকে তাঁর জাতি নির্বাসিত করবে, তখন তো আমি থাকবো না। (ইবনে কাসীর, ২০০০ : ১৪) এ কথা শুনে হযরত খাদিজা (রা:)-এর অনুপ্রেরণায় হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর মধ্যে আর দ্বিধা থাকলো না। তিনি নিশ্চিত মনে সাহসী হয়ে এ আদর্শিক নতুন পথে পরিচালিত হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। (ইবনে আসির, ১৯৯৫ : ৭৮ ; বুখারি, ১৩৮৭ হিঃ : ৩২৭)

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ ও সমাজ উন্নয়নে এর প্রভাব

মানবজাতির জন্য হিতকর হবে এ মত পোষণ করে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর উপর অবতীর্ণ বাণী বা আদর্শের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন হযরত খাদিজা (রা:)। এ ব্যাপারে ইসলামে বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত মত হলো, হযরত খাদিজা (রা:) সর্বপ্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা করেন। (ইবনে কাসীর, ২০০০ : ৪০০ ; (Ibn Ishhaq's, 1981 : 83) তাই বলা চলে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা (রা:) যিনি ছিলেন একজন নারী।

চুরি ডাকাতি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নির্মূল

ইসলামের অগ্রযাত্রার সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি হিসেবে যে ভার বা দায়িত্ব বা যে পথ তিনি উন্মুক্ত করেছিলেন তা পরোক্ষভাবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে। তাঁর এই অসাধারণ সাহসিকতার কারণে অন্যরাও মানবতার বাণী গ্রহণে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর আত্মত্যাগে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন হযরত আলী (রা:), পালক পুত্র যায়েদ ও কন্যারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের দেখাদেখি আরও অনেক গোত্রের লোক সাহসী হয়ে এ মতাদর্শ গ্রহণ করে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করা বন্ধ করে। কারণ এ মতাদর্শে প্রকৃত দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও এ সকল ঘৃণিত কাজ করতে পারে না। (মুল্লা, ১৯৫৭ : ৫৮ ; সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত নং ১২) প্রসঙ্গক্রমে ‘বনু তাই’ গোত্রের কথা বলা যায়। এদের ভয়ে কেউ রাতে বের হতে পারতো না। নারী ও শিশুদের তাঁরা ধরে নিয়ে যেত। অথচ কয়েক বছর পরে নারীরা তাদের এলাকা দিয়ে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারতো। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা:) বলেন, “ব্যভিচারী ব্যক্তি মু’মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। আর চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না আর যখন পুরা পাপ করে তখনও মু’মিন থাকে না।” (বুখারি, ২০০৭, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ১০০৩) আল্লাহর ভাষায়, “এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। (সূরা নিসা, আয়াত নং- ১৬১)

রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত খাদিজা (রা:)

অবরোধ মোকাবিলা

মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সাম্যের এ আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে অচিরেই হযরত খাদিজা (রা:) পরিবারসহ ইসলাম বিরোধী মক্কার কুরাইশ গোষ্ঠীর চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখোমুখি হন। ৬১৪ খ্রি: হযরত মুহাম্মদ (সা:) প্রকাশ্যে কাবার সম্মুখে চল্লিশজন নবদীক্ষিত মুসলমানকে সাথে নিয়ে অত্যন্ত নমনীয়ভাবে আল্লাহর একত্ববাদের কথা উচ্চারণ করেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “একমাত্র আমিই আল্লাহ তায়ালা, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নাই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থ নামাজ কায়েম করো।” (সূরা ত্বহা, আয়াত নং-১৪) এ কথা উচ্চারণের সাথে সাথেই হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর শত্রুরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তাঁদের নিষ্ফল তরবারির আঘাতে হযরত খাদিজা (রা:)-এর প্রথম পক্ষের সন্তান হারিস ইবনে হালা নিহত হন। হামলাকারী এ দলের প্রধান ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর আপন চাচা আবু লাহাব। (Tabari, 1901 : 67) এ ঘটনায় হযরত খাদিজা (রা:) অত্যন্ত শোকার্ত হলেও সমাজে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে অবিচল থাকেন।

কিছু বিশৃঙ্খল সমাজের মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে আনা এতো সহজসাধ্য ছিলো না। অচিরেই তিনি পরিবারসহ এ নতুন আদর্শের প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী কুরাইশদের নিকট হতে নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মুখোমুখি হন : যেমন রান্নাঘরে অপবিত্র বস্তু ছোঁড়া, রাস্তার গরম বালুতে কোনো মুসলমানকে পা বেঁধে ফেলে রাখা, পথে কাঁটা বিছানো, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ইত্যাদি। (ইবনে সাদ, ১৩২১ হিঃ : ১৪২) এ অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আরেক চাচা আবু তালিব ও কিছু হিতৈষী ব্যক্তি পৌত্তলিক ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকেও মানব সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল কামনায় মুসলমানদেরকে তাদের হাশিম গোত্রে আশ্রয় দেয়। (রুবেন, ১৯৯৫ : ১৫০) তখন বিরোধী কুরাইশ বংশীয় চল্লিশজন মিলে একটি চুক্তি করে হাশিম গোত্রকে প্রস্তাব দেয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর পরিবার ও তার সকল অনুসারীকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে অন্যথায় হাশিম গোত্রের সাথে তাদের যাবতীয় লেনদেন, বিবাহ-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ থাকবে। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ৫৮-৫৯)

এ ধরনের চরম বিরোধিতার কবল হতে আত্মরক্ষা ও মানবতার কল্যাণের কথা ভেবে হযরত খাদিজা (রা:) সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ৬১৭ খ্রি: পরিবার ও প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থিত ‘শিয়াবে আবু তালিব’^{১০} (তফাজ্জল ও মুজতবা, ১৯৯৮ : ৩৪২ ; রুবেন, ১৯৯৫ : ১৫২) গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ অন্যান্য মুসলমানদের সাথে হযরত খাদিজাও (রা:) প্রাকৃতিক নানাবিধ দুর্যোগ, বজ্রাভাব এমনকি প্রতিনিয়ত শত্রুপক্ষের হামলারও মুখোমুখি হয়েছেন। কখনও অবস্থা এমন গেছে যে, তাকে অন্যদের সাথে লতা-পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে। (তালিবুল, ১৯৯০ : ২৩ ; Lings, 1983 : 43) ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নায় শত্রুরা খুবই মজা পেতো। এ পরিস্থিতিতে হযরত খাদিজা (রা:)-এর ভাতিজারা চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের ফুফুর জন্য খাদ্য দিতে পারেনি, রাস্তায় শত্রুপক্ষের এমনই কঠোর নজরদারি ছিলো। (ইবনুল জওযি, ১৯৫৯ : ৮)

এত দু:খ-কষ্ট, চলাচলের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এই অন্তর্বর্তী সময়ে হযরত খাদিজা (রা:) বহির্বিশ্ব হতে মক্কার পথে হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রতি, হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে নতুন এ আদর্শ প্রচারে উৎসাহ দিয়ে যেতেন যেন নবাগত ইসলামের প্রচারকার্য অব্যাহত থাকে। (ইবনুল জওযি, ১৯৫৯ : ২০ ; আরনল্ড, ২০০০ : ৩৪) শেষ পর্যন্ত মক্কার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু মুখতারী উপত্যকায় নির্বাসিত হাশিম গোত্রের কিছু অমুসলিমদের জন্য খাদ্য পাঠাতে চাইলে আবু জেহেল তা রাস্তায় ফেলে দেয়। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে আবু জেহেলকে প্রহার করে। পরবর্তীতে আবু মুখতারিসহ আমির ইবনে লুয়াই গোত্রের হিশাম ইবনে আমির, আবু তালিব প্রমুখ মিলে নির্বাসিত স্বজনদেরকে মক্কার ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। তারা চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলে। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ৬৯) পরবর্তীতে আবু তালিবের মধ্যস্থতায় তাঁরা মক্কার ফিরে আসতে সক্ষম হন। কিন্তু লোকালয় হতে বিচ্ছিন্নতা, অনাহার ও অনিদ্রার কারণে খাদিজা (রা:) সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবুও তিনি স্বামীকে উৎসাহিত করতে থাকেন। তাঁর এই মানসিক দৃঢ়তার পশ্চাতে নিহিত ছিলো স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা:)-এর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সীমাহীন আত্মত্যাগ। মক্কার

১০. ‘শিয়াবে আবু তালিব’ ছিলো একটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম, যেখানেই আত্মরক্ষা করতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) অনুসারী দল ও পরিবারের সদস্য নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। এ জায়গাটি ছিল একটি গিরিখাতের মধ্যের একটি অস্থায়ী আবাস। এর চারধারে পর্বত থাকায় এটির নিরাপত্তা আলাদাভাবে লাগতো না। দুর্গের ন্যায় এ স্থানটি শিয়াবে আবু তালিব নামে পরিচিত, যার মালিক ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর আপন চাচা আবু তালিব।

ফেরার অল্পদিন পরেই খাদিজা ২৪ বছরের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে আনুমানিক ৬৪ বছর বয়সে ৬১৯ খ্রি: ইন্তেকাল করেন। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ৩৩)

মক্কার কুরাইশরা এ সময়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে তাঁর ধর্মমত প্রচারে নিষেধ করলে তিনি বলেন, তাঁর উপর সৃষ্টিকর্তা যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন তা হতে তিনি সরে আসতে পারবেন না। তাঁর এক হাতে চন্দ্র আর আরেক হাতে কেউ যদি সূর্য এনে দেয় তাও তিনি আদর্শ প্রচারের পথ হতে বিচ্যুত হবেন না। (ইবনে কাসীর, ২০০০ : ৯২ ; Lings Martin, 1983 : 43) আদর্শ প্রচারে রাসূল (সা:)-এর এই নির্ভীক মানসিকতার পিছনে হযরত খাদিজা (রা:)-এর অনুপ্রেরণা ছিলো শতভাগ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সা:) অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। তিনি আজীবন তাঁর স্মৃতি ও অবদান স্মরণ করতেন। হযরত আয়শা (রা:) এ সম্পর্কে বলেন, “আমি খাদিজাকে দেখিনি। তা সত্ত্বেও তাঁকে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম, রাসূল (সা:)-এর অন্য কোনো স্ত্রীকে সে পরিমাণ ঈর্ষা করিনি। কারণ রাসূল (সা:) খুব বেশি বেশি তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি যখনই কোনো ছাগল জবেহ করতেন, তার কিছু অংশ কেটে খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। আমি যদি বলতাম, দুনিয়াতে যেন খাদিজা ছাড়া আর কোনো নারী নেই। তিনি বলতেন, খাদিজা এমন ছিলো যাঁর থেকেই আমি সন্তান লাভ করেছি।” (বুখারি, ১৩৮৭ : ৬৭৭)

হযরত আয়শা (রা:) আরও বলেন, রাসূল (সা:) একবার খাদিজার কথা আলোচনা করলেন। আমি একটু কটুক্তি করে বললাম, তিনি তো বৃদ্ধা। তাছাড়া আল্লাহ তার পরিবর্তে উত্তম নারী আপনাকে দান করেছেন। রাসূল (সা:) বললেন, আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম নারী আমাকে দান করেননি। মানুষ যখন আমাকে মানতে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার প্রতি ইমান এনেছে। মানুষ যখন বঞ্চিত করেছে, তখন সে তাঁর সম্পদেও আমাকে অংশীদার করেছে। আল্লাহ তার সন্তান আমাকে দান করেছেন এবং অন্যদের সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি বললাম, আমি আর কখনও তাঁকে নিয়ে আপনাকে বলবো না। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ২৮৩) এ কারণে হযরত খাদিজা (রা:) বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ‘উম্মুহাতুল মুমিনীন’ নামে ইতিহাসে খ্যাত। উম্মুহাতুল মুমিনীন শব্দের অর্থ মুসলিমদের মাতাগণ। আল্লাহর ভাষায়, “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমিনদিগের নিকট তাদিগের নিজদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের

মাতা।” (সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৬)। তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) আর কোনো বিবাহ করেননি।

ক্রীতদাস মুক্তকরণ

তখনকার সমাজব্যবস্থার একটি ঘৃণিত ও চরম অমানবিক ব্যবস্থা ছিলো ক্রীতদাস-দাসী প্রথা। তাই ইসলাম এ ব্যবস্থাটিকে ক্রমবিলুপ্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছিলো। আর মুসলিম নারীরা সমাজ হতে এ বর্বরোচিত প্রথা বিলুপ্ত করতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁরা দাস-দাসীর মর্যাদা বৃদ্ধি, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াসহ সমাজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে গেছেন। হযরত খাদিজাও (রা:) দাসত্বের বন্ধন হতে দাস-দাসীদেরকে মুক্তিদানের ব্যাপারে অবদান রেখে গেছেন। তিনি বহু দাস-দাসীকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বাজার হতে পছন্দ করে যায়িদ বিন হারিসাকে ক্রয় করে রাসূলকে (সা:) উপহার দিলে রাসূল (সা:) তাকে মুক্ত করে পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ২৪৮) আরেক ঘটনায় জানা যায়, আবু লাহাবের দাসী সুয়ায়বা রাসূল (সা:)-এর আরেক দুধমাতা ছিলেন। তিনি যখন রাসূল (সা:)-এর নিকটে আসতেন তখন খুবই সম্মান পেতেন। তাকে আবু লাহাবের হাত হতে মুক্তি দানের জন্য খাদিজা (রা:) প্রস্তাব দেন। যদিও আবু লাহাব তাকে বিক্রি করতে রাজি হননি। (বালায়ুরী, ১৯৩৭ : ৯৬)

তাই সামাজিক কল্যাণে হযরত খাদিজা (রা:) যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে গেছেন তা চির অবিস্মরণীয় ও আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

হযরত খাদিজা (রা:) এর অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা

উদ্যোক্তা হিসেবে

হযরত খাদিজা (রা:) উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও নিজস্ব মেধা, শ্রম ও একাগ্রতায় সমাজের কৃপমণ্ডকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে একজন সফল উদ্যোক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি তখন বিধবা অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর জীবিকা নির্বাহে সহযোগিতা করার মতো আর কেউ ছিলো না। তাই তিনি সাহসী হয়ে নিজেই ব্যবসা করতে শুরু করেন, যা ছিলো সেই সময়ের বিশ্বে বিরল।

মক্কাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর সমকক্ষ ব্যবসায়ী আর কেউ ছিলো না। (Batuta, 1942 : 4) তাঁর একার ব্যবসায়িক পণ্যই কুরাইশদের সমগ্র পণ্যের সমান হতো। এ সময়ে তাঁর একজন বিশ্বস্ত ও দক্ষ তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি বিশাল ব্যবসা পরিচালনার জন্য লেন-দেনে নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দেন, মক্কার বাইরে যার পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিলো (নুমানী, ১৯৫২ : ১৮৯-১৯০)। হযরত মুহাম্মদ (সা:) নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে সিরিয়া যান এবং পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন। তিনি ফিরে এলে হযরত খাদিজা (রা:) তাকে লভ্যাংশের একটি অংশ দেন। পরে তাকে লভ্যাংশের অংশীদারও করেন। শরিকানা বা সমঅংশীদারের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা, একই সাথে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে অবদান রাখা জাতির প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ও অনুরাগ প্রকাশ করে, যা বিংশ শতকের অর্থনীতিতে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। (Hitti, 1969 : 6)

নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান

মক্কা ও এর আশপাশের যে সকল ব্যক্তি ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করতো তাদেরকে গোত্রচ্যুত করা হতো। তাদের নিত্যপ্রয়োজন পূরণে তিনি নিজের সকল অর্থ-সম্পদ ‘সাবিকিনে আওয়ালিন’ বা অগ্রবর্তী মুসলমানদের অভাব দূরীকরণে ব্যয় করে গেছেন, যা পরার্থবাদিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দুধমাতা হযরত হালিমাকে (রা:) চল্লিশটি ছাগল ও কিছু উট দান করেন। (ইবনে আবদিল বার, ১৯৮৫ : ২৮৩)

তাই হযরত খাদিজা (রা:) ইসলামের উষালগ্নে এর কাণ্ডারী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে হতাশা হতে মুক্ত করতে তাকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সাঙ্কনা প্রদান, পরামর্শ দানের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। শুধু তাই নয় তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যে অপরিসীম মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন তা মানবজাতির ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। একই সাথে নিজের ধন-সম্পদ অকাতরে দানসহ তিনি সমাজ পরিবর্তনে প্রথম সারির যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা:) (মৃত্যু সন আনুমানিক ৬৪৫ খ্রি:)

হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা:) মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তাঁর পিতা কায়েস একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। আর তাঁর মাতা শামস বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু নাজ্জার শাখার মেয়ে ছিলেন। সাওদার ডাকনাম ছিল 'উম্মুল আসওয়াদ'। ইসলাম-পূর্ব যুগে মক্কার অপর এক অভিজাত পরিবারের সন্তান সাকরান ইবনে আমর' এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হযরত সাওদা (রা:) খলিফা হযরত উমর (রা:)-এর খিলাফতকালের শেষের দিকে ২৩ হিজরি মোতাবেক ৬৪৫ খ্রি: আনুমানিক আশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (বালায়ুরী, ১৯৩৭ : ১৪৭)

ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা

হযরত সাওদা (রা:) স্বামীসহ ইসলাম আবির্ভাবের সূচনালগ্নে মুসলমান হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দলে যোগদান করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারে অংশ নেন। অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় তিনিও তীব্র প্রতিরোধের মধ্যে পড়েন। নির্যাতন হতে রক্ষা পেতে মুসলমানগণ মক্কা হতে হাবশায় (আজকের আবিসিনিয়া) স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন। (নূরুন্নাযামান, ১৯৯৭ : ২৭) কিন্তু হযরত সাওদা (রা:) পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার আশায় কঠিন ধৈর্যধারণ করে স্বামীসহ মক্কা থেকে যান। এদিকে মক্কার কুরাইশরা সব মুসলমান হয়ে গেছে এরকম একটি খবর শুনে হাবশায় গমন করা মুসলমানগণ মক্কা ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁরা দেখেন এটি ছিলো কুরাইশদের রটানো একটি গুজব যেন মুসলমানদেরকে তাঁরা ফিরে পেয়ে শেষ করে দিতে পারে। বাধ্য হয়ে মুসলমানরা বিভিন্ন শক্তিশালী গোত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ মুহুর্তে বহু অমুসলিম তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে, যারা কামনা করছিল সমাজে একটি মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি হোক। (মুল্লা, ১৯৫৭ : ২৬৫)

কিন্তু মক্কার উতবা, শায়বা, আবু জেহেল প্রমুখ শাসকশ্রেণির ব্যক্তির এ আদর্শের জনপ্রিয়তায় তীব্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়। তারা মুসলমানদেরকে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করলে আত্মরক্ষার জন্য হযরত সাওদা (রা:) পরিবারসহ আরও বিরশি জন মুসলমানদের সাথে 'সুয়ায়বা বন্দর হতে জাহাজযোগে দ্বিতীয় পর্যায়ে হাবশা

গমন করেন। (Tabari, 1901 : 150) তাঁরা কিছুদিন পরে মক্কায় ফিরেও আসেন। হযরত সাওদা (রাঃ)-এর স্বামী সাকরান অচিরেই মারা যান। তাঁদের সন্তান আবদুর রহমানও পরবর্তীতে মানবতার কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে বিরোধীদের সাথে পারস্যের জালুলার যুদ্ধে শহীদ হন। (নু'মানী, ১৯৭৮ : ৪০৪) ইসলামের জন্য তাদের এই আত্মবিসর্জন বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। স্বামী ও উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যুর কারণে তিনি অত্যন্ত অসহায় ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পতিত হন।

একই সময়ে প্রিয়তমা স্ত্রী ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যুতে রাসূলও (সাঃ) শোকাহত হয়ে একাকিত্বে ভুগছিলেন। তাই ৬২০ খ্রিঃ বিশিষ্ট সাহাবি খাওলা বিনতে মাজউন হযরত সাওদা (রাঃ)-এর মতামত নিয়ে তার সাথে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসলে মহানবী (সাঃ) তা গ্রহণ করেন। তাদের এ বিয়ের ঘটনা এমন এক সময় সংঘটিত হয় যখন নবদীক্ষিত মুসলমানদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে ইসলামি সমাজকে গতিশীল করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে সংসারে আর্থিক অনটন চলছিলো। এমনকি মক্কার বিধর্মীরা তাদের ঘর-বাড়ি লুটতরাজসহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলো। এত কিছুর পরও সত্য প্রচারের আদর্শ হতে তিনি ও তাঁর পরিবার বিচ্যুত হননি। নানারূপ কষ্টদানের পরও কোনোভাবে রাসূল (সাঃ)-কে দমাতে না পেরে অবশেষে মক্কার কুরাইশরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, “কুরাইশ নেতাদের একটি দল কাবার সম্মুখে একত্রিত হয়। অতঃপর লাত, মানাত ও উযযার নামে শপথ করে বলে যে, এবার আমরা মুহাম্মদকে দেখলে একযোগে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং হত্যা না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়বো না।” (বুখারি, ১৩৮৭ হিঃ : ২২৯) এ দলে ছিল বনু মাখজুম গোত্রের আবু জেহেল বিন হিশাম, আব্দে মান্নাফ গোত্রের জুবায়ের বিন মুত্ত'ইম, উৎবা, আবু সুফিয়ান বিন হারব প্রমুখ।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের এ কঠিন অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অভিজ্ঞতাসম্পন্না, সাংসারিক জ্ঞানে দক্ষ, সংগ্রামী জীবনে অভ্যস্ত তিরিশ বছর বয়সী বিধবা সাওদা (রাঃ) কে হিজরতের তিন বছর পূর্বে বিবাহ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হেরা গুহায় থাকাকালীন সময়ে হযরত খাদিজা (রাঃ)-যেভাবে সংসার ও ব্যবসা পরিচালনাসহ তাঁকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতেন সাওদা (রাঃ)ও তেমনিভাবে সংসার পরিচালনার ভার গ্রহণ করে ৬২২ খ্রিঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আত্মরক্ষার্থে মক্কা হতে মদিনায়

হিজরতের ইচ্ছাকে সমর্থন জানান। (আল-জাহাবি, ১৩৬৭ হিঃ : ৬৭) ফলশ্রুতিতে মদিনায় জনগণের অধিকার রক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়। পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) মদিনা হতে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে মক্কা হতে মদিনায় নিয়ে আসেন। হযরত সাওদা (রা:) ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সংসার জীবন প্রায় তেরো বছরের ছিলো।

ক্রীতদাস মুক্তকরণ

মানুষে মানুষে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারকামীরা এ প্রথা উচ্ছেদে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ক্রীতদাসদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত সাওদা (রা:) এগিয়ে আসেন। যেমন বদর যুদ্ধ শেষে তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান ইবনে ‘আমরের ভাই সুহাইল ইবনে আমর ধৃত হয়ে মদিনায় আনীত হলে তিনি চার হাজার দিরহাম ব্যয় করে তাকে বন্দী অবস্থা হতে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। (Ibn Ishhaq’s, 1981 : 100)

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

তিনি নারীর সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীক পর্দাপ্রথা প্রচলনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। একদিন পথে চলতে দীর্ঘদেহী ও স্থূলকায় হযরত সাওদা (রা:) ও হযরত ওমর (রা:)-এর মধ্যে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝির কারণে সমাজে নারী-পুরুষের চলাফেরায় শালীনতা রক্ষা করার নির্দেশনা আসে যা নারীর নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে। আল্লাহর ভাষায়, “হে নবী। আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, আপনার কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন যে, তাঁরা যেন নিজেদের (শরীরের) উপর চাদর টেনে দেয়।” (সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৫৯) আল্লাহতায়াল্লা আবারও বলেন, “(হে নবী!) আপনি মুসলমান পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নত করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফায়ত করে। এটা তাদের পবিত্রতার পক্ষে উত্তম। তারা যা করে আল্লাহতায়াল্লা তা নিশ্চয় জানেন। (এরূপে) আপনি মুসলমান মেয়েদের বলে দিন, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টি নত করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফায়ত করে। নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, কিন্তু যা স্বভাবত খোলা থাকে (যথা- পায়ের পাতা, হাতের কবজি ও মুখমণ্ডল) এবং নিজেদের ওড়না যেন নিজেদের সিনার উপর দিয়ে রাখে। উপরন্তু নিজেদের সৌন্দর্যকে এ সকল মোহরেম ব্যক্তি ব্যতীত কারও নিকট প্রকাশ না করে-নিজেদের স্বামী, নিজেদের পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের সন্তান, নিজেদের নারীগণ (অর্থাৎ মুসলমান নারীগণ),

নিজেদের অধীন দাসীগণ, নারী সম্পর্কে অনুভূতিহীন, অধীন পুরুষগণ অথবা সকল ছেলে, যারা মেয়েদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে অবগত নয়। এতদ্ব্যতীত মেয়েরা যেন এমন জোরে পা না ফেলে, যাতে তাদের লুকানো সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। হে মুমিনগণ! (এতে যদি তোমাদের কোনোরূপ ত্রুটি হয়ে যায় তা হলে সকলে মিলে আল্লাহর নিকটে তাওবা করো, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পারো। (সূরা নূর, আয়াত নং ৩০)। আবার এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদও (সা:) বলে গেছেন, “তিনি স্ত্রীলোকদেরকে (আপন স্বামীর গৃহ ব্যতীত) সুগন্ধী ব্যবহার করতে এবং পাতলা বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।” (মেশকাত, ২০১০ : ১০৪) উপরোক্ত হাদিসটি হযরত সাওদা (রা:) বর্ণনা করে গেছেন।

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা:) (জন্ম ৬১২-মৃত্যু ৬৭৮ খ্রি:)

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত আয়শা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (রা:) মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের বনু তাইম গোত্রে একটি সংগ্রামী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিলো হুমায়রা যার অর্থ ফর্সা সুন্দরী আর তাঁর উপাধি ছিলো ‘সিদ্দীকা’। তাঁর জন্মসাল, হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে বিবাহকালে তাঁর বয়স কত ছিলো এ নিয়ে এখনও কোন গ্রহণযোগ্য মতামত পাওয়া যায়নি। তবে পরিণত বয়সেই স্বামীর সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিলো। তিনি নিজের জীবনে সংঘটিত নানা ঘটনা বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন যা হতে বোঝা যায় তিনি উপযুক্ত বয়সে সংসারজীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর জন্মসাল নির্ধারণের একমাত্র উৎস হিসেবে তাঁর বিবাহকালের বয়স ভিন্ন আর কোন উৎস পাওয়া যায়নি। বিবাহ বা আকদের সময় তাঁর বয়স কত ছিলো এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে মতামত দিয়েছেন। এরকম এক মতে বলা হয়েছে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিলো এবং তাঁর রুসুমত সম্পন্ন হয়েছিলো হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নবুওয়াতের ১৫তম বছরের শাওয়াল মাসে মদিনায়। (Ibn Saad, 1995 : 276) (ইবনে সাদ, ১৯৭৫ : ৫৮) এ মতে, তাঁর আকদ ও রুসুমতের সময়ের মধ্যে আনুমানিক পাঁচ বছর ব্যবধান ছিলো। এ হিসেবে তিনি রাসূল (সা:)-এর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন এগারো

বছর বয়সে। আরেক মতে, নবুওয়্যাতের চতুর্থ বছরের সূচনায় তাঁর জন্ম হলে নবুওয়্যাতের দশম বছরে তাঁর বয়স ছয় বছর নয়, বরং সাত বছর হবে। আর এ হিসেবে তিনি স্বামী গৃহে পদার্পণ করেছিলেন বারো বছর বয়সে। তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স ছিলো পঞ্চাশ বছর। (মাবুদ, ২০১৪ : ৫৭ ; রুশদী, ২০০৮ : ৩৭) এ মতে, তাঁর জন্ম সাল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির চতুর্থ বর্ষের গোড়ার দিক মোতাবেক আনুমানিক ৬১২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই। (রুশদী, ২০০৮ : ৩৬) তখন সবেমাত্র ইসলাম প্রচারিত হচ্ছে। (ইসলাম, ২০০৫ : ২২৫) তাঁর পিতা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশ্বস্ত সহচর ও সংগ্রামী বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), যিনি ছিলেন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান ও মক্কার সতেরো জন শিক্ষিত ব্যক্তির একজন এবং ইসলামের প্রথম খলিফা। আর হযরত আয়শা (রাঃ) এর মাতার নাম ছিলো ‘উম্মে রুমান বিনতে উমাইর’। (ইবনে হাজার, ১৪০৪ হিঃ : ৪৬২-৪৭০) সাহাবি হযরত আসমা (রাঃ) তাঁর বড় বোন ছিলেন। আর তাঁর ভাই ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিনতে আবু বকর।

হযরত আয়শা (রাঃ) ছোটবেলা হতে সর্ববিষয়ে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি খেলাধুলায় ভালো ছিলেন। তিনি দৌড় প্রতিযোগিতায় সবসময় প্রথম হতেন। কিন্তু পরাজিত প্রতিপক্ষকে সম্মান জানাতে ভুলতেন না। অনেক সময়ই খেলাশেষে পরাজিত খেলার সাথীকে প্রবোধ দেবার জন্য তাকেসহ মায়ের নিকটে এসে তিনি খাবার খেতেন যেন প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু মানসিক কষ্ট না পায়। তাঁর এ মানবিকতা ছিলো অসাধারণ! (আয-জাহাবি, ১৩৬৭ হিঃ : ৭১)

শিক্ষালাভ

পিতার তত্ত্বাবধানে তাদের গৃহের সামনে স্থাপিত পাঠশালায় তিনি অন্যান্যদের সাথে ইসলামি বিধি-বিধানসহ কুরআন শিক্ষালাভ করেন। এ পাঠশালায় অমুসলিমরাও শিক্ষালাভ করতো। এক উদার ও সার্বজনীন পরিবেশে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (সাত্তার, ২০০৪ : ৪১) প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী আয়শা (রাঃ) বাল্যকালে দোলনায় দোল খেতে খেতে কুরআনের অসংখ্য আয়াত মুখস্ত করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি পিতার মুখ হতে শুনে অসংখ্য কবিতার পঙ্ক্তিও মুখস্ত করতেন। পরিণত বয়সে তিনি মুসলিম নারীগণকে প্রশিক্ষিত করতে আল-কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদানে এগিয়ে আসেন। কেননা আরবি সাহিত্য ও ভাষা বিষয়েও তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। হযরত উরওয়া ইবনে

যুবাইর (রা:) বলেন, “আমি হালাল-হারাম জ্ঞান, কবিতা ও চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা:) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী অন্য কাউকে দেখিনি।” (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ১১৭ ; (Ibn Saad, 1995 : 277)

সমাজ উন্নয়নে হযরত আয়শা (রা:)

উদ্যমী হযরত আয়শা (রা:) সেই সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বে বর্বরতার স্থলে সভ্যতা, অজ্ঞতার স্থলে শিক্ষা ও সমাজে ন্যায়-নীতি চালু করতে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। তিনি পিতা-মাতার সংসারে অতি আদরে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। ইসলাম আগমনের পর সহসা এ আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ শুরু হলে তাঁরা পরিবারের সকলেই প্রতিহিংসার শিকার হন। তাঁর পিতাকে ধরে নিয়ে শত্রুরা রাস্তায় ফেলে রাখতো-এরূপ অত্যাচার হতে রক্ষা পেতে ছোট্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি পিতাকে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দেন, যাতে অন্যত্র গিয়ে দ্বীনি দায়িত্ব প্রতিপালন করতে পারেন। তাঁরা প্রথমে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা দিলে মক্কার এক বেদুইন সর্দার তাদেরকে ফিরিয়ে এনে আশ্রয় দেয়। তাই এ যাত্রায় তাঁরা দেশেই অবস্থান করার সুযোগ পান। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ৬১) অল্পবয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি সমাজের অন্যান্যদেরকে উদ্দীপ্ত করতে পারতো এমনই দূরদৃষ্টিজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন তিনি সেই ছোট্টবেলা হতেই।

বাস্তুভিটা পরিত্যাগের কষ্ট সহ্য

মানবতার কল্যাণে তাকে বাস্তুভিটা পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছিলো। মক্কায় ওতবা, আবু সুফিয়ান, যুবায়ের, আবু জেহেল, আবু লাহাব প্রমুখদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে নবাগত ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি মদিনা হতে স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক প্রেরিত গোলাম আবু রাফে এবং যায়দ ইবনে হারিসার সাথে মক্কার পথে রওয়ানা দেন। যায়দ ইবনে হারিসা সাথে দুই/তিনটি উট নিয়ে এসেছিলেন যাতে আরোহণ করে হযরত আয়শা (রা:), মা উম্মে রুমান, বড় বোন আসমা (রা:) ও হযরত সাওদা (রা:) মদিনার পথে রওয়ানা হন। দুর্গম, পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে বহু কষ্টে তাঁরা দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিজরতের এ ঘটনা ৬২৩ সালে সংঘটিত হয়। (আয জাহাবি, ১৩৬৭ হিঃ : ১৪১) কষ্টকর এ পথযাত্রার ধকল ও আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে মদিনায় পৌঁছে তিনি তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হন।

কুসংস্কার দূরীকরণ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে বিবাহবন্ধন

হযরত আয়শা (রাঃ)-এর পিতৃগৃহে যাতায়াতের সূত্রে আয়শা (রাঃ) বিবাহের পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে চিনতেন ও তাঁর উপর যে ওহী নাযিল হতো তা জানতেন। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ১০৫) এমনকি রাসূল (সাঃ) আয়শাকে স্বপ্নে এভাবে দেখেন যে, এক ব্যক্তি একটি বস্তু, এক টুকরো রেশমে জড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে বলছেন, এটি আপনার, তিনি খুলে দেখেন তার মধ্যে আয়শা (রাঃ)। (Ibn Saad, 1995 : 278) ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, “আয়শা (রাঃ) বলেন : জিবরাইল (আঃ) তাঁর একটি প্রতিকৃতি সবুজ রেশমের একটি টুকরোয় জড়িয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে নিয়ে এসে বলেন : ইনি হবেন দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।” (আত তিরমিযী, ১৯৯১ : হাদিস নং-৩৮৮০) বিবাহ বা আকদের তিন বছর পরে তিনি মদিনায় আসেন। এ সময়ে তিনি পিতৃগৃহেই থাকতেন। মদিনার অনুকূল পরিবেশে হযরত আয়শা (রাঃ) নিজের চিন্তাধারাকে বিকশিত করার পূর্ণ সুযোগ পান এবং সমাজের তীব্র অসংগতিগুলো বিদূরণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ ছিলো তেমনি একটি সমাজ সংস্কারের অনন্য দৃষ্টান্ত।

স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর দেনমোহরের অধিকার লাভ

ইসলামে একদিকে যেমন মানবতার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, অপরদিকে বাজারের পণ্যসামগ্রীর ন্যায় ব্যবহৃত নারীকে মুক্ত করে নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাহিলি যুগেও আরবে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহরানা প্রদানের নিয়ম ছিলো। তবে এ অর্থ কনে না পেয়ে পেত তার অভিভাবক। আবার স্বামীর অবস্থা বিবেচনা না করে মাত্রাতিরিক্ত মোহরানা নির্ধারণ করা হতো। এতে তার কষ্টের সীমা থাকতো না। রাসূল (সাঃ) এ বিবাহে নিজের সামর্থ্য ও কনের অবস্থা বিবেচনা করে পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর নির্ধারণ করেন এবং বিবাহের পরই তা পরিশোধ করে দেন। (বালাযুরী, ১৯৩৭ : ৩১৫) হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, “রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রীদের দেনমোহর সাধারণত পাঁচশত দিরহাম হতো।” (হাসান, ২০১২, হাদিস নং-৩৩৫৩) ঐতিহাসিকদের মতে, রাসূল (সাঃ) যে ঘরে হযরত আয়শা (রাঃ) কে নিয়ে আসেন, সেটির মূল্যমান ছিলো পাঁচশত দিরহামের সমান। এ ঘরটিই বিবাহের

দেনমোহর হিসেবে রাসূল (সা:) তাকে উপহার দিয়েছিলেন, যা নির্মাণে তাঁর সাত মাস সময় লেগেছিলো ।
(সৈয়দ, ১৯৯৪ : ৮৬)

মুখে ডাকা ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ

এ বিবাহের মাধ্যমে মুখে ডাকা ভাইয়ের মেয়েদেরকে যে বিবাহ করা যেতো না তা বাতিল হয় । তখনকার সময়ে আরবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ভাই ডেকে ফেললে তার মেয়েকে আর বিবাহ করতে পারতো না । মুখে ডাকা ভাইয়ের মেয়েও নিজের আপন ভাতিজী সমতুল্য জ্ঞান করতো তারা । এ কারণে হযরত খাওলা (রা:)-এর দেওয়া প্রস্তাবে হযরত আবু বকর (রা:) বলে উঠেন- এটা কি বৈধ হবে? আয়শা তো রাসূল (সা:)-এর ভাতিজী । পরে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এ কথা জানতে পেরে বলেন, আবু বকর যেহেতু ধর্মীয় ভাই নয় সেহেতু তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে বৈধ । এভাবে এ বিবাহের মাধ্যমে আরবের চিরাচরিত কুসংস্কারের বিলুপ্তি ঘটে । (বুখারি, ১৩৬৭ হিঃ : ১ম খণ্ড, ৪৪৩)

বিবাহের দিনক্ষণ নির্ধারণের কুসংস্কার দূরীকরণ

শাওয়াল মাসে বিয়ে দিলে কনের স্বামী মৃত্যুবরণ করে বলে একটি ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিলো । হযরত আয়শা (রা:) ও রাসূল (সা:) এর বিবাহ শাওয়াল মাসে সম্পন্ন হয় যা সমাজে এতদিনের প্রচলিত এ কুসংস্কার দূর করতে সহায়তা করে । হযরত আয়শা (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) শাওয়াল মাসে তাঁর পরিবারের মেয়েদের বিবাহ দেওয়া পছন্দ করতেন । এ হতেই ধারণা পাওয়া যায়, মুসলিম বিবাহ বছরের যে কোনো সুবিধামত সময়ে সম্পন্ন করা যায় । (মাবুদ, ৫ম খণ্ড, ২০০২ : ৬৩)

এ বিবাহ ছিলো নতুন এ সমাজে প্রথম কোনো কুমারী মুসলিম কন্যার বিবাহ যা পরিবারে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত নারী সমাজকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে । এ বিবাহের মাধ্যমে সমাজে এতদিন ধরে চালু অপরাপর অনিয়ন্ত্রিত বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ হয় । (গাজী, ১৯৯৫ : ২৬০)

সমাজে পতিতাবৃত্তি চালু ছিলো । একবার মারশাদ নামক জনৈক সাহাবী একজন পতিতাকে বিবাহ করতে চাইলে তৎক্ষণাৎ কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় । আল্লাহ বলেন, “এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী

পুরুষ অথবা মুশরিকই বিবাহ করে। (সূরা নূর, আয়াত নং ৩) তাই লুকোচুরি ও প্রকাশ্যভাবে কোনো ছেলে-মেয়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এ আদর্শে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলামে বিবাহের মাধ্যমে তাদের একত্রে বসবাস করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। উভয়ের পারস্পরিক অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যত চলার পথ মসৃণ রাখার জন্য বিবাহ রীতি চালু করা হয়। এ অবস্থায় হযরত আয়শা (রা:) ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর বিবাহ, সমাজে বৈধ বিবাহের নিয়ম চালু করে। উভয় পক্ষ হতে দু'জন স্বাক্ষী ও স্বামী-স্ত্রীর ইজাব কবুলের মাধ্যমে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। মুসলিম সমাজে নিয়মিত বিবাহ ব্যতীত আর সকল বিবাহ সমাজে অবৈধ ঘোষিত হয়। সমাজে নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। (গাজী, ১৯৯৫ : ২৬০)

এ বিবাহ অনুষ্ঠানে মাত্র এক পেয়ালা দুধ দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়েছিলো। (মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৬৭ : হাদিস নং-৪৩৮) মদিনায় হিজরত করায় তাঁর পিতা তখন ছিলেন সহায়-সম্বলহীন। তবুও অন্যের নিকট হতে অর্থ ধার নিয়ে জাঁকজমকভাবে রুসুমতের অনুষ্ঠান তিনি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সুতরাং এ বিবাহের মাধ্যমে বোঝা যায় সাধারণভাবেও বিবাহের সামাজিকতা পালন করা যায়। তবে জাঁকজমক করা যাবে। অথচ তখন এবং এখনও এক বিয়ের একাধিক আয়োজন, প্রতিটি অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা, আনন্দ ফুঁতির বাহুল্য, অতিরিক্ত ফটোগ্রাফি, আলোকসজ্জা করা হয় যা আয়োজনকারীদেরকে নিঃস্ব করে ফেলে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, “অপচয় করো না, অপচয়কারী শয়তানের ভাই।” (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত নং ২৭)

এ বিবাহের আয়োজনে ছোট শিশুদের নৃত্য-গীত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে সকলে সংশ্লিষ্ট পাত্র-পাত্রীর বিবাহের সংবাদ অবগত হতে পারে। রাসূল (সা:) বলেন, “ বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার করো এবং সাধারণত এর অনুষ্ঠান মসজিদে সম্পন্ন করো।” (রহিম, ২০০৮ : ১৪২)

হযরত আয়শা (রা:) এ সম্পর্কে বলেন, “আমরা (হিজরত করে) মদিনায় আসলাম। তারপর আমি এক মাস পর্যন্ত জুরে আক্রান্ত থাকলাম। আমার চুল আমার কান পর্যন্ত লম্বা হলো। আমি একদিন দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। আমার খেলার বান্ধবীরা আমার সাথে ছিলো। এমন সময় (আমার মা) উম্মে রুমান এসে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে ধরলেন এবং দরজার কাছে থামালেন। আমি

তখন হাঁপাচ্ছিলাম। আমি জানতাম না তিনি আমাকে কেন ডেকেছিলেন। অবশেষে আমার হাঁপানো বন্ধ হলে তিনি আমাকে নিয়ে একটি ঘরে গেলেন। সেখানে কিছুসংখ্যক আনসার মহিলা ছিলেন। তারা ‘অতি উত্তম কল্যাণ ও বরকত হোক’ বলে আমাকে দু’আ করলেন। আমার মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমার মাথা ধোয়ালেন এবং পরিপাটি করে সাজালেন। আমি ভীত-শংকিতও হইনি। পরে দুপুরে তারা আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকটে সোপর্দ করলেন। আমার নয় বছর বয়সের সময় আমি রাসূল (সাঃ) এর সাথে বাসর যাপন করি। (হাসান, ২০০২ : হাদিস নং-৩৩৪৩)। হাদিসটির রেওয়ায়েত নিয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন।

দাম্পত্য জীবনের আদর্শ

হযরত আয়শা (রাঃ) একজন আদর্শ স্ত্রী ছিলেন। মদিনার বনু নাজ্জার মহল্লায় অবস্থিত মসজিদে নববীর সাথে অতি সাধারণ ৬/৭ হাত প্রশস্ত একটি কাঁচাঘর ছিলো তাঁর আবাসস্থল। এ ঘরেই তিনি সংসার করে গেছেন। জীবনসঙ্গীর মানসিক প্রশান্তি আনতে তিনি সদা সচেষ্টি থাকতেন। আটা পেষা, রান্না করা, ঘর গোছানো, পানি টানা, কুরবানির পশুর গলার রশি পাকানো, কখনো স্বামীর মাথার চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া, কাপড় ধোয়া, মিসওয়াক গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজ তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। (রহমান, ১৯৭৭ : ২৩) তবে রাসূল (সাঃ) স্ত্রী আয়শা (রাঃ)-এর চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি ছিলেন স্বামীর প্রশান্তি ও যাবতীয় বিপদ-আপদে সান্ত্বনার উৎস। অথচ ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে নারীদেরকে গৃহস্থালির ন্যায় সাধারণ সামগ্রী ভাবা হতো। সংসারে তাদের কোনো পৃথক সত্তা ছিলো না। আল্লাহর ভাষায়, “তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আর রুম, আয়াত নং ২১) এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আবারও বলা হয়েছে, “নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা দায়িত্ব আছে।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২২৮) রাসূল (সাঃ) বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।” (বুখারি, ১৩৬৭ হিঃ, হাদিস নং-৩৪৭৮ ; রহীম, ২০০৮ : ১৭৩) বিবাহের তিন বছর পর, প্রায় দশ বছর বয়সে মদিনায় গিয়ে তিনি স্বামীর উৎসাহে পুনরায় জ্ঞান অর্জন শুরু করেন। তাই সংসারে স্ত্রীর অধিকার ও

মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই স্বামীর সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রয়োজন। রাসূল (সা:) ও আয়শা (রা:)-এর মধ্যে বয়সের ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের কাজের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও ভালোবাসা ছিলো অসাধারণ যা বয়সের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছিলো। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ৫৯৫) হযরত আয়শা (রা:) নিঃসন্তান ছিলেন। বোনের পুত্রের নামে তিনি উম্মে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। (ইসলামি বিশ্বকোষ, ১৯৮৬ : ৭)

আয়শা (রা:)-এর ঘরে রাসূল (সা:) কে দাফন করা হয়। এ জায়গাটিই বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর পবিত্র রওযা মোবারক। এ হতেই বোঝা যায় রাসূল (সা:)-এর উপর কতখানি প্রভাব ছিলো তাঁর।

স্ত্রীর পক্ষ হতে তালাক বা বিবাহ ছিন্ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা

রাসূল (সা:)-এর একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তাদের সাথে হযরত আয়শা (রা:)-এর উত্তম সম্পর্ক ছিল।^{১১} তাদের অনেকেই পিতার গৃহে থাকতে স্বচ্ছল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল কামনায় তারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। অতি দরিদ্রতার কারণে তাঁরা কখনও কখনও হতোদ্যম হয়ে পড়তেন। এক পর্যায়ে তাদের অর্থ দাবিকে রাসূল (সা:) নাকচ করে দিয়ে বলেন, প্রয়োজন হলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। আর সকলের ছোট আয়শা (রা:) কে পিতামাতার সাথে পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেন। এ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীরা হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর আজ্ঞাধীন ছিলেন না। হযরত আয়শা (রা:) এ পরিস্থিতিতে সকলের আগে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে দেন যে, তিনি রাসূল (সা:)-এর সাথেই থাকবেন। অন্যরাও হযরত আয়শা (রা:)-এর ন্যায় একই জবাব দিলেন। এ ঘটনা ইতিহাসে ইলা বা তাখইর নামে

১১. প্রাক-ইসলামী যুগে পুরুষেরা সামর্থ্য ও সুযোগ পেলেই বহু বিবাহ করতো, এমনকি ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ বা স্ত্রী ত্যাগ করতো। এতে করে নারীরা অশেষ ভোগান্তির শিকার হতো। একক বিবাহ ইসলামে উত্তম বলা হয়েছে। (নিসা, ৩) তবে যে কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহের আবশ্যিকতা দেখা দিতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) নিজের জীবনে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেটি দেখিয়ে গেছেন। এ জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে একটি প্রত্যাদেশও প্রাপ্ত হন, যাতে তাকে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো। সেটি হল : যে কোনো বিশ্বাসী মহিলা তাঁর সাথে বিবাহ করতে সম্মত হলে তাকে বিবাহ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু এটা কেবল রাসূল (সা:) জন্যে অন্য কোনো মুমিনের জন্য এটা বৈধ নয়। আর তখন ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে যুদ্ধবন্দী নারীদের নিরাপত্তা, সম্মান প্রদানের জন্য পুরুষের একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো। তারা তখন স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করতো। (নিসা, ২৫) অথচ বর্তমানের সমাজ, সভ্যতায় বিবাহিত ছেলেমেয়েরা কখনও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিবাহ ছিন্ন বা পুরুষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি পায় না। স্বাভাবিকভাবেই তারা বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। মানুষের এই মানবিক চাহিদার কারণে ইসলামে শর্ত সাপেক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করলেও তা কঠোর শর্তাধীন, যেন মানুষ একে কেন্দ্র করে আবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে না পড়ে।

খ্যাত। তাখইর নামের অর্থ হলো ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দান করা। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন : “কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা আপোস নিষ্পত্তি করতে চাইলে কোনো দোষ নেই এবং আপোস নিষ্পত্তিই শ্রেয়।”(সূরা নিসা, আয়াত নং ১২৮) ইলা ঘটনা যখন হয়েছিল, সে সময়ে রাসূল (সা:)-এর চারজন মতান্তরে নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তখন থেকেই সুস্পষ্টভাবে মুসলিম পারিবারিক আইনে স্ত্রীর পক্ষ হতে তালাক বা বিচ্ছেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বিশ্বে বিবাহ প্রথায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত আয়শা (রা:) সহ রাসূল (সা:)-এর অন্য স্ত্রীরা সর্বপ্রথম অবদান রেখে যান। অথচ এর পূর্বে স্ত্রীরা শত নির্যাতিত হলেও স্বামী হতে তালাক বা বিবাহ ছিন্ন করার অধিকার পেতো না।

প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সুন্দরভাবে চলাফেরার জন্য মানুষকে একে অন্যের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে হয়। মানুষের এ জাতীয় নির্ভরশীলতার জন্যই সমাজ জীবনে একজন মানুষ অন্য মানুষের নিকটে বসতি স্থাপন করে। এ বিষয়ে দায়িত্বশীল হয় মেয়েরাই। হযরত আয়শা (রা:) প্রতিবেশীর অধিকার বা হক সম্পর্কে সোচ্চার ছিলেন। প্রতিবেশীর মধ্যে কার সাথে আগে মিশতে হবে এ বিষয়ে হযরত আয়শা (রা:) রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যে প্রতিবেশীর দরজা তোমার গৃহের সবচেয়ে কাছে, তাকেই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। (আহমদ, ১৯৬৭, ১৭৫ নং হাদিস) হযরত আয়শা (রা:) আরও বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়াভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন সেটির সাত স্তবক জমি তার কাঁধে বুলিয়ে দেয়া হবে।” (বুখারি, ১৩৬৭ হিঃ : ২৬৫ নং হাদিস) হযরত আয়শা (রা:) হতে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলতেন, “সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যার সাথে মেলামেশা করতে অন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।”(মাবুদ, ২০১৪ : ৭১ ; জামে তিরমীযি) হযরত আয়শা (রা:) প্রতিবেশীর বাসায় যেতেন। একদিন এক গৃহে গিয়ে দেখেন চাদর ব্যতীতই তারা নামায পড়ছে। তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, ভবিষ্যতে আর কোন মেয়ে যেন চাদর ছাড়া নামায না পড়ে।” (আহমদ, ১৯৬৭ : ৭৯৬) হযরত আয়শা (রা:) লাল, হলুদ বর্ণের পোশাক ছাড়াও রেশমী চাদর ব্যবহার করতেন। (Ibn Saad, 995 : 280)

মাসয়ালা প্রণয়ন ও তা সমাজে প্রচার

রাসূল (সা:) যখন ইস্তিকাল করেন তখন হযরত আয়শা (রা:)-এর বয়স ছিলো মাত্র উনিশ বছর। তিনি স্বামীর সাথে নয় বছর (৬২৩-৬৩২ খ্রি:) সংসার করেন। এর পরে তিনি আর বিবাহ করেননি। জীবনের অবশিষ্ট চুয়াল্লিশ বছর তিনি নতুন সমাজ গঠনে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান। তাঁর স্বামীর অপর স্ত্রী হযরত সাওদা (রা:)-এর সহযোগিতায় তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও দক্ষ হয়ে উঠেন। সমগ্র কুরআন তাঁর মুখস্ত ছিলো। (সূয়ুতী, ১৯৫১ : ৭৩) দাস আর ইউনুসকে দিয়ে তিনি সমগ্র কুরআন লিখে নেন। (মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৬৭ : ৭৩) পিতা ও স্বামী ব্যতীত হযরত উমর (রা:) (মৃত ২৪ হি./ ৫৪৪ খ্রি.), হযরত ফাতিমা (রা:), জুদামা বিনতে ওয়াহাব (রা:), হামযা ইবনে আমর আল আসকালানি (রা:) প্রমুখ তাঁর শিক্ষক ছিলেন। অধিকাংশ হাদিস রাসূল (সা:) এর নিকট হতে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে, কখনও কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তবে পরস্পর বিরোধী হাদিস হলে তিনি মূল প্রেক্ষাপট বর্ণনাসাপেক্ষে তার সমাধান দিতেন। (আয জাহাবি, ১৯৭০ : ১৮২-১৮৩) রাসূল (সা:) জীবিত অবস্থায় নিজেই যে কোনো সমস্যার সমাধান করতেন। তবে স্ত্রী হিসেবে তিনি সকল সংগ্রাম, বিপদে-আপদে হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে শক্তি ও সাহস সঞ্চর করেছেন।

প্রাক-ইসলামি যুগে নারী প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় ছিলো সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট। ইসলাম আবির্ভাবের পর পুরুষের ন্যায় সমানাধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় বহু নারী সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার সুযোগ পান। এ সময়ে নারীরা আবেদন করলে হযরত মুহাম্মদ (সা:) মসজিদে নববিতে সপ্তাহের একদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নারীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন। এ আসরে আয়শা (রা:)ও উপস্থিত থাকতেন। মসজিদ থেকে রাসূল (সা:) নতুন সমাজ বিনির্মাণের কাজ তদারকি করতেন এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিতেন। হযরত আয়শা (রা:) এর ঘরের দরজা মসজিদুননববিমুখী হওয়ায় তিনি স্বীয় ঘর হতেই মসজিদে প্রদানকৃত রাসূল (সা:)-এর বক্তৃতা শুনতে পেতেন। (Ibn Saad, 995 : 284) বিখ্যাত ইমাম হযরত ইমাম যুহরি বলেন, “হযরত আয়শা (রা:) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম।” (আহমদ, ১৯৬৭ :

৪৫০) তাঁর ইন্তেকালের পর এ দায়িত্ব ফকিহদের^{১২} উপরে বর্তায়। বিশ্বব্যাপী তখন সাহাবিরা ছড়িয়ে পড়েন নিপীড়িত মানবতার উন্নয়নে। মদিনায় থেকে যাওয়া ফকিহদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত আয়শা (রাঃ) এ চারজনই ছিলেন। মাসয়ালা-মাসায়েল প্রণয়নের মাধ্যমে এ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশে হযরত আয়শা (রাঃ)-এর অবদান ছিলো অপরিসীম। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে মক্কা, তায়েফ, সিরিয়া, বসরা, কুফা ইত্যাদি এলাকার জনগণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গীদের অনেকে গমন করেন। হযরত আয়শা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই প্রসিদ্ধ চারজন ফিকহবিদ মদিনায় থেকে যান।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ভালো দখল থাকায় হযরত আয়শা (রাঃ) কুরআন-হাদিসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মানবজীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মাসয়ালা বা নিয়ম কানুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখে গেছেন। মদিনায় বসবাসরত প্রসিদ্ধ ফকিহ হযরত আয়শা (রাঃ)-এর নিকটে পাড়া প্রতিবেশীরা ছাড়াও বাইরের দেশ মক্কা, ইয়েমেন, বাহরাইন, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি এলাকা হতে মানুষ মদিনায় তাঁর গৃহে আসতেন নতুন আদর্শ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর জানতে। তাঁর গৃহই পরবর্তীতে বড় শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। প্রখ্যাত সাহাবি আবু মুসা আল আশ'আরি (রাঃ) যথার্থই বলেন যে, “আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবিগণ কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে আয়শা (রাঃ)-এর নিকট সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সঠিক সমাধান খুঁজে পেতাম।” (আত তিরমিযি, ১৪২৪ হিঃ : ২২৭)। তিনি মানবজীবনে উদ্ভূত বহু সমস্যার যৌক্তিক সমাধান পেশ করে গেছেন।

^{১২}. ইসলামের প্রধান দু'টি মূলনীতি আল-কুরআন ও আল-হাদিসের উপর ভিত্তি করে জীবনের সার্বিক বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকেই ফিকহ বলে। (আব্দুল্লাহ, ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ খ্রি : ৪-৫) যারা এ কাজটি সম্পন্ন করেন তাদেরকে ফকিহ বলে।

তালাক পরিহার বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপন সম্পর্কীয় বিধি স্পষ্টকরণ

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারী-পুরুষের বিবাহিত জীবন এক ধরনের খামখেয়ালীপনার উপর নির্ভরশীল ছিলো। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে পুরুষরা মর্জিমাফিক স্ত্রী গ্রহণ বা ত্যাগ করে নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। এখনও অনেক ক্ষেত্রে তা চলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কারণে বনিবনা না হলে সর্বশেষ প্রতিকার হিসেবে তাদের মধ্যে ইসলামে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান রয়েছে। তালাক উচ্চারণ করার দিন হতে স্ত্রী স্বামীর গৃহে তিন মাস থাকতে পারবে। এটিকে বলা হচ্ছে তার ইদ্দত বা অবস্থানকালীন তিন ‘কুর’ সময়। এর পশ্চাতে ছিল কুরআনের একটি আয়াত। তা হলো, “তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন ‘কুর’ পর্যন্ত।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২২৮) কিন্তু ‘কুর’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ কারও নিকটে পরিষ্কার হচ্ছিল না। হযরত আয়শা (রা:)-এর এক ভাতিজীকে তাঁর স্বামী তালাক দিয়ে দিলে সে হযরত আয়শা (রা:)-এর উপদেশমত তিনটি হায়েয (মাসিকের বিশেষ দিনগুলো) অতিবাহিত হওয়ার পর নতুন মাস শুরু হলে তাকে তিনি স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু কেউ কেউ তাঁর এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। এর উত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে। ‘তিন কুর’-তা ঠিক আছে। তবে তোমরা কি জান কুর-এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো তুহুর বা পবিত্রতা অর্জন। (ইমাম মালিক, ১৯৭৭ : ২১০)। তিনি বাইন বা একবারেই তিন তালাক দেবার প্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হবার পরেও পুনরায় যেন তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে সে সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে তিনি একদিকে যেমন পরিষ্কার ধারণা দিয়ে গেছেন ও এ সময়কালে নারী স্বামীর গৃহেই অবস্থান করবে তাও তিনি আমাদেরকে জ্ঞাত করেছেন। তবে গৃহ বসবাসের উপযোগী না হলে ভিন্ন কথা।

মুত’আ বিবাহ সম্পর্কে তার অভিমত

ইসলাম পূর্ব-যুগে মুত’আ বা অস্থায়ী বিবাহ চালু ছিলো। কোনো কোনো সমাজে নারী-পুরুষ এখনও মুত’আ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। নির্দিষ্ট সময় পরে সে সম্পর্ক আবার ভেঙে ফেলে। এ সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা:) অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। মুত’আ বিবাহ হিজরি ৭ম সাল পর্যন্ত চালু ছিল। (রুশদী, ২০০৮ : ১৮২) খায়বার বিজিত হবার পরে এ বিবাহ বৈধ নয় বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর পরেও বেশ কয়েকজন সাহাবী এ ধরনের বিবাহের পক্ষে মতামত প্রদান করতেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস

(রা:)। কিন্তু সাহাবীদের অধিকাংশ এ জাতীয় বিবাহ অবৈধ বলে মনে করতেন। একদিন এ বিষয়ে সমাধানে হযরত আয়শা (রা:) এর এক ছাত্র তাঁর কাছে জানতে চাইলে উত্তরে হযরত আয়শা (রা:) বলেন, এর উত্তর তো স্বয়ং কুরআনেই বিদ্যমান-“এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।”(সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত নং ৫-৬) যদিও এখন ক্রীতদাসী প্রথা নেই, কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থা যে ফিরে আসবে না তা তো বলা যায় না। এ আয়াত উল্লেখ দ্বারা তিনি এ ধরনের অস্থায়ী বিবাহ হতে মানুষকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

নর-নারীর পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যবিধি

হযরত আয়শা (রা:) মানবতার মুক্তিদূত রাসূল (সা:) এর স্ত্রী হওয়ার সুবাদে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের একান্ত গোপন মাসআলাগুলো প্রকাশের পাশাপাশি যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের শিকার অবহেলিত নারীকে মুক্ত করতে এবং সেসকল কুসংস্কারগুলো দূর করতে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নারীদের হয়ে, নেফাস ও গোপন একান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কিত মানুষের অজ্ঞতাও দূর হয়। এগুলো আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির সাথেও মিলে যায়। যেমন নারীর ঋতুমতি অবস্থায় স্বামীসহ পরিবারের অন্য সকলে তার সাথে মেলা-মেশা, উঠা-বসা খাওয়া বন্ধ করে দিত। নারী যতই স্নেহ, ভালোবাসা, আদর-যত্ন দিয়ে সংসারকে পূর্ণ করে তুলুক না কেন সামাজিক রীতি-নীতিতে পরিবারগুলো ছিল অতিমাত্রায় পুরুষ নির্ভর। এজন্য সংসারে নারী ছিলো অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পাত্রী। তাঁর ঋতুমতি অবস্থাতেও তাকে ধিক্কার জানাতে সমাজ দ্বিধা করতো না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা অন্যত্র বলেন, “হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত নং ১১) এ আয়াতের মাধ্যমে সে সময়ের সামাজিক অস্থিরতা সম্পর্কে জানা যায়। যুগ যুগ ধরে সমাজের অন্যতম অংশ নারীজাতিকে নানান কুৎসিত মন্তব্যের মাধ্যমে তাকে নোংরামির জড় ও আগাগোড়া নরক ইত্যাদি ভাবা হতো, এই আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে তা অপনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

সর্বপ্রথম হযরত আয়শা (রা:) এ অবস্থার প্রতিকারে এগিয়ে আসেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “হে নবি! লোকেরা আপনাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলেদিন, তা অপরিত্র মাত্র। ময়লা। সুতরাং তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীদের সহবাস থেকে দূরে থাকো। তারা পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের (সাথে সহবাস করো না) নিকটে যেও না। যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে তাদের কাছে যাও। আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২২২) সমাজে প্রচলিত এ ধরনের কুসংস্কার দূর করতে হযরত আয়শা (রা:)-এর সাথে মহানবি (সা:) কর্তৃক একান্ত গোপনীয় আচরণগুলো তিনি নির্দিষ্টায় সকলকে জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমি পানি পান করে রেখে দিলে তিনি পানির পাত্রের একই স্থানে মুখ দিয়ে ঐ পানি পান করতেন। তিনি আরও বলেন, “আমার ঋতুমতি অবস্থায় আমি হাড় চুষে দিলে তিনিও একই স্থানে মুখ দিয়ে চুষতেন।” তাঁর এ অবস্থায় রাসূল (সা:) তাকে চুমুও দিতেন। এমনকি তাঁর কোলে মাথা রেখে শুতেন। (আহমদ ও মুহাদ্দেসীন, ২০০৩ : ১৮)

এমনকি হজ্জের সময় কেউ যদি ঋতুমতি হন তাহলে তার করণীয় সম্পর্কেও হযরত আয়শা (রা:) স্পষ্ট করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় তাঁর নারী প্রকৃতি শুরু হয়ে যাওয়ায় তিনি বুঝতে পারছিলেন না তিনি কী করবেন। রাসূল (সা:) তা জেনে বললেন : “তোমার নারী প্রকৃতি তো তোমার হাতে নয়।” (আত-তিরমিযী, ১৯৯৭ : ১২৮) এ সময়ে তিনি তাকে তাওয়াফ ব্যতীত আর সব কিছু করার অনুমতি প্রদান করেন। আর সেভাবেই মুসলিম নারীরা হজ্জ পালন করে আসছেন।

অথচ এখনও নারীরা এ অবস্থায় সংকুচিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি ভারত ও নেপালের এক গ্রামে গোয়ালঘরে জোর করে রক্ষিত ঋতুমতি অবস্থা চলাকালীন এক মেয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যুবরণ করে। এরকম ঘটনা সেখানে প্রায়ই ঘটছে। বিংশ শতকের নারীরা এখনও এই কুপমণ্ডকতার জালে আবদ্ধ হয়ে অসহায় অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে। আবার অফিসে নারীর কর্মপরিবেশকে উইমেন ফ্রেন্ডলি করতে অতি সম্প্রতি ভারতের মুম্বাইয়ের একটি কোম্পানীতে কর্মরত নারীরা ঋতুর প্রথম দিন ছুটি পাবে মর্মে একটি অফিস আদেশ জারী করেছে। (ট্রিবিউন, ২৪/০৭/১৭)। তাই একদিকে আমরা যেমন অগ্রসর হচ্ছি, অন্যদিকে পশ্চাত্পদতার দিকে ধাবিত হচ্ছি সাংঘাতিকভাবে।

দাম্পত্য জীবনের আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় হযরত আয়শা (রা:)-এর হাদীসে স্থানলাভ করেছে যার জন্য তাঁর নিকটে আমরা বহুলাংশে ঋণী। হযরত আয়শা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো পুরুষ যদি (ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে) বীর্যের আদ্রতা দেখতে পায় অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ে না। সে কী করবে? তিনি বললেন, সে গোসল করবে। আবার কোনো পুরুষের স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে যদি মনে হয় অথচ সে বীর্যের আদ্রতা দেখতে না পায় তখন সে কী করবে? তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরয নয়। হযরত উম্মে সালমা (রা:) জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো স্ত্রী এরূপ দেখলে তার উপরও কি গোসল ফরয হবে? উত্তরে মুহাম্মদ (সা:) বলেন, হ্যাঁ মহিলারাও তো পুরুষের ন্যায়? (আত-তিরমিযী, ১৯৯৭ : হাদিস নং ১১৭)

এ সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন, যখন পুরুষের খতনা পরিমাণ অংশ (গুণ্ডাঙ্গ) স্ত্রীর গোপনাঙ্গে প্রবেশ করবে তখন উভয়ের উপরই গোসল ফরয হয়ে যাবে। হযরত আয়শা (রা:) বলেন, আমি ও রাসূল (সা:) এরূপ করেছি। অতঃপর আমরা উভয়ে গোসল করেছি। (আত-তিরমিযী ১৯৯৬, হাদিস নং-২০১৬)

হযরত আয়শা হতে আরও বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন, আমি দুঃখদায়িনী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে, পারস্য ও রোমের (এশিয়া মাইনর) লোকেরা এটা করে থাকে। (দুঃখপোষ্য শিশু থাকাকালীন সময়ে সঙ্গম করে) অথচ তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে না। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সঙ্গমে শিশুর কোনো ক্ষতি হয় না। (আত-তিরমিযী, ১৯৯৭ : হাদিস নং-২০২৬)

হযরত আয়শা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা:) স্ত্রী সহবাসের পর ঘুমাতে চাইলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং নামাযের ওয়ুর মতোই ওয়ু করতেন (অতঃপর ঘুমাতেন)। (বুখারি, ১ম খণ্ড, হাদিস নং-১১৫)

হযরত আয়শা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত মুহাম্মদ (সা:) আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে মাদুরটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বললেন, তোমার ঋতুশ্রাব তো তোমার হাতে নয়। (আত তিরমিযী, ১৪২৪ হিঃ : হাদিস নং-১২৯) হযরত আয়শা (রা:) আবারও বলেন, আমার ঋতুশ্রাব অবস্থায় আমি ও রাসূল (সা:) একই পোশাকে রাতযাপন করতাম। যদি তার সাথে আমার ঋতুশ্রাবের কিছু লাগতো তাহলে শরীরের সে স্থানটি ধুয়ে নিতেন। এর বেশি কিছু করতেন না।

অতঃপর নামায আদায় করতেন। (সুনান আবু দাউদ, ১১ শ খণ্ড, পৃ-৪১) মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার এতো বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, ঋতুমতী অবস্থায় পর্যন্ত সে ইচ্ছা করলে মসজিদে প্রবেশ, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। মসজিদ হতে সম্প্রসারিত কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের দাবি ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তুরস্কের ধর্মীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বোর্ড এই ঐতিহাসিক ফতোয়া প্রদান করেছিল। (দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মে ২০১২)

হযরত আয়শা (রা:) হতে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, ঋতুস্রাব অবস্থায় আমি রাসূল (সা:) কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তার স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করেন। অতঃপর (ফরয গোসল সেরে) তিনি পবিত্র হয়ে যান। (বুখারি, ১ম খণ্ড, পৃ- ৪১)

এভাবে তিনি শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবনের বাস্তব উদাহরণ টেনে মানবতার অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। আজ হতে সেই চৌদ্দশ'ত বছর পূর্বে বিশ্বে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও গোঁড়ামী, কুসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে যেভাবে স্বাস্থ্যগত জ্ঞানদান করে গেছেন তা আমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত ও অবাক করে! মানব প্রগতিশীলতার ইতিহাসে এ এক অমূল্য সম্পদ।

তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা

তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযথা রাবি, যিনি অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি। যার ১৭৪টি হাদিস ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে এবং এককভাবে ইমাম বুখারী ৫৪টি এবং ইমাম মুসলিম ৬৯টি হাদিস তাদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সিহাহসিত্তার অন্যান্য গ্রন্থেও তাঁর বর্ণিত অনেক হাদিস স্থান পেয়েছে। তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন। যাদের বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হাজারের উপরে তাদেরকে মুকসিরীন বলা হয়। তিনি সবচেয়ে অধিক সংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারী সাতজন সাহাবির মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিলেন। (নাদভী, ১৯৮০ : ১৮৮) তাঁর বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে কিছু হাদিস ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হযরত আয়শা (রা:) বলে গেছেন। রাসূল (সা:) হতে বর্ণিত: “মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রতিটি পানীয় দ্রব্য হারাম।” (মুসলিম, ২০১২ : ৭২৮)।

আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা

সমাজসেবা করতে গিয়ে তিনি আজীবন নানান ভাবে বিরোধী দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলো তার নামে মিথ্যাচার বা গুজব রটানো। এরকম একটি ঘটনা ছিলো তাঁর সতীত্ব নিয়ে অপবাদ আরোপ করা। তাকে হয় ও সমাজে অগ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এমনটি করা হয়েছিলো। ঘটনাটি ছিলো : হযরত মুহাম্মদ (সা:) আনুমানিক ৬ষ্ঠ হিজরিতে ‘বানু মুসতালিক’ বা ‘আল মুরায়সি’ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে যাত্রা শুরু করলেন। (ইবনে কাসীর, ২০০৭ : ৪৭) হযরত মুহাম্মদ (সা:) জীবনে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন দূরে সফরে যেতেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম উঠত তিনি তার সফরসঙ্গী হতেন। নিয়মমত এবারে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত স্ত্রী হযরত আয়শা (রা:) কে তিনি সাথে করে নিয়ে যান। যুদ্ধশেষে ফেরার পথে যাত্রাবিরতির একটা জায়গায় হযরত আয়শা (রা:) প্রয়োজন সারার জন্য উট হতে নেমে বাইরে যান। তখন খেয়াল করলেন যে, তার গলার হার হারিয়ে গেছে। তিনি হার খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেলেন। তিনি উটের হাওদার মধ্যেই আছেন এই ভেবে লোকেরা উটের পিঠে হাওদা উঠিয়ে দেয়। ঐ সময়ে তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একজন হালকা পাতলা তরুণী এবং যুদ্ধের সময় খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মের কারণে তাঁর আরো স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিলো বিধায় লোকেরা হাওদা উঠানোর সময় তিনি যে নেই তা বুঝতেই পারেননি।(Ibn Saad, 995 : 290)

তিনি হার খুঁজে পেয়ে ফিরে এসে দেখেন সবাই চলে গেছে। অনন্যপায় হয়ে ওখানেই চাদর গায়ে দিয়ে অবস্থান করতে থাকেন যাতে কাফেলার কেউ কোনো কিছু ওখানে পড়ে আছে কিনা দেখতে এসে তাকে খুঁজে পায়। কাফেলার নিয়ম অনুযায়ী পরের দিন বনু সালাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল যুদ্ধাভিযানে কোনো জিনিস ফেলে গেলেন কিনা তা অনুসন্ধানে এসে হযরত আয়শা (রা:) কে বসে থাকতে দেখেন। তিনি হযরত আয়শা (রা:) কে দেখে এগিয়ে যান এবং অবাক হন। সাথে সাথে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে থাকেন। আয়শা (রা:) কে তিনি আগে থেকে চিনতেন। আয়শা (রা:) তাঁর আওয়াজ শুনে জেগে ওঠেন এবং চাদর টেনে বসেন। সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল তাকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজে লাগাম টেনে চলেন। প্রায় দুপুরের সময় তারা মূল কাফেলাকে

ধরে ফেলেন। তখন মূল কাফেলা মহানবী (সা:) সহ বিশ্রামের জন্য একটি স্থানে থেমেছিলো। হযরত আয়শা (রা:) যে পিছনে পড়ে ছিলেন এ বিষয়টি তখনও কাফেলার কেউ জানতো না। প্রায় দুপুরের দিকে হযরত আয়শা (রা:) মূল কাফেলার সাথে মিলিত হন। (Ibn Saad, 1995 : 292)

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি ‘আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজে একজন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রটিয়ে দেয় যে, ‘আয়শার সতীত্ব আর বহাল নেই।’ হযরত সাফওয়ানের সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে ‘হাসান ইবনে সাবিত’, ‘মিসবাহ ইবনে উমামাহ’ এবং ‘হামনা বিনতে জাহাশ’ প্রমুখও এ রটনা ছড়ানোর কাজে লিপ্ত হন।

হাসান ইবনে সাবিতের ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে কোনো লক্ষ্য ছিলো না। তিনি কেবলমাত্র সাফওয়ান (রা:)-এর দুর্গাম শুনে পুলকিত হতে চাইছিলেন। আর মক্কার আসাদ গোত্রের জাহাশ ইবনে রিয়াব এর কন্যা হামনা বিনতে জাহাশও এ অপপ্রচারে যোগদান করেন। (Ibn Ishhaq’s, 1981 : 116) তার আপন বোন যয়নব বিনতে জাহাশ রাসূল (সা:)-এর স্ত্রী হওয়ায় তিনি ভাবলেন আয়শাকে (রা:) খাটো করতে পারলে রাসূলের (সা:) নিকটে যয়নবের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

হযরত আয়শা (রা:) এ সম্পর্কে বলেন, তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘ একমাস ধরে অসুস্থ ছিলেন। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে জনগণের মধ্যে কানাঘুসা চলতে থাকলো। প্রথমে তিনি এ সবার কিছুই জানতে পারলেন না। তবে তার সন্দেহ হচ্ছিল যে, পূর্বে তার অসুস্থতার সময়ে রাসূল (সা:) যেভাবে তার দেখাশুনা করতেন এবার সেভাবে তা করছেন না। শুধু ‘কেমন আছ’? এটা জিজ্ঞাসা করেই তিনি চলে যাচ্ছেন। এ কারণে হযরত আয়শা (রা:)-এর মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠলো। অবশেষে তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে মায়ের কাছে চলে গেলেন যাতে তার মা তাকে ভালোভাবে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন। (Ibn Saad, 995 : 295) মায়ের গৃহে থাকা অবস্থায় তিনি একদিন রাতের বেলা বাইরে বের হলেন। সে সময়ে সাধারণ আরববাসীরা প্রয়োজন সারার জন্য অভ্যাসমত গৃহের বাইরে মাঠে বা ঝোপ-ঝাড়ুে চলে যেত। ঐদিন উম্মে মিসতাহ নামক এক মহিলা তার সাথে ছিলেন। কাজ শেষ করে ফেরার পথে ‘উম্মে মিসতাহ’ পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গেলে বলে উঠল, মিসতাহ ধ্বংস হোক। এ কথা শুনে হযরত আয়শা (রা:) বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিজের ছেলে সম্পর্কে কেন তিনি এমন কথা বলছেন? তখন

তিনি বলে উঠলেন, সে তোমার সম্পর্কে কী রটাচ্ছে তা তুমি জানোনা। আয়শা (রা:) বললেন, কী বলেছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কার্যকলাপ তাকে জ্ঞাত করলেন। এ কথা শুনে আয়শা (রা:) এর রক্ত হিম হয়ে গেল। তিনি গৃহে ঢুকেই বিছানায় লুটিয়ে সারারাত কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেন।

এদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা:) রটনাটি শুনে চিন্তায়ুক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি আশা করছিলেন যে, এ বিষয়ে ওহী আসবে। কিন্তু ওহী আসতে বিলম্ব দেখে তিনি এ ব্যাপারে আপনজনদের নিকট হতে পরামর্শ চাইলেন। তাঁর জামাতা আলি ইবনে আবু তালিব এবং সাহাবা উসামা ইবনে যায়েদ (রা:)ও সেখানে ছিলেন। তিনি তাদের কাছে এ রটনার বিষয়ে আয়শা (রা:) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উসামা ‘হযরত আয়শা (রা:)-এর পবিত্রতার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন, আমি তো আপনার স্ত্রী হযরত আয়শা (রা:)-এর মধ্যে ভালো ছাড়া কোনো খারাপ বৈশিষ্ট্য দেখিনি। হযরত রাসুল (রা:)-এর আরেক স্ত্রী যয়নব (রা:) বললেন, আমিও তো তার মধ্যে ভালো ছাড়া কিছু জানিনি। (বুখারি, ১৩৬৭ হিঃ, ইফক অধ্যায় ; মাবুদ, ২০১৪ : ৯৩)

এ সম্পর্কে জানার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা:) দাসী বারিরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ‘আয়শার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পেয়েছ? জবাবে বারিরা বলল, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, তার কসম, আমি তো তার মধ্যে খারাপ বা আপত্তিকর কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে অল্পবয়স্কা শুধু এটুকু দোষ দেখেছি যে, তিনি যখন রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন, তখন বকরী এসে তা খেয়ে নেয়। (মাবুদ, ২০১৪ : ৯৪)

হযরত মুহাম্মদ (সা:) হযরত আয়শা (রা:)-এর নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ হওয়া বিষয়ে সন্দেহমুক্ত ছিলেন। হযরত আয়শা (রা:)-এর নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্য তিনি মসজিদুন নববিতে তার উপদেষ্টামণ্ডলীকে ঐদিনই ডাকলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে আমার স্ত্রীর উপর মিথ্যা অপবাদকারীকে শাস্তি দিয়ে আমাকে পীড়াদায়ক অবস্থা হতে নিষ্কৃতি দেবে। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে ‘আবদুল্লাহ ইবনে উবাই’ হলো এ ঘটনার মূলনায়ক। তার এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর কথায় আরব উপদ্বীপের প্রসিদ্ধ গোত্র আওস সম্প্রদায়ের নেতা উসায়দ ইবনে হুদায়র মতান্তরে সাদ ইবনে মু‘আয (রা:) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল

(সা:) অভিযোগকারী যে গোত্রেরই লোক হোক না কেন আমি তার মাথা বিচ্ছিন্ন করবোই। (মাবুদ, ২০১৪ : ৯৪)

এ কথায় খায়রাজ গোত্রের সাথে আওস গোত্রের মারামারি বেঁধে যাওয়ার উপক্রম ঘটে। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ঘটনাক্রমে খায়রাজ গোত্রের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলো। আরবের আওস ও খায়রাজ ছিল প্রধান দু'টি গোত্র। গোত্রগত প্রাধান্য নিয়ে বহুকাল ধরে এদের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছিলো। ইসলামের আবির্ভাবে এ দু'গোত্রের মধ্যে আবারও গণ্ডগোলের সূত্রপাত হতে দেখে রাসূল (সা:) তা থামিয়ে দেন। একমাসব্যাপী এই মিথ্যা বানোয়াট কথা সমাজের মুখরোচক বিষয়ে পরিণত হলো। রাসূল (সা:) মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্টে নিপতিত হলেন। হযরত আয়শা (রা:) পিতা-মাতাসহ অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কাটাতে লাগলেন।

শেষে একদিন রাসূল (সা:) হযরত আয়শা (রা:)-এর নিকটে গেলেন। হযরত আয়শা (রা:) ভাবলেন, তিনি বোধহয় কোনো ফয়সালা দেবার জন্য এসেছেন। হযরত আয়শা (রা:)-এর পিতামাতা ভাবলেন, এবার বোধহয় কোনো সিদ্ধান্তমূলক রায় হবে। এ ভেবে তারাও হযরত আয়শা (রা:)-এর নিকটে এসে বসলেন। (মাবুদ, ২০১৪ : ৯৫-৯৮)

অতঃপর রাসূল (সা:) কথা উঠালেন, তিনি বললেন, হে আয়শা (রা:) তোমার সম্পর্কে উত্থাপিত অপবাদ-অভিযোগ আমার কানে উঠেছে। তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাকো, তবে আশা করা যায়, আল্লাহ এ সম্পর্কে তোমার নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ দিবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর নিকট তওবা করে ক্ষমা চাও, কোনো অপরাধী যদি অপরাধ করে তাওবা তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। এ কথা শুনে হযরত আয়শা (রা:) ও তাঁর পিতামাতা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

পরক্ষণেই হযরত আয়শা (রা:) বলে উঠলেন, একটা কথা শুনে তা আপনাদের কাছে অনেকটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। এখন যদি আমি নিজেকে নির্দোষ বলি তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যা নই তা যদি স্বীকার করি তবে একটা অন্যায় ও মিথ্যা কর্মকে স্বীকার করে নেয়া হবে, যার সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই। এ পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার এখন ইউসুফ (আ:)-এর পিতার কথাই স্মরণ হচ্ছে।

তিনি বলেছেন, “এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম উপায়, আর তোমরা যা কিছু বলেছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র ভরসাস্থল।” এ কথা বলে হযরত আয়শা (রা:) অপর দিকে পাশ ফিরে রইলেন। তিনি ভাবলেন, আল্লাহ তো জানেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহতায়াল্লা তিনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করে দেবেন। তবে তার বিষয়ে যে আল্লাহতায়াল্লা পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করবেন তা তিনি ভাবেননি। তিনি ভেবেছিলেন, শ্রুষ্ঠা হয়তো স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে সবাইকে জানিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল হদ, হাদিস নং-৪৪৭৪ : আত তিরমিযী, হাদিস নং-৩১৮১ : মুহিউদ্দীন, ১৪১৩ হিঃ : ৯৩৩)

এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ সেখানেই মহানবীর (সা:) উপর ওহী অবতরণ করে হযরত আয়শা (রা:) কে নিষ্পাপ ঘোষণা করেন। এতে মহানবী (সা:) খুব খুশী হয়ে হাসি মুখে বললেন, হে আয়শা! তোমার সুসংবাদ রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়াল্লা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যার দ্বারা তোমার উপর আরোপিত অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। আল্লাহর ভাষায়, “যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমাণদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং এটা তো নির্জলা অপবাদ!.....”(সূরা আন-নূর, আয়াত নং ১১-২১) ইসলামের পরিভাষায় এটিকে ইফক বলা হয়^{১০} বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা বলা হয়। (আবু শুকরাহ, ১৯৮৭ : ২৭৫)

অতঃপর রাসূল (সা:) মসজিদে নববিত্তে গিয়ে একে একে রটনাকারীদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যেকেই নিজেদের কৃত অপরাধ স্বীকার করে। তারা শোনা কথা রটনা করেছে তাদের কোন স্বাক্ষী নেই। অতঃপর কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো, “আর যারা সাক্ষী ও সতী মহিলার প্রতি অপবাদ রটায় অতঃপর (তাদের দাবীর স্বপক্ষে) চারজন সাক্ষী আনয়ন করে না, তাদেরকে তোমরা আশি দোড়রা

^{১০}. ইফক শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টে দেয়া, বদলে দেয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিল, বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহতায়াল্লাকে ফিসক ও ফাসেক দোষে অভিযুক্ত করা, সেই মিথ্যাকে ইফক বলা হয়। এ শব্দের মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়াল্লা পক্ষ হতে হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা:) কে তাঁর উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগ হতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বেত্রাঘাত লাগাও এবং কখনও (কোন ব্যাপারে) তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। এরাই তারা-যারা ফাসেক।” (সূরা নুর, আয়াত নং ৪)

হযরত আয়শা (রা:) এমনই উত্তম ও মহান নারী ছিলেন যাকে কেন্দ্র করে আল-কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। কোথাও ওয়ু করতে পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করার নিয়ম প্রাপ্তিতেও তাঁর ভূমিকা ছিলো। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছিলো তা হলো : “আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাকো কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকো কিংবা নারী সহবাস করে থাকো, কিন্তু পরে যদি পানি না পায়, তবে পাক পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য তায়াম্মুম করে নাও। তাতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।” (সূরা নিসা, আয়াত নং ৪৩)

নেতা নির্বাচন

হযরত আয়শা (রা:) মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা:)-কর্তৃক যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলন করেন তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করে গেছেন। মদিনার এ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো সকল শ্রেণির মধ্যে সমতা বিধান। সমাজে সমতাভিত্তিক এ রাজনীতি অব্যাহত রাখতে হযরত আয়শা (রা:)-এর প্রচেষ্টা ছিলো লক্ষণীয়।

৬৩২ খ্রি: হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ইন্তেকালের পর কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নিজেদেরকে মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চক্রান্ত শুরু করে। এ সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হযরত আবুবকর (রা:), হযরত আলি (রা:), হযরত ওমর (রা:) ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দ শোকে অধীর হয়ে পড়ায় চতুর্দিকে কী চরম বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল তা তারা অনুধাবন করতে পারেনি। হযরত আবু বকর (রা:), হযরত আলি (রা:), হযরত ওমর (রা:) শোক সামলিয়ে উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তা তারা অনুধাবন করতে পারেনি। যেমন সা’আদ ইবনে উবায়দা আনসারী বনু-সাআদ গোত্রের বারান্দায় আনসার সম্প্রদায়কে একত্রিত করে খলিফা হবার জন্য জোর প্রচারণা শুরু করে। (Lapidus, 1988 : 48) তখন তারা শোক সামলিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৎপর হলেন। এ ঘটনা জানার সাথে সাথে হযরত আয়শা (রা:) ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ফাতিমা (রা:)

ও হযরত আলি (রা:) এর সাথে পরামর্শ করে শোকসন্তপ্ত পিতাকে বললেন, পরবর্তী উত্তরসূরি মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দাফন স্থগিত থাকবে। (রহমান, ১৯৭৭ : ১৩৭)

ব্যাপক আলোচনার পর হযরত আয়শা (রা:)-এর দেওয়া যুক্তির আলোকে সকলে সিদ্ধান্ত নেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন জনগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। এ প্রক্রিয়ায় হযরত আবুবকর (রা:) সর্বপ্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। অতঃপর সমবেত জনগণ একমত হয়ে হযরত আবুবকর (রা:)-এর হাতে বা'য়াত বা শপথ গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা:) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দাফনকার্য সমাধা করেন। (রহমান, ১৯৭৭ : ১৩৮)

নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার যে সাম্যের ধারা শুরু হয়েছিলো তা অব্যাহত রাখতে উপযুক্ত নেতৃত্বের সন্ধানে হযরত আয়শা (রা:) এই কঠোরতা অবলম্বন করেন বলে মনে করা হয়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রশমনে হযরত আয়শা (রা:)- এর প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা

যে কোনো সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন। হযরত আয়শা (রা:) সামাজিক উন্নয়নে সেই চরম পশ্চাৎপদ সময়ে বহু কাজ করে গেছেন।

তাঁর অন্যতম অবদান ছিলো এক কঠিন মুহূর্তে জাতিকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান। ৬৫৬ খ্রি: মদিনায় খলিফা হযরত ওসমান (রা:)-এর হত্যাকাণ্ড ঘটলে উদ্ভূত বেসামাল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। জনপ্রিয় খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জামাতা ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওসমান (রা:)-এর মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের সকল স্থান হতে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। (আমীর আলী, ১৯৯২ : ৪৭) বিশেষত কুফা, বসরা ও সিরিয়া অঞ্চলে বিক্ষোভ জোরদার হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে সমর্থকদের মাধ্যমে হযরত আলী খলিফা নিযুক্ত হয়েই অশান্ত সাম্রাজ্যে ঐক্য-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও হত্যাকারীকে ধরার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেও ব্যর্থ হন। বিক্ষোভ চলতে থাকে। (আসির, ১৯৯৫ : ১৯২)

খলিফা হযরত ওসমান (রা:) এর হত্যাকাণ্ড

হযরত ওসমান (রা:)-এর বারো বছরের শাসনামল ছিলো রাষ্ট্রীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শেষের দিকে তাঁর দাপ্তরিক সচিব মারওয়ানের বিরুদ্ধে পদবধিগত মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর, মুহাম্মদ ইবনে আবি হুজায়ফা ও অন্যান্য মিলে মিশরে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। এরা মিশরের প্রাদেশিক কর্মকর্তা বা ওয়ালির নিকটে খলিফার তরফ হতে প্রেরিত একটি পত্র পেয়ে হয়ে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পত্রে মিশরে নবগঠিত দলকে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী করার নির্দেশ ছিলো। এই পত্র মারওয়ান লিখে পাঠিয়েছিলো এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে অচিরেই হুজ্ব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া মারওয়ান বিরোধী নেতারা মিশর, কুফা, বসরা এলাকা হতে আগত বহু অনুরাগীসহ মদিনার নিকটবর্তী এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। (লুৎফর, ১৯৯৭ : ৬৩) তারা খলিফা ওসমান (রা:) গৃহে গিয়ে তার পদত্যাগ অথবা মারওয়ানকে তাদের নিকটে হস্তান্তর করতে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু খলিফা কোনো শর্তে রাজি হননি। পরবর্তীতে এ নিয়ে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলায় ৮২ বছরের বৃদ্ধ খলিফা ৬৫৬ খ্রি: শাহাদাতবরণ করেন। (আসির, ১৯৯৫ : ১৬৫)

সিরিয়ার আমির মুআবিয়া ছিলেন ওসমান (রা:)-এর স্বগোত্রীয় উমাইয়া বংশীয় ব্যক্তি। তিনি ওসমান (রা:)-এর রক্তমাখা কাপড় ও তাঁর স্ত্রী নাইলার কর্তিত হাতের আঙুল জনসম্মুখে প্রদর্শন করে জনরোষ আরো বৃদ্ধি করেন। (ইবনে সাদ, ১৩২১ হিঃ : ১৬)

হযরত আলি (রা:) তা অনুধাবন করতে পেরে আমির মুআবিয়ার স্থলে সহল ইবনে হানিফকে নিয়োগ দান করে তাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সহল সেখান হতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। আমির মুআবিয়া কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। (Muhammad, 1991 : 16) হযরত আলি (রা:) বিদ্রোহী ও বিক্ষোভরতদের বোঝাতে ব্যর্থ হন যে, তিনি খলিফা ওসমান (রা:)-এর হত্যাকারীদের ধরার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিক্ষোভ প্রশমনে হযরত আয়শা (রা:)-এর ভূমিকা

খলিফা ওসমান (রা:)-এর হত্যাকাণ্ড মদিনায় সংঘটিত হয়েছিলো। হযরত আয়শা (রা:)ও মদিনাতেই বসবাস করতেন। ঘটনার সময় প্রতি বছরের অভ্যাসমত হজ্জ করে মক্কা হতে মদিনায় ফেরার পথে খলিফা ওসমান হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনলেন।

পথেই মদিনা হতে আগত ভগ্নী আসমা (রা:)-এর স্বামী যুবাইর ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর অন্যতম সঙ্গী, প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারী, বীর যোদ্ধা তালহার নিকট হতে জানতে পারলেন তারা মদিনার অধিবাসী হতে কোনরকমে পালিয়ে এসেছেন। সেখানকার জনগণ খুব উত্তেজিত ও নিরাপত্তাহীন। (আসির, ১৯৯৫ : ১৯২)

মক্কায় হযরত আয়শা (রা:)-এর প্রত্যাবর্তন

তিনি মক্কায় ফিরে গেলে খলিফার নিহতের খবর পেয়ে মক্কার জনগণ তাঁর নিকটে ছুটে আসতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে হযরত আয়শা (রা:) সাম্রাজ্যের গোলযোগ প্রশমনে নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। উমর বিনতে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, হযরত আয়শা (রা:) বলেন, (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ১৯৭৮, বাবুত তাফসির অধ্যায়) সেই কওমের (সম্প্রদায়) মতো অন্য কোনো কওম নেই যারা নিশ্চিন্ত আয়াতের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে। তা হলো : “যদি মুমিনদের দুইটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত নং ৯)

হযরত আয়শা (রা:) কর্তৃক বিদ্রোহ দমন

হযরত আয়শা (রা:)-এর দলটি অল্পসময়ের মধ্যেই একটি সংঘটিত শক্তিতে পরিণত হলো। তাঁর দলে বসরার প্রসিদ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ ইবনে আমের ও ইবনে মুনাব্বাহ যিনি প্রচুর নগদ অর্থসহ যোগ দিলেন। ইয়ালা ইবনে মুনাইয়া নামক অপর একজন প্রতিপত্তিশালী মুসলমান ইয়েমেন হতে

সাতশ'ত উট ও ছয় লাখ দিরহাম এনে আয়শা (রা:) কে প্রদান করেন। (আসির, ১৯৯৫ : ২০৭) ওসমান (রা:)-এর শাসনামলে তাঁর উদারতা ও সরলতার সুযোগে এক শ্রেণির যাযাবর খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এরই সাথে ইবনে সাবা নামে এক নও মুসলিম যে ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো সে ওসমান (রা:)-এর খলিফা থাকা অবস্থাতেই হযরত আলির খলিফা পদ পাওয়ার সপক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্যে প্রচারণা শুরু করে। বিশেষত কুফা, বসরা, মিসর তথা যেখানে বড় বড় সেনা ছাউনি ছিলো সেখানে কিছু না কিছু বিপ্লবপন্থী বানিয়ে ফেলে। এমনকি সে মিশরকে বিপ্লবপন্থীদের কেন্দ্র হিসেবে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ইতিহাসে এটা 'সাবায়ি আন্দোলন' নামে পরিচিত। (রহমান, ১৯৭৭ : ১৪৫)

হযরত আলির (রা:)-কাছে এটি অপছন্দনীয় হলেও করার কিছু ছিলো না। আর হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর পারিবারিক উত্তরসূরি হিসেবে সাম্রাজ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। আর তিনি যোগ্যতার দিক থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। অনেকে স্বেচ্ছায় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর পক্ষে প্রচারণা চালাতেই পারে এটা অস্বাভাবিক নয়।

হযরত আলি (রা:) খলিফা হয়ে এক বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। খলিফা ওসমান হত্যার জন্য সাধারণ জনগণের সন্দেহের তীর অনেকটা 'সাবায়ি'দের দিকে। সাবায়ি ও বিদ্রোহীরা মদিনায় অবস্থান করছে বলে হযরত আয়শা (রা:) তাঁর দলসহ সেদিকে যাত্রা করার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু আয়শা (রা:)-এর বিশ্বস্ত সঙ্গী হযরত তালহা ও যুবাইর (রা:)-এর ঘাঁটি ও সমর্থক গোষ্ঠীর আবাসস্থল বসরা ও কুফা হওয়ায় সামরিক সাহায্যের জন্য তারা কাফেলাকে সেদিকে যাত্রা করালেন।

সেদিনের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য হযরত 'আয়শা (রা:) কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ ও তার ঘর হতে বের হওয়া প্রভৃতি দেখে অনেকে ভীষণ কান্নাকাটি করেন বলে ইতিহাসে এ দিনটিকে 'ইয়াউমুন নাহীব' বা 'কান্নার দিন' বলা হয়। (আসির, ১৯৯৫ : ২১০) হযরত আয়শা (রা:) 'আল-আসকার' নাম্নী একটি উটে করে চলতে লাগলেন। এ উটটি তার এক ভক্ত ইয়া'লা ইবনে মুনাইয়া নামক ব্যক্তি উবাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট হতে আশি দিনার দিয়ে ক্রয় করে হযরত আয়শা (রা:) কে তা উপঢৌকন হিসেবে দেন।

হযরত ওসমান (রা:) বনু উমাইয়া গোত্রভুক্ত ছিলেন বলে এ গোত্রীয় তরুণরা হযরত ওসমান (রা:)-এর হত্যাকাণ্ডের পর নিজস্ব এলাকা হতে বের হয়ে প্রাণভয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই প্রাণভয়ে মক্কায় আসতে থাকে। এইসব লোক বসরায় হযরত আয়শা (রা:)-এর গমনের পথে তার বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই বাহিনীর অগ্রভাগে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা:) অবস্থান নিয়েছেন তা শুনে ও তার ঘোষণার খবর পেয়ে জনগণ চলমান এ বাহিনীতে ঢুকতে থাকে। দেখতে দেখতে এটা প্রায় তিন হাজার সদস্যের বাহিনীতে পরিণত হয়। বনু উমাইয়ার সা'ইদ ইবনুল আস ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম নিজস্ব দলবলসহ এ বাহিনীতে ঢুকে হযরত আয়শা (রা:) ও তার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের উক্ষিয়ে দিতে শুরু করেন যে, এদের দিয়ে আপোস-মীমাংসার কোনো কাজ হবে না। তালহা, যুবাইর মদিনায় কেন নিশ্চুপ ছিলেন-এসব প্রচারণার মাধ্যমে তারা পরোক্ষভাবে মা হযরত আয়শা (রা:)-এর ভাবমূর্তি বা প্রাধান্যকে বিনষ্ট করতে চক্রান্ত করে। একটি দল হিসেবে হযরত আয়শা (রা:)-এর উত্থানকে নস্যাত্ন করে। (Tabari, ১৯০১ : ৩৮২) তাঁর এ দলের নাম ছিলো 'দাওয়াতে ইসলাহ'। (রুশদী, ২০০৮ : ১২১)

হযরত আয়শা (রা:) উৎসাহ হারালেন না। তিনি সাম্রাজ্যের গোলযোগ মিটানোর জন্য মক্কা, মদিনা ও বসরার পরে আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর কুফায় পৌঁছে অনধিক দশ হাজার মানুষের সম্মুখে তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ভাষণটির মূল ভাষ্য ছিলো এই রকম

“জনগণ ওসমান (রা:)-এর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতো, তাঁর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দোষ-ত্রুটি প্রচার করতো। মানুষ মদিনায় এসে আমাদের কাছে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতো। আমরা তাদেরকে সন্ধি ও আপোস-মীমাংসার যে উপদেশ দিতাম তারা তা মেনে নিত। ওসমান (রা:)-এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিলো, আমরা সে বিষয়ে গভীরভাবে খতিয়ে দেখে তাঁকে একজন নিষ্পাপ পরহেয়গার ও সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে পেতাম। আর শোরগোলকারীদেরকে দেখতাম তারা পাপাচারী ও ধোঁকাবাজ। তাদের অন্তরে ছিলো এক কথা, আর মুখে ছিলো ভিন্ন কথা। তাদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল তখন তারা বিনা কারণে এবং বিনা দোষে ওসমান (রা:)-এর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অতঃপর যে রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ ছিলো না, তা তারা করেছে। যে ধন-সম্পদ লুটপাট করা সঙ্গত ছিলো না, তারা তার অমর্যাদা ও অসম্মান করেছে। সাবধান! এখন যে কাজ করতে হবে এবং যার বিরোধিতা করা উচিত হবে না, তা হলো

ওসমান (রা:)-এর হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা এবং শক্তভাবে আল্লাহর হুকুম ও বিধান বলবৎ করা। (আহমাদ, ৭ম খণ্ড, ১৯৮০ : ৪৩০ ; মাবুদ, ২০১২ : ১২০)। বক্তব্য সমাপ্তির পর এ সম্পর্কে তিনি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করেন : “আপনি কি তাদের দেখেছেন, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে-আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিলো যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে দেয়।” (সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ২৩)।

এদিকে হযরত আয়শা (রা:)-এর বাহিনীতে যোগ দিতে হযরত আলি (রা:)-এর পক্ষ থেকে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং হযরত ইমাম হাসান (রা:) কুফায় গমন করেন।

হযরত আয়শা (রা:)-এর বাহিনী বসরার নিকটবর্তী হলে দলের এক অংশ তাদের উপর আক্রমণ করে। শেষে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে রূপ নিলে এই উটের উপর আরোহণ করে হযরত আয়শা (রা:) পরবর্তীতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন বলে ইতিহাসে এটি ‘উটের যুদ্ধ’ বা ‘জঙ্গে জামালের’^{১৪} যুদ্ধ নামেও পরিচিত। হযরত আয়শা (রা:) এ হামলা শক্তহাতে দমন করে বসরা দখলে নেন। এ যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিলো। (রুশদী, ২০০৮ : ১১৪) হযরত আলি (রা:), হযরত তালহা (রা:), হযরত যুবাইর (রা:) যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উভয় দলকে যুদ্ধ বন্ধ করতে চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে হযরত আয়শা (রা:) বসরার প্রধান বিচারক কাব ইবনে সাওয়্যারকে ডেকে তাঁর হাতে নিজের কুরআনের কপিটা দিয়ে বলেন, যাও এটি দেখিয়ে লোকদের আপোস-মীমাংসার আহ্বান জানাও। কিন্তু তিনি তা করা সত্ত্বেও যুদ্ধ বন্ধ হলো না। বিদ্রোহীরা কাবকে হত্যা করলো। (ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, ২০০৭ : ৪২৫-৪৩৮) তখন হযরত আলি (রা:) ও হযরত আয়শা (রা:) বুঝলেন বিদ্রোহী দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। উভয় দল তখন একত্র হয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেন। হযরত আলি (রা:), হযরত আয়শা (রা:) কে সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। (রুশদী, ২০০৮ : ১৩৯)

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন নারী হয়ে তিনি কেন সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি সামলাতে বের হলেন। কোনো পুরুষ মানুষই কি সেদিন এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো ছিলো না। এর আগের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও তা দূরীকরণে হযরত আয়শা (রা:)-এর প্রচেষ্টাকে জনগণ কর্তৃক সমর্থন করা এটাই প্রমাণ করে যে,

^{১৪}. হযরত আয়শা (রা:) উটের পিঠে আরোহণ করে এই যুদ্ধ পরিচালিত করেছিলেন বলে এই যুদ্ধকে জঙ্গে জামালের যুদ্ধ বলা হয়।

সাম্রাজ্যকে বিশৃঙ্খলা হতে মুক্ত করতে তিনিই তখন ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত আয়শা (রা:) যখন নারী মহলে ইসলামি শিক্ষা প্রচার করতেন তখন নামাজের সময় হলে ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতেন। তবে তিনি স্ত্রীলোকদের কাতারের মধ্যেই দাঁড়াতেন। (ইবনে সাদ, ১৩২১ হিঃ : ৭৫-৭৮)। কাজেই নারীরা যে নেতৃত্ব দিতে পারবে না এমন কোনো সর্বসম্মত অভিমত পাওয়া যায় না। তিনি হযরত আলির উপর আর আস্থা রাখতে না পেরে নিজেই উদ্যোগী হন। তখন জনগণের অসন্তোষ দূর করার জন্য হযরত ওসমান হত্যাকারীদের বন্দী করা ও শাস্তি প্রদান অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে দেখা দেয়। যা অনন্তকালের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

হযরত আয়শা (রা:) আজীবন মুসলিম বিশ্বকে বুদ্ধি ও পরামর্শ দান, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ, বক্তৃতা দ্বারা সাংঘাতিক কোনো জনরোষ বা উত্তেজনা প্রশমনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে গেছেন। বেশ কিছু ঘটনার মাধ্যমে এর প্রমাণ মেলে। একজন নারী হয়েও আজ হতে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে সেই চরম পশ্চাৎপদ সমাজে পরিস্থিতি সামাল দিতে যেভাবে রাজনীতি চর্চা করে গেছেন তা তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতা প্রমাণ করে।

ক্রীতদাস মুক্তকরণ

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিলো ক্রীতদাস প্রথা। আয়শা (রা:) দাস-দাসীদের প্রতি দয়র্দ্র্চিত ছিলেন। সুযোগ পেলেই দাস মুক্ত করতেন। তিনি একবার এক ঘটনায় কসম খেয়ে ফেললেন। কাফফারা হিসেবে তিনি চল্লিশজন দাস মুক্ত করে দেন। এভাবে তিনি অর্থ ব্যয় করে জীবনে মোট সাতষট্টি জন দাস মুক্ত করে তাদেরকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বসবাস করার সুযোগ দান করেন। (মাবুদ, ২০১৪ : ১৪৪) তামিম গোত্রের বারিরা নামক এক দাসীকে মুক্ত করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বারিরা নিজের মুক্তির জন্য স্বীয় মালিকের নিকটে চুক্তিবদ্ধ হয়। পরে হযরত আয়শা (রা:) জানতে পারেন বারিরা হযরত ইসমাইল (আ:) এর বংশধর। মেয়েটি যাতে শীঘ্রই মুক্তি পায় সেজন্য তিনি রাসূল (সা:)-এর অনুপ্রেরণায় একাই মেয়েটির মনিবকে সব অর্থ দিয়ে বারিরাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। (মালিক, ১৯৭৭ : ২৫৭) তাছাড়া আরও নিয়ম করা হয় যে, যে মনিব তাঁর দাসকে মুক্ত করবে সেই মনিব ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের মধ্যে আল-ওয়াল্লা বা অভিভাবকত্ব তৈরী হবে। এ নীতিতে ক্রীতদাসটির কোনো সম্পদ থাকলে সে

সম্পদের অংশ পাবে মুক্তিদাতা মনিব। (বায়হাকি, ২০০২ : ১৬২-১৬৩) এ পদ্ধতিতে গৃহে গৃহে যে অগণিত ক্রীতদাস ছিলো তাদের অনেকেই মুক্তিলাভ করে মনিবের বংশের লোক বলে পরিগণিত হয়ে মর্যাদার সাথে বসবাস করতো। দাস মুক্তকরণের এ প্রক্রিয়ার জন্য সকলে হযরত আয়শা (রা:)-এর নিকটে খণ্ডী হয়ে আছেন।

দানশীলতা

হযরত আয়শা (রা:) নতুন আদর্শে দীক্ষিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন। তাঁর ঘরের দেয়াল ছিলো খেজুর পাতার, আর ছাদ নির্মিত হয়েছিলো ডাল দিয়ে যে ঘরে দাঁড়ালেই মাথা ছাদ স্পর্শ করতো। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ১৬) তাঁর পরিবার এতো দরিদ্রের মধ্যে বসবাস করতো যে, রাতে ঘরে বাতি জ্বালানোর মতো তেল থাকতো না। তাঁর ভাষ্যে জানা যায়, একাধারে প্রায় চল্লিশ রাত চলে যেত ঘরে বাতি জ্বলতো না। এমনও দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে যে, ঘরে কোনো খাদ্য না থাকায় সকলকে রোযা থাকতে হয়েছে। (মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৬৭ : ৪৯) মাসের পর মাস তাদের ঘরে উঁনুন জ্বলেনি। শুধুমাত্র খেজুর ও পানি খেয়ে থেকেছেন। এত অনটনের মধ্যেও তাঁরা সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। জীবনের এ অবস্থায় তিনি এতই দয়ালু ছিলেন যে, কখনও তাঁর নিকটে কেউ এসে নিরাশ হয়ে যেতো না। একটি খেজুর এমনকি একটি আঙুর হলেও তা দান করতেন। তখন কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই তাকে গোত্রচ্যুত করা হতো। তিনি হাতে কিছু আসলেই তা ইসলামে দীক্ষিত মুসলমানদেরকে দান করে দিতেন। কিছু না থাকলে তিনি ঋণ করে হলেও তাকে সাহায্যের জন্য চেষ্টা করতেন। (হাসান, ২০০৪ : হাদিস নং- ৩৪৭৮)

রাষ্ট্র পরিচালনায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন

হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ইন্তেকালের পর একজন বরণ্য ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রাদেশিক শাসকরা কীভাবে শাসন পরিচালনা করছে সে সম্পর্কে তিনি খোঁজ খবর নিতেন। একবার মিশর হতে এক আগন্তুক তার সাথে দেখা করলে, তিনি ওখানকার শাসক সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে আগন্তুকটি বলেন, প্রতিবাদ করার মতো তেমন কোনো আচরণ তাঁদের দৃষ্টিতে পড়েনি। কারো উট মারা গেলে তিনি (সেখানকার শাসক) তাকে অন্য একটি উট দেন, কারো

চাকর না থাকলে চাকর দেন, কারো জীবন ধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে তাঁর সে প্রয়োজন তিনি মেটানোর চেষ্টা করেন। এই শাসক ছিলেন হযরত আয়শা (রা:)-এর ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, যিনি নিজেকে অতি সাধারণ ও তুচ্ছ মনে করতেন। (রুশদী, ২০০৮ : ১১১)

পরম মহানুভবতার অধিকারী হযরত আয়শা (রা:) হিজরি ৫৮ সনের ১৭ রমযান মুতাবিক ৬৭৮ খ্রি: ১৩ জুন ৬৬ বছর বয়সে আমীর মুআবিয়ার খিলাফতকালে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। (মাবুদ, ২০১৪ : ১৩৪)

হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা:) (জন্ম ৫৮৬ ও মৃত্যু সন অজ্ঞাত)

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রাসুল (সা:)-এর আরেক স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা:) বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা:) মক্কার বিখ্যাত বানু বকর ইবনে হাওয়ায়েন গোত্রে আনুমানিক ৫৮৬ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম ছিলো যয়নাব। অতি অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর স্বামীর নাম নিয়ে ইতিহাসে বিভ্রান্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর স্বামী ছিলো তুফাইল ইবনে আল-হারিস, যার সাথে তাঁর বিবাহ বন্ধন ছিল হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীতে তুফাইল এর ভ্রাতা ‘উবায়দা ইবনে আল-হারিস’-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। উবায়দা বদর যুদ্ধে শহীদ হন। (Ibn Saad, 995 : 300) অন্য আরেক মতে, তাঁর হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে বিবাহ হয়েছিলো (আসির, ১৯৯৬ : ৬৬)। তাঁর স্বামীর নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ-এই মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করা হয়। তারা উভয়ে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ৬২৪ খ্রি: বা হিজরি তৃতীয় সনে সংঘটিত ওহুদ প্রান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর অসংখ্য সাহাবি নিহত হন। তাঁর স্বামীও এ যুদ্ধে শহীদ হন। শত্রুরা তাঁর মৃত স্বামীর শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে বিকৃত করে। (ইবনে আবদিল, ১৯৮৫ : ৩১৩) স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এ যুদ্ধের ফলে বহু নারী বিধবা হয়ে পড়ে। তাদের নিরাপত্তা প্রদান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা:) এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি অনেক নারীকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হবার সনেই রমজান মাসে চারশত দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে যয়নাব বিনতে খুযায়মাকে বিবাহ করেন ও তিনি হন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। কিন্তু যয়নাব বেশিদিন সংসারধর্ম

পালন করতে পারেননি। ধারণা করা হয়, তিনি স্বল্প বয়সে অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুসন জানা যায়নি। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ৬৪৭)

অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর অবদান

হযরত যয়নব (রা:) সবসময়ে অনাথ, দুস্থদের অভাব মোচনে সচেষ্ট থাকতেন। এজন্য সমাজে তিনি পরিচিত ছিলেন উম্মুল মাসাকিন বা গরীব-দুঃখীর মা নামে। তিনি তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে গৃহহারা, সমাজচ্যুত নিঃস্ব মানুষের পাশে নিজের অর্থ-সম্পদ নিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি বাল্যকাল হতেই প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং গরীব দুঃখীর উপকারে সর্বদা এগিয়ে আসতেন। তাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সেই বাল্যকালেই তিনি উম্মুল মাসাকিন নামে আরবে পরিচিতি পান। এ কারণে হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। (ইবনে আবদিল বার, ১৯৮৫ : ৩১৫)

একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর স্ত্রীগণ তার নিকটে এসে জানতে চাইলেন, তাদের মধ্যে কে আগে মৃত্যুবরণ করবে। উত্তরে রাসূল (সা:) বললেন, “তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা সেই আগে মৃত্যুবরণ করবে।” (ইবনে আবদিল বার, ১৯৮৫ : ৩১৫) এ কথা শুনে সকলে ভাবল যে, হযরত সাওদা (রা:) যেহেতু সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গিনী কাজেই তিনিই বোধহয় সবার আগে মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু সবার আগে মাত্র ৩০ বছর বয়সে এবং রাসূলের সাথে বিবাহের মাত্র ৩ মাস পরে যয়নব (রা:) যখন ইন্তেকাল করলেন তখন সকলে বুঝলেন রাসূল (সা:) কী বুঝাতে চেয়েছিলেন। (Ibn Saad, 1995 : 301)

হযরত হাফসা (রা:) (জন্ম ৬০৫ খ্রি: ও মৃত্যু ৬৬৫ খ্রি:)

হযরত হাফসা বিনতে উমর ইবনুল খাতাব (রা:) একজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা ছিলেন। নারীকে যখন মানুষই মনে করা হতো না, এমন পরিবেশে মানবসমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর একজন হিসেবে হযরত হাফসা (রা:) খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ইতিহাসের এক কঠিনতম সময়ে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিলো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে পবিত্র আল-কোরআনের কপি সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সামাজিক কল্যাণে ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে গতিশীল রাখা।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত হাফসা (রা:) মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে আনুমানিক ৬০৫ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময়ে পবিত্র কাবাঘরের একটি বড় ধরনের সংস্কার কাজ সাধিত হচ্ছিল। (Ibn Saad, 1995 : 310) তাঁর পিতা ছিলেন মক্কার প্রভাবশালী নেতা ও ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি:)। আর মাতা ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ খুযাআ গোত্রের যয়নব বিনতে মাজউন, যিনি প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রা:)-এর আপন ভগ্নী ছিলেন। হযরত হাফসা (রা:) পিতা-মাতার দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা প্রথম জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলেও পরবর্তীতে স্বীয় গোত্র ও পরিবার পরিজনসহ এ আদর্শ গ্রহণ করে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিশাভে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। (নাসির, ১৯৯৮ : ১৩৫-৩৬) হাফসা (রা:) পিতার ন্যায়ই সাহসী ও তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁকে উপযুক্ত বয়সে পিতা যোগ্য পাত্র বনু সাহম গোত্রের খুনাইস ইবনে হুজাফার সাথে বিবাহ দেন। হুযাফা ইসলাম প্রচারের শুরুই দিকেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। (Ibn Saad, 1995 : 315) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই বিশিষ্ট নারী স্বামীসহ এগিয়ে এসেছিলেন।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত হাফসা (রা:)

বাস্তুভিটা ত্যাগ

হযরত হাফসা (রা:) স্বামীসহ হযরত খাদিজা (রা:), হযরত আয়শা (রা:)-এর ন্যায় স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের সাথে দ্বিতীয় দফায় হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেছিলেন। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ১৭৮) সেখানকার পরিস্থিতিও এক পর্যায়ে অনুকূলে না থাকলে তিনি স্বামীসহ পুনরায় মক্কার ফিরে আসেন। পরে হযরত মুহাম্মদ (সা:) মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করলে তিনি মদিনায় চলে যান ও সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমে অব্যাহতভাবে অংশগ্রহণ করেন। মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকলে শত্রুরা মদিনা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। সঙ্গত কারণেই মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও ইসলামের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ৬২৩ খ্রি : সংঘটিত বদর যুদ্ধ অথবা অন্যমতে ৬২৪ খ্রি : সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে হযরত হাফসা (রা:)-এর স্বামী অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে তিনি মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মদিনায় মৃত্যুবরণ

করেন। (বালায়ুরি, ১৯৩৭ : ২১৪) হাফসার বয়স তখন বিশ বছর এর কাছাকাছি। এতো অল্পবয়সেই বিধবা হয়ে তিনি নিদারুণ দুঃখকষ্টে নিপতিত হন। পরে তাঁর পিতা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেবার ইচ্ছায় একে একে হযরত উসমান (রা:), হযরত আবুবকরের সাথে বিবাহের কথা তুললে কোনো সদুত্তর পাননি। (আসির, ১৩১৪ হিঃ : ৪২৫) পরে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর পক্ষ হতে প্রস্তাব এলে পিতা সানন্দে তা গ্রহণ করে রাসূল (সা:)-এর সাথে হাফসার বিবাহ কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি চারশত দিরহাম দেনমোহর ধার্য করে হযরত হাফসা (রা:) কে বিবাহ করেন। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ৬৪৫) ইবনুল আসির বলেন, “অধিকাংশ আলেমের মতে হিজরি তৃতীয় সনে বা হিজরতের ৩০ মাস পরে এ বিবাহ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। (আসির, ১৩১৪ হিঃ : ৪২৫ ; ইবনে আবদিল বার, ১৯৮৫ : ৪১১)

বিবাহ পরবর্তী সময়ে হযরত হাফসা (রা:) হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর যোগ্য সহধর্মিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এরও হযরত হাফসা (রা:)-এর ন্যায় বিদূষী নারীকে প্রয়োজন ছিলো। এ বিবাহের মাধ্যমে উমর (রা:)-এর ন্যায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরী হওয়ায় এ ধর্মমতে দীক্ষিতদের আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়।

তাহরিমের ঘটনা

হযরত হাফসা এর দাম্পত্য জীবনে সংঘটিত আরেকটি ঘটনা হলো তাহরিমের ঘটনা। এটি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে কেন্দ্র করে ঘটেছিলো। তিনি প্রতিদিন বিকালে আসরের নামাযের পর সকল স্ত্রীর গৃহে গমন করতেন। একদিন তিনি উম্মুল মু'মিনীন হজরত জয়নব বিনতে জাহাশের ঘরে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু বেশি সময় কাটান, যা অন্যদের নজরে পড়ে। পরে সকলে জানতে পারেন হযরত যয়নবের ঘরে এক মহিলা হাদিয়াস্বরূপ কিছু মধু পাঠিয়েছে আর সেজন্যে সেখানে তাঁর অবস্থান দীর্ঘ হচ্ছে। কী করে যয়নবের ঘরে রাসূল (সা:)-এর অধিক সময় ধরে অবস্থানকে বন্ধ করা যায়, তা নিয়ে রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীগণ আয়শা (রা:) ও হাফসা (রা:)-এর নেতৃত্বে বুদ্ধি আঁটে। পরের দিন হযরত মুহাম্মদ (সা:) হাফসা (রা:)-এর ঘরে গেলে তাঁর মুখ হতে ‘মাগাফির’-এর গন্ধ আসছে এ কথা হাফসা (রা:) রাসূল (সা:) কে শুনালেন। (মাবুদ, ২০১৪ : ২২০-২২১) মাগাফির হলো এক ধরনের ফুল যার মধ্যে সামান্য কটু গন্ধ বিদ্যমান। মৌমাছি যদি মাগাফির ফুলের মধু সংগ্রহ করে তবে সে ফুল হতে গন্ধ মধুতে সংক্রমিত হতে পারে। আর রাসূল (সা:)

এরূপ গন্ধ একদম পছন্দ করতেন না। তিনি একে একে অন্যান্য স্ত্রীর নিকটে গেলে সকলের নিকট হতে একই কথা শুনে তিনি বলেন, তিনি আর মধু পান করবেন না। পরে হযরত আয়শা (রা:), হাফসা (রা:) এ কথা জানতে পেলে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বলেন, আমরা ঈর্ষার বশে একটা প্রিয় জিনিস খাওয়া হতে রাসূল (সা:) কে বঞ্চিত করেছি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আত-তাহরিমের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহতায়ালার ভাষায়, “হে নবি! আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।” (সূরা আত-তাহরিম, আয়াত নং ১) তাই হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন সমস্যাবলির আলোকে তার পেশকৃত সমাধানগুলো হতে অনুরূপ বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেতে পারি। সেজন্য স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটা হালাল জিনিসকে হারাম করা আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দ করেননি।

পারিবারিক জীবন গঠনে

তিনিও হযরত আয়শা (রা:)-এর ন্যায় দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞানদান করে গেছেন। তখন খলিফা উমরের শাসনকাল চলছে। তিনি একদিন রাতের বেলা কা'বা তাওয়াফ করা অবস্থায় শুনতে পেলেন এক মহিলা করুণ সুরে গান করছে। যার ভাষা ছিল এরকম-এই রাত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়েছে, চতুর্দিকে ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। একাকী আমি জেগে আছি। পাশে কোনো প্রিয়জন নেই, যার সাথে প্রেমালোচনা করতে পারি। আল্লাহ-যিনি অতুলনীয়, যদি তাঁর ভয় না থাকতো তাহলে এই শয্যাধারের চারপাশ অবশ্যই কম্পিত হতো। হযরত উমর (রা:) মহিলার নিকটে গিয়ে জানতে পারলেন যে, কয়েকমাস যাবত তাঁর স্বামী তার নিকটে নেই বলে তার এই অবস্থা। স্বামীকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি তার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে। অতঃপর ‘উমর (রা:) স্বীয় কন্যা ও রাসূল (সা:)-এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা:)-এর নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীরা কতদিন স্ত্রীর নিকটে না থাকলে চলে? হাফসা (রা:) উত্তরে বলেন, তিন অথবা চার মাস। তখন উমর (রা:) নির্দেশ দেন, কোনো সৈনিককে যেন চারমাসের অধিক আটকে রাখা না হয়। (আলাউদ্দিন, ১৯৮৫ : ২৭৯)

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে হযরত হাফসা (রাঃ)

আলোচিত সময়ে পৃথিবীর মানুষেরা সাংস্কৃতিকভাবে অধঃপতিত হয়ে পড়েছিলো। কুসংস্কার ও যাদুটোনার আবদ্ধ জীবনে শিক্ষা-দীক্ষার লেশমাত্র ছিলো না। মানুষের সামনে কুসংস্কার বিবর্জিত ধ্যান-ধারণা, শান্তিপূর্ণ আদর্শ নিয়ে হাফসা (রাঃ) কাজ শুরু করেন। শিক্ষা এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে তাঁর করণীয় বিষয়। আরবিয়রা একটি মূর্খ জাতি হলেও এ সমাজে কিছু প্রগতিশীল পরিবার বসবাস করতো, এমনি একটি পরিবারের সন্তান ছিলেন হযরত হাফসা (রাঃ)। তাঁর পিতা ছিলেন মক্কার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি পিতার নিকটে ও পরে মক্কার একমাত্র লেখাপড়া জানা নারী হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহর নিকটে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। (নুমানি, ১৯৭৮ : ১৫৭) পরবর্তীতে তিনি নারীদের প্রশিক্ষিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

কুরআনের হস্তলিখিত কপি সংরক্ষণে

একজন প্রশিক্ষিত ও সচেতন নারী হিসেবে মানবজাতির জ্ঞানের ওহীর জ্ঞানের উৎস পবিত্র কুরআনের লিখিত কপি অত্যন্ত যত্নের সাথে তিনি সংরক্ষণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধর্মগ্রন্থ কুরআন সংরক্ষণে কুরআন মুখস্তের পাশাপাশি জীবদ্দশাতেই বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী, সত্যবাদী, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সংগ্রামী সাহাবীদেরকে নিযুক্ত করে তাদের মাধ্যমে কুরআন লিখে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন য়ায়েদ ইবনে ছাবিত। ওহী লেখকগণ প্রথম কুরআন লিখতে তখনকার দিনের লেখাপড়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত গাছের বাকল, জম্বুর হাড়, চামড়া, শ্বেতপাথর, মিশরীয় কৌম বস্ত্র এবং ঐ সময়ের আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ ব্যবহার করতেন। (বদরুদ্দীন, ১৯৬৬ : ১৭) এ সম্পর্কে য়ায়েদ ইবনে সাবিত বলেন, তিনি ওহি বা কুরআনের বাণী লেখক ছিলেন। ওহি অবতীর্ণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খুব কষ্ট পেতেন। তাঁর শরীর হতে প্রচুর ঘাম ঝরতো। তিনি স্বাভাবিক হলে য়ায়েদ জম্বুর ঘাড়ের অস্থি অথবা অন্য কোনো টুকরা নিয়ে হাজির হতেন। তাঁর লেখায় কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এরপর তিনি তা সবার সামনে হাজির করতেন। এভাবে পূর্ণাঙ্গ কুরআন তিনি লিপিবদ্ধ করান। (ইউসুফ, ১৯৮৪ : ৬৪) পরবর্তীতে এগুলো গ্রন্থাবদ্ধ করার তাগিদ অনুভূত হয়।

খলিফা হযরত আবু বকর (রা:)-এর শাসনামলে হিজরি দ্বাদশ সনে ভন্ড নবি দাবিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ অথবা ৫০০ কুরআনে হাফিজ শহীদ যান। (তাকি, ১৯৯৩ : ১৮১) এতে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে খলিফা কুরআন সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব করেন এবং হযরত য়ায়েদ বিন সাবিতকে লিখিত কুরআনের অংশগুলোকে (প্রস্তরখণ্ড, খেজুরের ডাল বা যেখানে যেভাবে কুরআন লিখিত ছিলো) একত্রিত করণের নির্দেশ দেন। হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত কুরআনের সংরক্ষণের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে খলিফার সেই আদেশ প্রতিপালন করেন। তিনি লিখিত কুরআনের সকল অংশ একত্র করে তা হাফিজদের অন্তঃকরণে রক্ষিত কুরআনের সাথে মিলিয়ে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করেন। শিক্ষিত ও কুরআনে হাফেজ হযরত হাফসা (রা:)-এর নিকটে এ গ্রন্থাবদ্ধ কুরআন গচ্ছিত থাকে। (ইউসুফ, ১৯৮৪ : ৭০)

ঐক্যবদ্ধ আরবজাতি স্বল্পকালের মধ্যে ইরান, রোম, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি অনারব অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে কুরআন উচ্চারণে বিভিন্নতা দেখা দেয়। খলিফা ওসমান (রা:) তা জানতে পেরে এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইরাকের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে কুরআনে যের, যবর বা হরকাত সংযুক্ত করে উচ্চারণগত ত্রুটি দূর করা হয়। (ইবনে হাজার, ২০০০ খ্রি: : ৬৭৮) এ কুরআন হযরত হাফসা (রা:) এর নিকটে রক্ষিত কুরআনের সাথে মিলিয়ে তার কপি তৈরী করে সমগ্র সাম্রাজ্যে তা বিতরণ ও ত্রুটিযুক্ত কুরআন পুড়িয়ে ফেলা হয়। তাই বিশুদ্ধ কুরআনের সংরক্ষণে তাঁর দায়িত্বশীলতা ও বিশ্বস্ততা সর্বজন স্বীকৃতি পায়।

কুরআন ও হাদিস শিক্ষাদান

এ সময়ে মক্কা, মদিনা, ইয়েমেন, বাহরাইন, ওমান ও সিরিয়া, বাগদাদ প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো। শিশুদের জন্য প্রাথমিক মক্তব, বড়দের জন্য মসজিদ চত্বর ও সাহাবিদের বাসগৃহে ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে কুরআন শিক্ষাদান চলতে থাকে। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু ছিলো পবিত্র কুরআন-হাদিস, বিশুদ্ধ আরবি ভাষা, বিদেশী ভাষা হিসেবে ফারসি, হিব্রু, ল্যাটিন, রোমান ভাষা ইত্যাদি। একই সাথে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে পবিত্র কুরআন-হাদিস সংরক্ষণ, প্রচার ও শিক্ষাদানের রীতি পদ্ধতিও শেখানো হতো। এ শিক্ষা পদ্ধতি মানুষের মনোজগতে আলোড়ন তোলে। (সান্তার, ২০০৪ : ৬৪) নতুন ইসলামী সমাজের জনগণ স্রষ্টার পরিচয়, নিজেদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করার জন্য হাজারো

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। হযরত হাফসা (রা:) এ সময়ে একজন শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি বিশুদ্ধ আরবি ভাষা জানতেন ও অন্যদেরকে কুরআন শিক্ষাদান করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর নিকটে এসে জানতে চাইল, রাসূল (সা:) কীভাবে আল-কুরআন পাঠ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, তিনি এক একটি আয়াত পৃথক করে পড়তেন। তারপর তিনি নিজেই কিছু আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দেন। (মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৬৭ : ৩১৩) হযরত হাফসা (রা:)-এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাফিয়া বিনতে আবু উবায়দা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, সাওয়া আল খুযাই, আল-মুসায়িব ইবনে রাফে প্রমুখগণ। (আয জাহাবি, ১৯৭০ : ২২৮) তিনি আল-কুরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি হাদিস প্রচারেও ভূমিকা পালন করেন। পিতা ও স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নিকট হতে শুনে তিনি মোটামুটি ৬০টি হাদিস বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর হতে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে ৬টি বুখারি শরীফে স্থানলাভ করেছে। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ১৮৫)

রাজনৈতিক বিচক্ষণতা

হযরত হাফসা (রা:) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে যান তা ছিলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হযরত আলি (রা:)-এর শাসনামলে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। (Wellhausen, 1927 : 90) এ যুদ্ধের পর দুমাতুল জান্দালে^{১৫} (লুৎফর, ১৯৯৭ : ৬৫) সালিস-মীমাংসার সময়ে হযরত হাফসা (রা:) ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ সালিশকে হাফসার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) একটি ফেতনা-ফাসাদ মনে করে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে চাইলে হযরত হাফসা (রা:) তাকে এই বলে বোঝান যে, এ সালিশ হতে আবদুল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে কোনো ফায়দা অর্জন করতে না পারলেও তার অংশগ্রহণ জনগণের জন্য হিতকর হতে পারে। কারণ, মানুষ তার মতামতের অপেক্ষায় থাকবে। এমনও হতে পারে সে যদি দূরে থাকে তবে তাদের জন্য বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। (ফাতেমা, ২০০৬ : ১৮৮)

^{১৫} দুমাতুল জান্দাল একটি স্থানের নাম। স্থানটির নাম ইতিহাসে আবরুহ বলেও উল্লেখিত আছে।

দানশীলতা

হযরত হাফসা (রা:) দানশীলতার বহু দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি পৈতৃক সূত্রে গাবা নামক স্থানে যে ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তা মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে যান। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ১৯০)

পরিশেষে বলা যায়, তাঁর প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কারণে নবগঠিত মুসলিম সমাজ বহুবিধ উৎকর্ষা, উদ্ভিগ্নতা হতে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলো। ইসলামি আদর্শ ও সংস্কৃতির গতিশীলতা অব্যাহত রাখতে হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা:)-এর প্রত্যক্ষ অবদান ছিলো। তিনি স্বামী রাসুল (সা:) কে ভয় পেতেন না। অথচ পূর্বে নারীরা স্বামীর সাথে ভীত শংকিত হয়ে জীবনযাপন করতো। (বুখারি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-১৯৬) তাই মহানবী (সা:) কর্তৃক অঙ্কুরিত বীজ বা আদর্শকে সুসংহত করার কাজে সহযোগিতা দানের মাধ্যমে তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এই মহান নারী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৪৫ হিজরি মোতাবেক ৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৫৯ অথবা ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যবরণ করেন। মদিনায় জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (Ibn Saad, 1995 : 330)

হযরত উম্মে সালমা (রা:) (জন্ম তারিখ অজ্ঞাত ও মৃত্যু ৬৮৫ খ্রি:)

সমাজ সংস্কারে তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের অপর একজন নিবেদিত মহৎপ্রান নারী হলেন হযরত উম্মে সালমা (রা:)। তিনি সমাজের হিতসাধনে আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত উম্মে সালমা (রা:)-এর জন্মস্থান ছিলো মক্কা। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের বনি মাখযুম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। (নাসির, ১৯৯৮ : ১৪৬) তাঁর প্রকৃত নাম হিন্দ হলেও তিনি উম্মে সালমা নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আবু উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-মাখযুম। সমাজে তিনি ‘আবু উমাইয়া’ নামে পরিচিত ছিলেন। (বালায়ুরি, ১৯৩৭ : ৪২৯) উম্মে সালমার পিতা মক্কার একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে কোথাও বের হলে সকলের খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। তাঁর এই উদার স্বভাবের কারণে তাকে ‘যাদুর রাকিব’ বলা হতো যার বাংলা অর্থ হলো ‘কাফেলার পাথেয়’। (ইবনে হাজার, ১৯৭৭

: ৪৫৮) এহেন পিতার সন্তান ছিলেন উম্মে সালমা। তাঁর মাতার নাম ছিলো আতিকা বিনতে আমের। তদানীন্তন মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবু তালিব ও হযরত আব্বাস (রা:) ছিলেন উম্মে সালমার মামা। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ২০২) তাঁর বিবাহ হয়েছিলো মক্কার প্রসিদ্ধ বনু মাখযুম গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল আসাদ আল-মাখযুমীর সাথে। তাঁরা রাসূল (সা:) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্বে মুসলমান হন। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ৪৫৮)

বাস্তুভিটা ত্যাগ

হযরত উম্মে সালমা (রা:) হলেন সেই নারী যিনি সর্বপ্রথমে নারীদের মধ্যে স্বদেশভূমি মক্কা হতে মদিনায় ঐতিহাসিক হিজরত করেছিলেন। সময়টা ছিলো ৬২২ খ্রি:। আল্লাহর একত্ববাদের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি স্বামীসহ সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলদের তীব্র রোষানলে পতিত হন। তিনি পরিবারসহ শত্রুদের চরম অত্যাচারের কারণে ‘শিয়াবে আবু তালিবে’ গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ১৯২) তাঁরা হাবশাতেও হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে মক্কায় তাঁদের উপর অত্যাচার তীব্রতর হলে তাঁরা মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আবু সালামাকে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকেরা এই বলে বাধা দেয় যে, যে উটে করে তাঁরা মদিনায় গমন করবে তা তাদের পুরো পরিবারকে বহনে অক্ষম। অগত্যা স্ত্রী-পুত্রকে মক্কায় রেখে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ কামনায় আবু সালামা মদিনায় একাকী চলে যান। কিন্তু বিষয়টি আবু সালামার গোত্রের মধ্যে জানাজানি হয়ে পড়লে তাঁরা খুব অসন্তুষ্ট হয় আবু সালামার স্ত্রীর গোত্রের প্রতি। তাঁরা উম্মে সালমার পিতৃকুলের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, যেহেতু তাঁরা তাদের মেয়েকে স্বামীর সাথে যেতে দেয়নি সেহেতু তারাও তাদের বংশের সন্তানকে আবু সালামার শ্বশুর গোত্রে রাখবে না। তাঁরা গিয়ে জোর করে শিশুপুত্রটিকে তাঁর মায়ের নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়। (নাসির, ১৯৯৮ : ১৪৭)

এভাবে স্বামী-পুত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উম্মে সালমা মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙে পড়েন। তাদেরকে আর কাছে পাবেন কিনা সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা থাকলো না। তিনি শোকে দুঃখে প্রতিদিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী একটি টিলার উপরে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন। এভাবে এক সপ্তাহ চলে গেল। অবশেষে

তঁার এ মানসিক বিপর্যয় লক্ষ্য করে তঁার পিতৃবংশীয় এক সহৃদয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় তিনি স্বামীর গোত্র হতে সন্তান ফিরে পান, মদিনায় গমনেরও তঁার অনুমতি মেলে। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ১৯২)

কিন্তু তঁার গোত্র ইসলাম গ্রহণ না করায় তাঁদের কেউই তাকে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল না। সে যুগের দুর্গম মরুপথে এই অসম সাহসী নারী একাকী শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে একটা উটের পিঠে চড়ে মদিনার পথে যাত্রা শুরু করেন। তিনি যখন তান'ইম নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন হযরত 'উসমান ইবনে আবি তালহা' উম্মু সালামার একাকী যাত্রা দেখলেন এবং তাকে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২০০৭ : ১৬৯) এত কষ্টের পর মদিনায় হিজরতের পর স্বামীর সাথে তিনি খুব বেশিদিন একত্রে থাকতে পারেননি। অচিরেই কাফেরদের সাথে মুসলমানদের উল্লেখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে স্ত্রীর উৎসাহে আবু সালামা অংশগ্রহণ করেন। অসীম সাহসিকতার সাথে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও এক পর্যায়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। এ আঘাতজনিত কারণেই পরবর্তীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর শোকে কাতর উম্মে সালামাকে রাসূল (সা:) এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, “দোআ করো আর বলো-আল্লাহ যেন আমাকে তঁার চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প দান করেন।” (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ২০৩)

স্বামীর মৃত্যুতে উম্মে সালামা (রা:) নিরাশ্রয় হয়ে পড়লে হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। এতে উম্মে সালামা প্রথমদিকে সম্মতি প্রকাশ না করলেও পরবর্তীতে রাজী হন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ৬ষ্ঠ স্ত্রী। রাসূল (সা:) উম্মে সালামাকে ইতিপূর্বে বিগত অপর স্ত্রী যয়নাব বিনতে খুযায়মার ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেন। মহানবি (সা:)-এর স্ত্রী হিসেবে তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। (মাবুদ, ২০১৪ : ২৩৬)

কুরআন-হাদিস শিক্ষাদানে

হযরত উম্মে সালামা (রা:) সুমিষ্ট ভাষায়, চমৎকারভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। রাসূল (সা:) এর স্ত্রীদের মধ্যে জ্ঞান-গরিমায় হযরত আয়শা (রা:)-এর পরেই তার স্থান বিবেচিত হয়। তিনি সর্বমোট ৩৭৮টি হাদিস বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস হতে সহীহ বুখারিতে ৪৮টি, সহীহ মুসলিমে ৩৯টি,

জামি'আত-তিরমিযীতে ৩৯টি, সুনান আবি দাউদে ৫০টি, সুনান আন-নাসাইতে ৬৮টি এবং সুনান ইবনে মাজাহতে ৫২টি হাদিস স্থান পেয়েছে। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ২১০)

অত্যন্ত মেধাবী হযরত উম্মে সালমা (রা:) প্রতিটি মুহূর্তে রাসূল (সা:) কে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর বসবাসের ঘর মসজিদসংলগ্ন থাকায় তিনি মসজিদ হতে রাসূল (সা:)-এর প্রদানকৃত বক্তব্য শুনতে পেতেন। একদিনের ঘটনা রাসূল (সা:) সবেমাত্র বলেছেন, “হে লোক সকল, এটি শুনেই উম্মে সালমা (রা:) নিজের মাথার চুল আচড়ানো ফেলে রাসূল (সা:) কী বলবেন তা জানার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। গৃহের অন্যেরা একটু অবাক হলে তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমরা কি লোক সকলের অন্তর্ভুক্ত নই? (আয যিকিরলী : ১৯৯৮ : ২১৮)

বিধবা নারীর পুনঃবিবাহ বিষয়ে তাঁর বর্ণিত হাদিস

তখনকার সমাজে নারীর জীবনে সবচেয়ে বেশি দুর্গতি নেমে আসতো যদি সে বিধবা হতো। বিধবা নারীরা নিগৃহীত হতো নানানভাবে। সৎপুত্ররা পর্যন্ত বিধবা মাকে বিবাহ করতো যা ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভগ্নী কন্যা, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধভগিনী, স্বাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গম হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে থাকে। তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গম না হয়ে থাকে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্রে বিবাহ করা ; কিন্তু যা পূর্বে হয়ে গিয়েছে, সেই জন্য আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা নিসা, আয়াত নং ২৩) হযরত হাফসা (রা:) বিধবাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। এ সম্পর্কে তিনি রাসূল (সা:) এর অসংখ্য বাণী আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়ে যান।

হযরত উম্মে সালমা (রা:) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুরাইয়া নামে আসলাম গোত্রের এক মহিলার স্বামী মারা যায়, সে ছিলো অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর গর্ভপাত হওয়ার পর আবুহু ছানাবিল ইবনে বা'ক্বাক নামক এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে বিবাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। তখন লোকটি বলে, আল্লাহর কসম! দু'ইদতের শেষ ইদত অর্থাৎ চার মাস দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া

পর্যন্ত তোমার বিবাহ করা ঠিক হবে না। মহিলাটি দশদিন পরে রাসূল (সা:)-এর নিকটে এসে এসব জানালো। তখন রাসূল (সা:) বলেন : তুমি বিবাহ করতে পারো। (বুখারি, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং-২০৩৭)

দাম্পত্য জীবন ঘনিষ্ঠ মাসআলা বর্ণনা

মানুষ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জাবোধ করে। হযরত হাফসা (রা:) হযরত আয়শা (রা:)-এর মতো এ সংক্রান্ত গোপন বিষয়গুলো অকাতরে প্রকাশ করে গেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, সোলায়মান ইবনে ইয়াসার উম্মে সালমা (রা:) কে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কেউ ভোরে স্ত্রী সহবাস করে বা নাপাকী হয়ে যায় সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারবে কিনা? উম্মু সালমা (রা:) উত্তরে বললেন, রাসূল (সা:) ভোরে জ্বনুবী (অপবিত্র) হয়ে উঠলেও ঐ দিন রোযা রাখতেন। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫৪)

একদিন এক মহিলা এসে হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার চুল খুব ঘন ও খোপা বড় হয় সে কি স্বামী সঙ্গম হতে পবিত্র হওয়ার জন্য চুল কমিয়ে ফেলবে? উত্তরে রাসূল (সা:) বললেন, তিনবার চুলের গোড়ায় পানি ঢেলে দেওয়াই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (সুনান আবি দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৯)

নারীগণের হায়েয-নেফাস হতে পবিত্রতা অর্জন বিষয়ক মাসআলা বর্ণনা

পবিত্র হজ্জ্বত পালনের সময় নারীদের ঋতুশ্রাব হলে তাদের করণীয় সম্পর্কে তিনি আরও কিছু নতুন তত্ত্ব দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই হজ্জ পালনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময়ে নারীরা কীভাবে হজ্জের আহকাম পালন করবে রাসূল (সা:) এর নিকটে জানতে চাইলে তিনি বললেন, সওয়ার আরোহিণী হয়ে লোকদের পিছনে পিছনে তুমি তাওয়াফ করো। তিনি এভাবে তাওয়াফ করলেন, আর রাসূল (সা:) কাবাগৃহের পার্শ্বে সূরা তুর পাঠ করে নামাজ পড়েছিলেন। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৪১৩ ; সুনান আবি দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৯)

সামাজিক সমস্যা নিরসনে তাঁর বর্ণিত হাদিস

হযরত উম্মে সালমা (রা:) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (সা:)-এর গৃহের দরজায় একদল কলহকারী এসে উপস্থিত হলো। রাসূল (সা:) এ কলহ থামাতে গিয়ে দেখলেন, তাদের একেকজন অন্য জনের চেয়ে বেশি

কলহ করছে। রাসূল (সা:) সঙ্গত মনে করে একদলের পক্ষে রায় দিয়ে দেন ও বলেন, কোনো মুসলমানের অধিকার হরণ করে কারো পক্ষে রায় চলে গেলে, তার জানা উচিত সেটা হলো দোজখের আগুনের একটা টুকরা। সে ইচ্ছা করলে সেটা বহনও করতে পারে, আবার ত্যাগও করতে পারে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৪) এ হাদিসে সামাজিক সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

হযরত উম্মে সালমা (রা:) বলেন, আমি একদিন রাসূল (সা:)-এর নিকটে বসেছিলাম। সেখানে রাসূল (সা:)-এর অপর স্ত্রী মায়মুনাও (রা:) ছিলেন। ইবনে উম্মে মাকতুম নামক এক ব্যক্তি সেখানে আসলো। রাসূল (সা:) বললেন, “তোমরা উম্মে মাকতুম হতে পর্দা করো। আমরা বললাম : হে রাসূল (সা:) তিনি তো অন্ধ আমাদেরকে উনি দেখছেন না, চিনতেও পারছে না। রাসূল (সা:) বললেন : তোমরাও কি অন্ধ, তোমরাও কি তাকে দেখছো না? (সুনান আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৬৩) পোশাক পরিচ্ছেদের চেয়ে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে এ শিক্ষাও আমাদেরকে দিয়ে গেছেন।

রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে তাঁর বিচক্ষণতা

হযরত উম্মে সালমা (রা:) দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি জাতীয় দুর্যোগে এগিয়ে এসে মুসলিম জাতিকে শক্তিশালী করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। বিশেষত হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পরে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করে তিনি বিভিন্ন দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত হতে সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করতে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করেন। (মাবুদ : ২০১৪, ২৩৭) ঘটনাটি ছিলো : রাসূল (সা:) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করার দীর্ঘ ৬ বছর পর ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে (৬ষ্ঠ হিজরিতে) মদিনা হতে মক্কায় চৌদ্দশ’ত সাহাবি ও ৭০টি উট নিয়ে মাতৃভূমি মক্কা দর্শন ও আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য মক্কার দিকে যাত্রা করেন। মক্কার কুরাইশরা এ সংবাদ পেয়ে জিলকদ ; মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য লোক প্রেরণ করে। রাসূল (সা:) এ সংবাদ শুনে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। পরবর্তীতে উক্ত স্থানে রাসূল (সা:)-এর সাথে বিরোধী পক্ষের একটি সন্ধি হয়। স্থানের নামানুসারে এটিকে ‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’ বা ‘জাতীয় মিত্রতা সৃষ্টিকারী’ সন্ধি বলা যেতে পারে। (Wellhausen, 1927 : 119) এ সন্ধিতে উল্লেখ

করা ছিলো মুসলমানরা আর এবার মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সন্ধির আরও কিছু অবাঞ্ছিত শর্তের কারণে সাহাবীদের মনে তীব্র আঘাত লাগে। ফলে মুসলমানদের মনে বিষন্ন ভাব জাগ্রত হয়। রাসূল (সা:) নিজেদের সাথে কুরবানির নিয়তে আনা উটগুলো ঐ স্থানেই কুরবানি করতে সকলকে নির্দেশ দেন। কিন্তু কারও মধ্যেই নির্দেশ পালনের ইচ্ছা দেখা গেল না। তিনবার বলার পরেও কেউ নিজ স্থান হতে উঠলেন না। ঐ সফরে হযরত উম্মে সালমা (রা:) রাসূল (সা:)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা:) তাঁবুতে গিয়ে হযরত উম্মে সালমা (রা:) কে সব খুলে বললে তিনি পরামর্শ দিলেন আপনি বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে স্বয়ং নিজে কুরবানি করুন এবং ইহরাম ত্যাগের নিয়তে মাথার চুল কেটে ফেলুন। তিনি বাইরে এসে তাই করলেন। এটা দেখে সাহাবিগণ নিজ নিজ কুরবানি করেন ও মাথার চুল কাটেন। (বুখারি, ১ম খণ্ড, ৩৮০ ; ইউসুফ, ১৯৮৩ : ১৫৪) তাই প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়েও নিজ পক্ষের অনুসারীদের মধ্যে একটি সহিষ্ণুতার মনোভাব জাগিয়ে তুলে একটি অপরিহার্য দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ হতে তিনি জাতিকে রক্ষা করেছিলেন। এই মহান নারী ৬৩ হিজরি সনে বা আনুমানিক ৬৮৫ খ্রি: ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়ার খিলাফতে মৃত্যুবরণ করেন। (মাবুদ, ২০১৪ : ২৪৮)

মক্কার উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান (রা:) (জন্ম ৫৯২ খ্রি:-মৃত্যুসন অজ্ঞাত)

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান আনুমানিক ৫৯২ খ্রি: মক্কায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিলো রামলা। (তালিবুল, ১৯৯০ : ৬৮) তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কুরাইশ নেতা ও সমর নায়ক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাশাপাশি একজন শক্ত মনের ও মেজাজী মানুষ হিসেবেও লোকে তাকে ভয় করে চলতো। উম্মে হাবিবার মাতার নাম ছিল সাফিয়া বিনতে আবিল। উম্মে হাবিবা সমাজে রূপলাবণ্য ও বংশ-গরিমার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান কন্যার জন্য গর্ব করে বলতেন, ‘আমার নিকটে রয়েছে সারা আরবের শ্রেষ্ঠ লাভণ্যময়ী নারী’। (নাসির, ১৯৯৮ : ১৬৫) তিনি বহু অনুসন্ধানের পর বনু আসাদ গোত্রের সুদর্শন যুবক আবদুল্লাহ ইবনে

জাহাশের সাথে কন্যার বিবাহ দেন। এই আবদুল্লাহ ছিলেন মহান নারী যায়নাব বিনতে জাহাশ-এর ভাই।
উম্মে হাবিবা ও আবদুল্লাহর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ)

উম্মে হাবিবা (রাঃ)-কে আজীবন নানা বাধা ও বিপত্তি, বিপদাপদ অতিক্রম করতে হয়েছিল। তিনি যে চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন প্রথমদিকে এর বিপক্ষে ছিলো তাঁর পুরো পরিবার। শুধু বাধাবিঘ্নই নয়, তাকে আরও কঠিন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়েছিলো।

পারিবারিক বাধা উপেক্ষা

হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) স্বামীসহ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়েই মুসলমান হন। কিন্তু এরপরে তাঁরা আর শান্তিতে থাকতে পারেননি। তিনি একজন তেজস্বি ব্যক্তির কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সত্যকে অনুধাবন ও স্বামীসহ সে পথে চলার কারণে অন্যান্য পরিবারের মতো বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতনের কবলে পড়েন। মক্কায় ইসলাম ধর্মের শত্রুদের খুব প্রভাব ছিলো।

তাঁর পিতৃপরিবার পর্যন্ত সদ্য ইসলামে দীক্ষিতদের জন্য আতঙ্কস্বরূপ ছিলো। তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয় পর্যন্ত চরম ইসলাম বিদ্বেষী ছিলো। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের আরেক স্ত্রীর নাম ছিলো হিন্দা বিনতে উতবা। মুসলমানদের উপর হিন্দার এতই আক্রোশ ছিলো যে ৬২৫ খ্রি: সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে সে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আপন চাচা হযরত হামযার কলিজা চিবিয়েছিল, যদিও হিন্দা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। (মাহমুদুল, ২০১২ : ৩১৪) হিন্দার গর্ভজাত সন্তান ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে ৬৬১-৭৫০ খ্রি: পর্যন্ত স্থায়ী উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)। এই মু'আবিয়ার (রাঃ) পুত্র ইয়াজিদ ইসলামের ইতিহাসকে কলুষিত করেছিলো। সে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদরের নাতী ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলির পুত্র ইমাম হুসাইনকে কারবালায় শহীদ করেছিলো। (মাহমুদুল, ১৯৯০ : ৩৩৫) তাই বিখ্যাত আমীর মু'আবিয়া হলেন উম্মে হাবিবার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ৩০৫) এহেন পরিবারের সন্তান হিসেবে উম্মে হাবিবার চলার পথ যে কত বন্ধুর ছিলো তা বলাই বাহুল্য।

পরিবারে আদর্শ প্রতিষ্ঠা

উম্মে হাবিবা প্রিয়তম স্বামীকে ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধতার পথে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। (Ibn Saad, 1995 : 321) ইসলাম ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ বলে আবদুল্লাহকে তা ছাড়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। প্রাক-ইসলামি আরবের প্রসিদ্ধ কবি তরফা রচিত কাব্যে (সাব-আ-মুয়াল্লাকাত) ইসলাম-পূর্ব আরবের সম্পদশালী ব্যক্তিদের বিলাসিতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন, ‘যদি তুমি আমাকে তালাশ করো তবে আমাকে পাবে জনসমাগমে-জুয়ার আড্ডায় অথবা পানশালায়। আমার স্বেপার্জিত ও উত্তরাধিকারসূত্রেপ্রাপ্ত ধন-সম্পদ আমি সুরা পান ও আনন্দ উল্লাসে সর্বদা খরচ করি। যুদ্ধে আমি উপস্থিত হই, জীবনকে প্রাণভরে ভোগ করি আমি। এ কারণে যারা আমাকে তিরস্কার করে তাদের আমি জিজ্ঞাসা করি, তারা কি আমাকে চিরঞ্জীব করতে পারবে?’(সাব-ই মু’য়াল্লাকাত এর অংশবিশেষ) এই কঠিন অবস্থা হতে তিনি তাঁর স্বামীকে উপরে বর্ণিত অনাচারগুলো হতে বিরত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

স্বদেশ ত্যাগ

মক্কার ইসলামের অনুসারীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু হলে উম্মে হাবিবা স্বামী আবদুল্লাহসহ জীবন রক্ষার্থে মক্কা হতে হাবশায় চলে যান। এখানেই তার মেয়ে হাবিবা জন্মগ্রহণ করে। (মাবুদ, ২০১৪ : ২৭৯) অন্যমতে, মক্কায় থাকাকালীন সময়েই তাদের কন্যা হাবিবা জন্মগ্রহণ করে। তবে হাবশাতে (বর্তমানের ইথিওপিয়া) হাবিবা জন্মগ্রহণ করেছিলো এই মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করা হয়। মেয়ের নামেই তিনি উম্মে হাবিবা উপনামে পরিচিত হন। (বালায়ুরি, ১৯৩৭ : ৪৩৮) কিন্তু তাঁর জীবনের দুঃখজনক ঘটনা হলো হাবশায় অবস্থানকালে তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে যে নির্যাতন তাদের উপর নেমে এসেছিল তা সহ্য করার মতো মানসিকতা তৈরী করতে সে ব্যর্থ হয়। উম্মে হাবিবা ইসলামের উপর অটল থাকেন। বিদেশে বিভূয়ে আবদুল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেন। এর ফলে তিনি একজন মর্যাদাসম্পন্ন নারী হওয়া সত্ত্বেও একাকী বিদেশে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হন। এদিকে আবদুল্লাহ পুনরায় মদ খাওয়া শুরু করে ও অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তার অকাল মৃত্যু ঘটে। (তফাজ্জল ও হোছাইন, ১৯৯৮ : ৯৭৮) হাবশায় কন্যাকে নিয়ে নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় পতিত উম্মে হাবিবাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-হিজরি ৬ বা ৭ সনে আকদ

করেছিলেন। তখন উম্মে হাবিবার বয়স ছিলো ৩৬ অথবা ৩৭ বছর। (বালায়ুরি, ১৯৩৭ : ৪৩৯) মদিনায় ফিরে আসার পর তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়।

উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান একজন ধনী কন্যা ও বিত্তশালী স্বামীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সকল অশুভ, অসত্য ও অনাচার নির্মূল করার আশায় জীবনে যাবতীয় স্বাদ-অহ্লাদ পরিত্যাগ করেছিলেন। দীনহীনের বেশে মক্কায় প্রচারিত নব আদর্শে দিক্ষীত হয়ে যেভাবে যুগ চাহিদা পূরণে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা অনন্তকালের জন্য মানবজাতির অনুপ্রেরণার উৎস। এমনকি তাঁর স্বামী মতাদর্শ পরিবর্তন করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও নিপীড়িত মানবতার মুক্তির পথ হতে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি। তাই সমাজ উন্নয়নে তাঁর অবদান অসাধারণ, অবিস্মরণীয় ও শিক্ষণীয়। উম্মে হাবিবা ধর্মীয় বিষয়েও শিক্ষাদান করে গেছেন। আপন ভাই মু'য়াবিয়ার (রা:)-এর শাসনামলে আনুমানিক ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তবে তাঁর জন্মতারিখ জানা যায়নি। (তফাজ্জল ও হোছাইন, ১৯৯৮ : ৯৯১) সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর আত্মত্যাগ এক নজিরবিহীন ও সাহসিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

মায়মুনা বিনতে আল-হারিস (রা:) (জন্ম ৫৯৪ খ্রি: ও মৃত্যু ৬৭১ খ্রি:)

মায়মুনা বিনতে আল-হারিস আরবের মক্কায় বিখ্যাত কুরাইশ বংশে আনুমানিক ৫৯৪ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামাতা ছিলেন যথাক্রমে হারিস ইবনে হালালা এবং হিন্দা ইবনে আওফ। (Ibn Saad, 995 : 267) আরবে তাঁর পিতৃ পরিবারের সুনাম ছিলো সুবিদিত। বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে তাঁর একাধিক ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিলো, যারা সেই সময়ের পুরাতন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামে আত্মনিবেদিত ছিলেন। তাঁর এক বোন উম্মুল ফাদল লুবাবা আল কুবরার সাথে মক্কায় বিখ্যাত ব্যক্তি হযরত আব্বাস (রা:)-এর বিবাহ হয়েছিলো। তাঁর 'আসমা বিনতে উমাইস' নামীয় ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিলো হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর প্রিয় চাচা আবু তালিবের পুত্র জাফর এর সাথে। মৃত্যুর যুদ্ধে জাফর ইবনে আবু

তালিব-এর মৃত্যু ঘটলে আসমা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। (বালায়ুরি, ১৯৩৭ : ৪৪৪) তাদের সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক যিনি হযরত আয়শা (রাঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। পরে এই আসমাকে হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ করেছিলেন। (মাবুদ, ২০১৪, ২৮৭) তাঁর অপর এক বোন সালমা বিনতে উমাইস ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা হযরত হামযার স্ত্রী। (বালায়ুরি, ১৯৩৭ : ৪৪৫-৪৪৬ ; ইবনে আবদিল বার, ১৯৮৫ : ৪০৭) এরা সবাই তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নী ছিলেন।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত মায়মুনা বিনতে আল-হারিস

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ছিলেন এমন একজন নারী যিনি আরব সমাজে বিদ্যমান দীর্ঘদিনের পুরানো নিয়ম-কানুন, নিষ্ঠুরতা, নানাবিধ কুসংস্কার, অজ্ঞতা, হীনতার বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় ৭ম শতকে যে সংগ্রাম চলছিলো তাতে অপরিসীম ঝুঁকি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সংগ্রাম

মায়মুনার প্রথম বিবাহ মাসউদ ইবনে আমর ইবনে উমায়েরের সাথে হয়। কিন্তু এ বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে আবু রেহম ইবনে আবদুল উযযা-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। হিজরি ৭ম সনে অর্থাৎ ৬২৮ খ্রিঃ আবু রেহম ইন্তেকাল করেন। (আসির, ১৯৯৬ হিঃ : ৫৫০) পরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু আব্বাস (রাঃ) ইবনে আবদিল মুত্তালিব মায়মুনা (রাঃ)-এর সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি মত দেন। পরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ওমরাহ হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে হিজরি ৭ম সনের জিলকাদা মাসে ৫০০ দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে মায়মুনাকে বিবাহ করেন। (আসির, ১৯৯৬ : ৫৫০) রাসূল (সাঃ) উমরা হজ্জ করার পরে তার সাথে মায়মুনা (রাঃ)-এর সাংসারিক জীবন শুরু হয়।

শিক্ষাদান

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তাঁর নিকটে সাধারণ জনগণ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতো। তিনি হাসিমুখে এ দায়িত্ব পালন করতেন। সাধারণ নারীরা ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শের জন্য তার নিকটে আসলে তিনি তাদের শরিয়ত মোতাবেক পরামর্শ প্রদান করতেন। (আলাউদ্দিন, ১৯৮৫ : ১৩৮) একবার মদিনার জনৈক এক মহিলা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়ত করলো, আল্লাহ যদি তাকে

সুস্থতা দান করেন, তবে বায়তুল মাকদাস-এ গিয়ে সে নামায আদায় করবে। সে সুস্থ হয়ে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বের হবার পূর্বে মায়মুনা (রাঃ)-এর নিকটে বিদায় নিতে আসলো। মায়মুনা (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অন্যান্য মসজিদে মামায পড়ার চেয়ে মসজিদে নববীতে নামায পড়ার সওয়াব হাজার গুণ বেশি। তুমি এ মসজিদেই নামায পড়। (মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৬৭ : ৩৩২ ; ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ১৯৩)

মাদকের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান

আরবিয় সমাজে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর সবচেয়ে বড় অবদান ছিলো মাদকের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলা। ইসলাম ধর্মে মদপান নিষিদ্ধ। কিন্তু তা বন্ধ ও মানুষকে তা পানে বিরত রাখতে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্বের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। মানুষ তখন প্রকাশ্যে মদ্যপান করতো। বর্তমান সময়েও মাদকাসক্ততা এক ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। মানুষ ক্রমাগত এতে আসক্ত হয়ে পরিবার, সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তখনকার পৃথিবীতে এটা ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিলো। মানুষ মদ্যপান করে যে কোন জঘন্য কাজ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। এমনকি মদপান নিষিদ্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা মদ পান করে মসজিদে নামাযও আদায় করতে যেত। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ২৩২) এতে করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। মদ্যপায়ী কোনো ব্যক্তি মায়মুনার সম্মুখে আসলে তিনি এর প্রতিবাদ করতেন ও ধিক্কার জানাতেন। একদিন মদপান করে এক নিকটাত্মীয় তাঁর নিকটে এলে মুখ হতে মদের গন্ধ পেয়ে তিনি খুব রেগে গিয়ে তাকে বলেন, ভবিষ্যতে এভাবে কখনও আমার গৃহে আসবে না। (আয যিকিরলী : ১৯৮৯ : ২৩২) ; (Ibn Saad, 1995 : 360) তিনি শিক্ষাদানের সময় ছাত্রদের সামনে, বক্তব্যদানের সময় মদপানের বিরুদ্ধে খুবই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন।

তাই সমাজ হতে নিন্দনীয় কর্ম নির্মূলে মায়মুনা (রাঃ) যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা অনবদ্য। তাঁর মতো ব্যক্তির এগিয়ে এসেছিলেন বলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষে মদপান নিষিদ্ধ ও মানুষকে এর আসক্তি হতে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছিলো।

কুসংস্কার নির্মূল

এ সমাজের অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলো মানুষের মধ্যে বিরাজিত নানা কুসংস্কার। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনে তা তীব্র প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতো। মায়মুনা (রাঃ) একজন অনুভূতিশীল নারী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে হযরত আয়শা (রাঃ)-এর ন্যায় তিনিও তা প্রকাশ করে গেছেন যেন দাম্পত্য জীবনে মানুষ সেগুলো অনুসরণ করে। সেই যুগের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও অন্যের নিকটে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো প্রকাশ করে অতীব সাহসিকতা ও মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। এখনও এসকল বিষয়গুলো চিন্তা করতে, প্রকাশ করতে মানুষ লজ্জাবোধ করে। সে সময়ের অন্য একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা হযরত উম্মে হানি (রাঃ)-এর বর্ণনায় সে সবার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য ও বর্ণনাতেও মানুষের দাম্পত্য জীবনের একান্ত গোপন বিষয়গুলো উঠে এসেছে। যেমন তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ও তিনি নিজে গোসলের একই পাত্রে গোসল করতেন। (Ibn Saad, 1995 : 365)

দাম্পত্য জীবনে তখনকার পুরুষেরা স্ত্রী ঋতুবতী থাকলে তাদের ধারে কাছেও যেতো না। এ ধরনের কুসংস্কারে সমাজ ও পরিবারগুলো আচ্ছন্ন ছিলো। মায়মুনা (রাঃ) তাঁর ভাগ্নে ইবনে আব্বাসের জীবনে এ ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করে ব্যথিত হন ও তা পরিহারে উপদেশ দিয়ে যান। ঘটনাটি ছিলো : একবার কোনো প্রয়োজনে হযরত মায়মুনা (রাঃ) তাঁর এক দাসীকে ভাগ্নে ইবনে আব্বাসের বাড়িতে পাঠালেন। সে দেখল যে, ইবনে আব্বাস ও তাঁর স্ত্রী আলাদা আলাদা বিছানায় বসবাস করছে। সে ভাবলো যে, তাদের মধ্যে হয়তো বা কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু পরে শুনতে পায় যে, স্ত্রীর মাসিকের সময় ইবনে আব্বাস পৃথক বিছানায় চলে যান। ফিরে এসে সে ঘটনাটি তাঁর মনিবকে খুলে বললে সে দাসীকে বললো, যাও তাদেরকে গিয়ে বলো, তারা যেন এক বিছানায় শয়ন করে। এতেই তাদের মঙ্গল নিহিত। এ অবস্থায় রাসূল (সাঃ) কখনও তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য বিছানা গ্রহণ করেননি। (আলাউদ্দিন, ১৯৮৫ : ১৩৮ ; ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ৪১২) এ সব শিক্ষা অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় যাতে দাম্পত্য জীবনের বহু কল্যাণ নিহিত।

হাদিস প্রচার

হযরত মায়মুনা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) হতে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছিলেন। কারও মতে তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ছিলো ৪৬ টি বা অন্য কারও মতে ৭৬ টি। একজন গ্রহণযোগ্য রাবি হওয়াতে তাঁর বর্ণিত

সেই হাদিসগুলো হতে একটি বুখারি শরীফ ও পাঁচটি হাদিস মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনুস সাযিব প্রমুখ। (আয যিকিরলী : ১৯৮৯ : ২৩৯)

তাই বলা চলে, মানুষের মঙ্গল কামনায় হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম অমলিন হয়ে থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শুধু স্ত্রী হিসেবেই নয় বরং তার পার্শ্বে বন্ধুর মতো অবস্থান করেন তিনি। রাসূল (সাঃ)-এর প্রচারিত সেই আদর্শতে বক্ষে ধারণ করে তিনি যে কেবল তখনকার নারী সমাজকে প্রশিক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এমনটি নয়, বরং এখনও মুসলিম নারী সমাজকে তার দেখানো সেই পথ মুক্তির পথ দেখায়। এই মহান নারী ৬৭১ খ্রি: মক্কার সারফ নামক স্থানে ইশ্তেকাল করেন। এখানেই তাকে সমাহিত করা হয়েছিলো। (আবদিল বার, ১৯৮৫ : ৪৩০)

মদিনার জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (জন্ম আনু: ৬০৭ খ্রি:)

মদিনার মেয়ে জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস তাঁর সমাজকল্যানমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টীয় ৭ম শতকের প্রারম্ভে আনুমানিক ৬০৭ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেন। (Ibn Saad, 1995 : 380) তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বাররা। তিনি আরবের বিখ্যাত বনু খুযা'আ গোত্রের 'মুসতালিক' শাখার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হারিস ইবনে দিরার কন্যা ছিলেন। অসাধারণ গুণবতী ও রূপসী এই নারীর প্রথম বিয়ে হয়েছিল স্বগোত্রের 'মুসাফি ইবনে সাফওয়ান'-এর সাথে। (আসির, ১৩১৪ হিঃ : ৪২৫) প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। জুওয়াইরিয়া সমাজের

অগ্রগতিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন। এতদিন ধরে চলা জুলুম-নির্যাতন, বৈষম্য, অবিচার এবং অত্যাচারেও মুখ খুলতে পারেনি নারীরা। সকল অন্ধত্ব, কূপমণ্ডকতা ভেঙে জুওয়াইরিয়া স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর মূলে ছিলো নতুনভাবে সৃষ্ট সমাজে সদ্য প্রচারকৃত মানুষের স্বাধীনতার অধিকার যা হতে মানবতা এতদিন বঞ্চিত ছিলো। আল্লাহর ভাষায়, “যারা সৎকর্ম করবে ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতিদান বিন্দুমাত্র কম হবে না।” (সূরা নিসা, আয়াত নং ১২৪)

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে

তিনি প্রাথমিক জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করেন। তদানীন্তন সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে মানবতার অপমৃত্যু ঘটতো। তার স্বামী মুসাফি ইবনে সাফওয়ানের মৃত্যু ঘটে যুদ্ধ ময়দানে। প্রাচীনকালের মানুষের যুদ্ধের প্রবণতাকে বিশ্বে প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের বহুদিন পর্যন্ত বহন করতে হয়েছিল তবে এর পেন্ফাপট ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। সে সময়ে সমাজে এক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিলো। Scholar Armsstrong Karen এর মতে, “ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচার করার সাথে সাথে সমাজে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।” (Armsstrong : 1991, 97) মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর পিতৃগোত্র মদিনায় রাসূল (সাঃ) কর্তৃক গঠিত সরকারকে ক্ষমতা হতে উৎখাতের জন্য মদিনার নিকটে সৈন্য সমাবেশ করে। তখন হিজরি ৫ম সনের শাবান মাস মোতাবেক ৬২৬ খ্রি: চলছে। খবর পেয়ে রাসূল (সাঃ) শত্রুপক্ষকে দমন করতে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনু খুযাআ গোত্রের একটি পানির কূপের নাম ছিলো ‘আল-মুরাইসি’। মুসলিম বাহিনী এই কূপের নিকটে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলো বলে এই যুদ্ধ ইতিহাসে ‘বনু মুসতালিক’ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ২৬৫) এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে।

জুওয়াইরিয়া (রাঃ) তাঁর গোত্রের প্রায় ৬০০ নারী-পুরুষের সাথে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। এদেরকে দাস-দাসী হিসেবে ঘোষিত করে বন্টন করে দেয়া হয়। দাসী হিসেবে বুররা (জুওয়াইরিয়ার প্রাক্তন নাম) মুসলিম বাহিনীর নেতা সাবিত ইবনে কায়সের ভাগে পড়ে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী বুররা নিজেকে মুক্ত করার জন্য উপায় খুঁজতে থাকে। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী জুওয়াইরিয়াহ নিজের মুক্তির

জন্য সাবিত ইবনে কায়সের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে তদানীন্তন সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী চুক্তিপত্র বা ‘মুকাতাবা’ সম্পাদন করেছিলেন। (Ibn Saad, 1995 : 385) আর তাঁর প্রতি মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হযরত মুহাম্মদসহ (সা:) সাবিত ইবনে কায়সের সদাচরণ ও সম্মান দানের ফলে তিনি ইসলামি আদর্শের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। কেননা তখনকার সময়ে যুদ্ধে নারীরা চরমভাবে নির্যাতিত ও লাঞ্চিত হতো। এ বিশেষ কারণে কন্যা শিশুদেরকে আরবের কোনো কোনো গোত্র জন্মের পর পরই মেরে ফেলত। বুররা ইসলামি আদর্শে অনুরক্ত হয়ে মুসলমান হন। (Ibn Saad, 1995 : 387)

এর পরে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও তার মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহের জন্য কিছু সাহায্য চান। হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাকে বলেন, এর চাইতে উত্তম কোনো সহযোগিতা তোমার জন্য হতে পারে যদি তুমি তা সানন্দে গ্রহণ করো। আর তা হলো তোমার মুক্তিপণের যাবতীয় অর্থ আমি তোমাকে দিয়ে দেব এবং আমি তোমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। আকস্মিক এ প্রস্তাবে জুওয়াইরিয়া অবাক হলেও সানন্দে বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, রাসূল (সা:) যুদ্ধবন্দীর মুক্তির বিনিময়ে এ বিবাহের দেনমোহর পরিশোধ করেন। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ২৬২) হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র বিশ বছর। তিনি স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হন।

সামাজিক কল্যাণে এ বিবাহের প্রভাব ছিলো অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। খবরটি জানাজানি হয়ে গেলে মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই বলে উঠলেন, রাসূল (সা:)-এর শ্বশুরকুল এখন আর তাদের দাস-দাসী হিসেবে থাকতে পারে না। মুসলমানগণ বনু মুসতালিক গোত্রের প্রায় ৭০০ যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দিলেন। এভাবে একজন নারীর কল্যাণে যুদ্ধবন্দীরা দাসত্ব হতে মুক্ত হতে সক্ষম হলো। তাঁরা জীবনের স্বাধীনতা অর্জন করায় ইসলামে উদ্ধৃত হয় ও ইসলামে দীক্ষিত হয়। এ কারণেই হযরত আয়শা (রা:) বলেন, “আমি কোনো নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়া থেকে অধিকতর কল্যাণময়ী দেখিনি।” (আসির, ১৩১৪ হিঃ : ৪২০)

অল্পদিন পরেই তাঁর পিতা মক্কা হতে বেশ কিছু উট অর্থ সম্পদে পূর্ণ করে কন্যাকে উদ্ধারের জন্য রাসূল (সা:)-এর দরবারে হাজির হন। তিনি তখনও জানতেন না তার মেয়ে মুসলমান হয়েছে। এমনকি রাসূল

(সা:)-এর স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে। আর মদিনায় আসার পথে তিনি একটা কাণ্ড করেন, তা হলো তিনি যে সকল উট সাথে করে নিয়ে আসছিলেন তন্মধ্যে প্রিয় দু'টি উট ছিলো মদিনায় ঢোকার পূর্বে একটা উপত্যকার মধ্যে লুকিয়ে রেখে রাসূল (সা:) এর নিকটে আসেন। তারপর যখন তিনি নবীজীর সম্মুখে এক এক করে তার আনীত সকল মালামাল উপস্থাপন করতে থাকেন। তখন রাসূল (সা:) বলে ওঠেন, “ সেই উট দু'টি কোথায়, যাদেরকে তিনি আকীক উপত্যকায় লুকিয়ে এসেছেন। রাসূল (সা:)-এর কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হন। তিনি সাথে সাথে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান। আর নিজের কন্যার সকল কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন ও দেশে ফিরে যান। (তালিবুল, ২০০৪, ৬৩ ; আসির, ১৩১৪ হিঃ : ৪২০) হযরত আয়শা (রা:)-তার রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, “জুওয়াইরিয়ার মধ্যে মধুরতা ও বুদ্ধিমত্তা উভয় রকমের গুণই বিদ্যমান ছিলো। কেউ তাকে দেখলেই তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতেন।” (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ২৬২ ; মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৬৭ : ২৭৭ ; আসির, ১৩১৪ হিঃ : ৫২০)

তাই হযরত জুওয়াইরিয়া (রা:) মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর স্ত্রী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। একই সাথে স্বগোত্রের সকলের মুক্তিদানে ব্যবস্থা করেন। এমনকি পিতাকেও ইসলাম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে সমাজ কল্যাণে অবদান রাখেন। রাসূল (সা:) তাঁর স্ত্রীদেরকে মাসিক খরচাদি প্রদান করতেন। তিনি তাকে খায়বারের জমি হতে উৎপাদিত ফসল হতে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক গম বা যব মাসিক হারে প্রদান করতেন। (Ibn Saad, 1995 : 395) স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ইন্তেকালের পরও তিনি বহু বছর বেঁচে ছিলেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব হিজরি ৫০ সনে বা আনুমানিক ৬৭৪ খ্রি: মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর।

মহানবি (সা:)-এর স্ত্রী হওয়ায় হযরত জুওয়াইরিয়াহ (রা:) রাসূল (সা:) হতে গুরুত্বপূর্ণ হাদিসও বর্ণনা করে গেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারি একটি ও মুসলিম দু'টি হাদিস তাদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তিনি শিক্ষাদানেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো হযরত ইবনে আব্বাস, জাবির, উবাইদ ইবনে আস-সাবাক, তুফাইল প্রমুখ। (আসির, ৫ম খণ্ড, ১৩১৪ হিঃ, ৫২০)

যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা:) (মৃত্যু আনু: ৬৪২ খ্রি:)

আইয়ামে জাহিলিয়াহ নামে খ্যাত সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই সমাজ-ব্যবস্থায় ন্যায়, সাম্য প্রতিষ্ঠায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা:)। তিনি এক বর্ণাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর আচরিত আদর্শ ও গৃহিত কর্মপন্থা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা:) এর ডাকনাম ছিলো বুররাহ। তিনি সমাজে উম্মুল হাকাম নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বনু আসাদ ইবনে খোযায়মা গোত্রের ‘জাহাশ ইবনে রাবাব আল-আসাদি আর মাতা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ফুফু উমায়মা বিনতে আবদিল মুত্তালিব। তাঁর জন্মতারিখ জানা যায়নি। তবে তিনি ইসলাম প্রচারের সাথে সাথেই তাঁর স্বপরিবারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। (মাবুদ, ২০১৪ : ২৫০)। তার দুই ভাই উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও আবু আহমাদ ইবনে জাহাশ মক্কার প্রসিদ্ধ গোত্রপতি আবু সুফিয়ানের দুই কন্যা উম্মে হাবিবা ও ফারিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁরা সকলেই মক্কায় ইসলামের শত্রুদের কর্তৃক খুব অত্যাচারিত হচ্ছিলেন। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের আশায় তাঁরা হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। (আসির, ১৯৯৫ : ৪৬৩) সেখানে যয়নাবের ভাই উবাইদুল্লাহ খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। আর তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবা মুসলমান থেকে যান। পরে হাবশায় থাকাকালীন সময়েই হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাদের পরিবারের সকলেই সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর আরেক ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ সংগ্রামে অংশ নিয়ে উহুদ যুদ্ধে অকালে মৃত্যুবরণ করেন এমনকি শত্রুরা তাঁর লাশ পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলে। (আসির, ১৯৯৫ : ৪৬৫) ইসলামের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর মামা হযরত হামযাও এ যুদ্ধে শহীদ হন।

সমতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা

সমাজ উন্নয়নে হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা:)-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিলো, সামাজিক বিদ্বেষ এবং ভেদাভেদ প্রথা বিলুপ্ত করে ন্যায় বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। যে সমাজ-ব্যবস্থায় নারী প্রকৃত অর্থে মানুষ কিনা? তার আত্মা আছে কি না! থাকলেও তা কোন শ্রেণির! এ নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তখনকার

সমাজ, সভ্যতার বড় বড় দার্শনিকরাও, সেখানে মানবতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাম্যের কথা এবং সবরকমের ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখ্যানের কথা ইসলামে ঘোষণা করা হলো। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “ হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু’জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।” (সূরা নিসা, আয়াত নং ১) মহানবি (সা:) বলেছেন, “নারী পুরুষের সহোদরা” (বায়হাকি, ১ম খণ্ড, ১৯৯৪ : ১৬৯) আরবের সেই সমাজে ইসলাম-পূর্ব যুগের ক্রীতদাস-দাসী প্রথা তখনও দূর করা সম্ভব হয়নি। এ কুপ্রথা বন্ধ করতে পৃথিবীবাসীকে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করতে হয়েছিলো। যায়দ ইবনে হারিসাকে বিয়ে করে যয়নব বিনতে জাহাশ (রা:) সে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন।

এ এক্ষেত্রে সমাজে সমতার নীতি চালু করতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে সহযোগীতা করেছিলেন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা:)। বাজার হতে ক্রয় করে যায়দ ইবনে হারিসাকে রাসূল (সা:) পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ৪২) অভিভাবক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাকে নিজ দায়িত্বে স্বীয় ফুফাতো বোন অসাধারণ সুন্দরী যায়নাব বিনতে জাহাশ-এর সাথে বিবাহ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। মুহাম্মদ (সা:)-এর পক্ষ থেকে এ বিবাহের প্রস্তাব যায়নাব বিনতে হারিসার নিকটে পৌঁছলে তিনি এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ নিজেদের বংশ গৌরব ও যায়দ পূর্বে দাস ছিলো বিধায় তাঁকে পছন্দ করার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুগতে থাকেন। হযরত যয়নব (রা:) তখন ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন বিধবা নারী। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম জানা না গেলেও এটি জানা যায়, তিনি ৬২২ খ্রি: মৃত্যুবরণ করেন। (Wikipedia) কিন্তু প্রিয় নবীর দেওয়া প্রস্তাব তাঁরা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা উপেক্ষা করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বর্ণিত আয়াত তাদেরকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিলো। “কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো কাজের নির্দেশ দেন, সে কাজে তাদের নিজস্ব রায় থাকবে। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।” (সূরা আহযাব, ৩৬) ৬২৫ খ্রি: তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো।

কুসংস্কার নির্মূল

যায়েদ ইবনে হারিসের সাথে হযরত যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহের মাত্র দুই বছরের মধ্যে এ বিবাহ ভেঙে যায়। তখন লোকে কানাঘুসা করতে থাকে ক্রীতদাসের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কে বিবাহ করবে। (নাসির, ১৯৯৮ : ১৫৬) বিয়ে বিচ্ছেদের পর হযরত যয়নবের ইদত পুরো হলে রাসূল (সা:)-তাকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু যয়নব রাসূল (সা:)-এর পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ছিলেন সবাই এটা জানতো। তাই তাকে বিয়ে করলে এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটন হবে এমনটিও মহানবি (সা:) চাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলেন না। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী অবতীর্ণ হলে তিনি অনুপ্রাণিত হন। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হল, “আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও তাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করেছিলেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।” (সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৭) এ আয়াত অবতীর্ণের পর রাসূল (সা:) সরাসরি যয়নব (রা:)-এর নিকটে গমন করেন। ইবনে ইসহাকের মতে, আবু আহমদ ইবনে জাহাশ রাসূল (সা:) এর সাথে যয়নব (রা:)-এর বিবাহ পড়ান। (মুসলিম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-১৪২৮) স্বয়ং হযরত যয়নব (রা:) পরে গর্ভ সহকারে বলতেন, তাঁর বিয়ে স্বয়ং আল্লাহতায়ালার নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছিলো। এ বিবাহ আনুমানিক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যয়নাবের ইদতকাল সমাপ্তের পরপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। (Fishbein, 1997 : 180)

শালীনতাবোধের শিক্ষা

ইসলাম নর-নারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশায় বাধা দেয়। রাসূল (সা:)-এর সাথে যয়নব বিনতে জাহাশ (রা:)-এর বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত ওলীমা অনুষ্ঠান বেশ বড়সড়ভাবে হয়েছিলো। প্রায় তিনশত আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন এ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানের সময় কিছু ব্যক্তির এদিক ওদিক চলাফেরার

कारणे ययनव (राः) ँ गृहेई पिछन फिरे वसे थकते बाध्य हयेछिलेन । ँ सम्पर्के आल-कुरआने वला हयेछे, “हे मुंमिनगण! तोमादिगके अनुमति देओया ना हईले तोमरा आहार्य प्रञ्जुतिर जन्य अपेक्षा ना करे भोजनेर जन्य नविगृहे प्रवेश करो ना । तवे तोमादेरके आह्वान करले तोमरा प्रवेश करो ँवंग भोजनशेषे तोमरा चले यावे ; तोमरा कथावार्तीय मशगुल हये पडो ना । कारण तोमादेर ँई आचरण नविके पीडा देय, से तोमादेरके उर्ठाईया दिते संकोचबोध करे । किञ्चु आल्लाह सत्य वलते संकोचबोध करेन ना । तोमरा तार पत्नीदेर निकट हते किछु चाईले पर्दार अञ्जुराल हते चाईवे । ँई विधान तोमादेर ँ तदेर हृदयेर जन्य पवित्र । तोमादेर कारँ पक्षे आल्लाहर रासूलके कष्ट देया सञ्गत नय ँवंग तार मृत्युर पर तार पत्नीदेरके विवाह करा तोमादेर जन्य कखनँ वैध नय । आल्लाहर दृष्टिते इहा खोरतर अपराध ।” (सुरा आहयाव, आयात नं ५३)

ताई ँकटि सुसभ्य ँ परिशीलित जाति गडे तोलार क्षेत्रे हयरत ययनव विनते जाहाश (राः)-ँर भूमिका छिलो अनवद्य ँ अतुलनीय । प्रख्यात ँतिहासिक इवने साद वलेन, “आल्लाह ययनव विनते जाहशेर प्रति सदय होन! सतिये तिनि दुनियाते अतुलनीय सम्मान ँ मर्यादा लाभ करेछेन । आल्लाह स्वयं तार नवीर सांथे तार विये दियेछेन ँवंग तार उपलक्षे आल कुरआनेर कयेकटि आयात नायिल हयेछे ।” (आय यिकिरली, १९८९ : २४०) तार (हयरत ययनाव विनते जाहाश) सम्पर्के हयरत आयशा (राः)ँ वलेन, “रासूल (साः) परकाले तार सांथे सर्वप्रथम मिलित हओयार ँवंग जान्नाते तार स्त्री हओयार सुसंवाद दान करे गेछेन ।” (बालायुरि, १९७९ : ४७५)

दारिद्र्य विमोचन

हयरत ययनव विनते जाहाश (राः) लक्ष प्रतिष्ठित इसलामि समाजे यारा इसलाम कबुल करार कारणे निजेर गोत्रे आश्रयच्युत हये अर्थनैतिकभावे दुर्बल हये पडेछिलेन तदेर आर्थिक निरापन्ना प्रदाने आजीवन काज करे गेछेन । तिनि निजेर जन्य किछुई रेखे याननि । तार हाते किछु आसलेई तिनि ता दान करे दितेन । तिनि ये भता वरान्द पेतेंन सबई दान करे दितेन । (साद, १९९९ : १०४) तार मृत्युर पर तार गृहटि उमाईया खलिफा आबदुल मालिक तार ओयारिसेर निकट हते ५० हजार दिरहामेर

বিনিময়ে ক্রয় করে মসজিদের সাথে একীভূত করে দেন। হযরত য়নব বিনতে জাহাশের মতো মহান নারীরা তাদের জীবন, ধন-সম্পদ যেভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তা ছিলো অনবদ্য।

কুটির শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

হযরত য়নব (রা:)-এর একটি অসাধারণ গুণ ছিল শিল্পকার্যে তাঁর পারদর্শিতা। তিনি বস্ত্র তৈরীতে দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে চামড়া শোধন করে তা পাকা করে ব্যবহারোপযোগী করতেন। এই শিল্পজাত পণ্য-সামগ্রী হতে যে আয় হতো তা দু:খী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি বিলিয়ে দিতেন। (আয জাহাবি, ১৯৯০ : ২১৭)

তিনি সুতা কাটতেও জানতেন। আর সে সুতা রাসুল (সা:) যুদ্ধবন্দীদের দিলে তা দিয়ে তারা কাপড় তৈরী করতো। এভাবে মানুষের দারিদ্র্য নির্মূলে তিনি কোনো প্রতিদানের আশা না করে সমাজের বৃহত্তর উন্নয়নে আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন। হযরত আয়শা (রা:) তার সম্পর্কে বলেন, “আল্লাহতায়াল্লা য়নব বিনতে জাহাশের প্রতি রহম করুন। সত্যি তিনি পৃথিবীতে অনন্য মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহতায়াল্লা স্বীয় নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।” (নাসির, ১৯৯৮ : ১৫৯)

পরিশেষে বলা যায়, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত য়নব বিনতে জাহাশ (রা:)-এর অবদান ছিলো অপরিসীম। ঐতিহাসিক ইবনে হাজারের মতে, তিনি আনুমানিক ৬৪২ খ্রি: খলিফা ওমর (রা:)-এর খিলাফতকালে আনুমানিক ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। (মাবুদ : ২০১৪, ২৬৫)

সুমাইয়া বিনতে খুববাত (রা:) (মৃত্যু ৬১৫ খ্রি:)

সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী ছিলো ক্রীতদাসরা। একজন ক্রীতদাসী হওয়া সত্ত্বেও হযরত সুমাইয়া (রা:) মানব মুক্তির বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করায় মনিবের তীব্র রোষানলে পতিত হন। তবে তিনি কীভাবে ক্রীতদাসে পরিণত হন তা জানা যায়নি। তাঁর পিতৃকুলের মধ্যে কেবল পিতা ‘খুববাত’ এর নাম জানা যায়। তাঁর মনিব আবু হুজাইফা তাকে ইয়াসির বিন ‘আমর’ নামক এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন যিনি আনুমানিক ৫৬৫ খ্রি: ইয়েমেন হতে মক্কায় স্বীয় ভ্রাতার সন্ধানে আসেন। তিনি মক্কায়

বহিরাগতদের প্রতি আরোপিত নীতি অনুযায়ী আবু হুজাইফার সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। (সাদ, ১৯৭৭ : ২৬৮) সুমাইয়ার দু'টি পুত্র ছিলো। তাদের নাম হলো 'আবদুল্লাহ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা:)। আম্মার (রা:) একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তিনি স্বামী ইয়াসির ও পুত্র আম্মারসহ মক্কায় ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম সাতজন মুসলমানের একজন ছিলেন। তাঁর মনিব ছিলো মক্কার ধিকৃত আবু জেহেলের চাচা। (নুরুজ্জামান, ১৯৯০ : ৩৫০) সুমাইয়া (রা:) কে গৃহে নামায আদায় করতে দেখলেই তাঁর নিষ্ঠুর মনিব চরমভাবে ক্ষুব্ধ হতো। পুত্রসহ তাঁকে সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি রাস্তার তপ্ত বালুতে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতো। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য মক্কায় তখন কেউ ছিলো না। হযরত মুহাম্মদ (সা:) সহ সকলে তখন নির্যাতিত, নিপীড়িত। মুহাম্মদ (সা:)-কে পর্যন্ত তখন চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে আত্মগোপন করতে হয়েছিলো।

এতো অত্যাচারের পরেও হযরত সুমাইয়া (রা:) কেন পূর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করছেন না, তা ভেবে আবু জেহেল খুব ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। একদিন সুমাইয়া (রা:) বাসায় ফিরছিলেন তখন আবু জেহেল তাকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে তার শরীরে বর্শা নিক্ষেপ করলে তিনি বর্শাবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনাটি ঘটে হযরতের পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে। (আয যাহাবি, ১৯৭০ : ১৪০)

একজন সাধারণ ক্রীতদাসী হয়েও হযরত সুমাইয়া (রা:) তদানীন্তন শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তার পরিণতি অত্যন্ত করুণ ও বেদনার্ত হলেও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের সাহস সঞ্চরে এ ঘটনা ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সমাজ পরিবর্তনে তাঁর আত্মত্যাগ এক সুদূর প্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। এজন্য হযরত মুজাহিদ (র:) বলেন, ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন আম্মারের মা সুমাইয়া। (সাদ, ১৩২১ হিঃ : ২৬৫)। তাই বলা চলে, সুমাইয়া (রা:) এর আত্মত্যাগ স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবে ধরা দিয়েছিলো।

হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা:) (মৃত্যুসন ৬৪৩ খ্রি:)

হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে প্রাক-ইসলামি যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো লায়লা। আশ-শিফা নামে তাকে ডাকা হতো। তাঁর স্বামী ছিলেন আবু হুসমা ইবনে হুযায়ফা আল আদাবি। আর পিতার নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে আবদি শামস। পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হন, যা ছিলো তদানীন্তন মূর্খতা, গৌড়ামিতে আচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। প্রাক-ইসলামি আরবে যে সতেরো জন লেখাপড়া জানতেন তন্মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র শিক্ষিতা মহিলা। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ৪৫৫)

ধর্মীয় আদর্শ প্রচার

হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে পরিবারসহ মুসলমান হন। সাথে সাথেই কুরাইশদের অমানুষিক পীড়নের মুখোমুখি হয়েও তিনি ধৈর্যচ্যুত হননি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নবুওয়্যত প্রাপ্তির পর রাসূল (সা:)-এর দাওয়াতের মাধ্যমে যে ৬০ জন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, তন্মধ্যে নারীই ছিলেন ১২ জন। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নিকটে অন্যান্যদের সাথে নতুন ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। এমনকি তিনি নিজের সহায়-সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন। (ইবনে কাসীর, ১৯৭৮ : ২৮৫)

এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন, “আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভীত করা হয়েছে এমনটি কাউকে করা হয়নি। আমি আল্লাহর পথে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছি, এমনটি কেউ হয়নি। মাসের ত্রিশটি দিন আমি, আমার পরিবার ও অনুসারীদের কোনো খাদ্য জোটেনি। বগলে যতটুকু খাবার লুকিয়ে নেয়া সম্ভব হত, ততটুকু খাদ্য ব্যতীত (অর্থাৎ খুবই সামান্য)। (আল-গালিব, ২০১৬ : ২২৫)

বিদ্যানুরাগী হযরত শিফা (রা:)

আরবের জাহেলি সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন সাধনে তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে গেছেন। নবদীক্ষিত মুসলিম সমাজের মুসলমানদের আত্মহের কারণে তাদেরকে তিনি আজীবন শিক্ষাদান করে গেছেন। হযরত আবু মূসা আল-আশআরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা:)

বলেছেন, যে ব্যক্তির নিকট একটি দাসী রয়েছে, সে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিল অতঃপর তাকে স্বাধীন করে দিয়ে তাকে বিবাহ দিয়ে দিল, তার দ্বিগুণ সওয়াব এবং যে দাস আল্লাহর হক আদায় করে ও তার মনিবের হকও আদায় করে তারও দ্বিগুণ সওয়াব। (মুসতাফা, ১৯৯২ : ৫৬) রাসূল (সাঃ)-এর এ বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি নবগঠিত মুসলিম সমাজের নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমান, ক্রীতদাসী, সাহাবিগণের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন উঁচু মাপের শিক্ষক ছিলেন বিধায় অতি অল্প সময়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলাম আবির্ভাবের পর মুসলমানগণ নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা লাভ করতে থাকলে মুসলিম সমাজে শিক্ষার হার বেড়ে যায়। এর পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী, “জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।” (ইবনে মাজাহ, ২০১২ : ৫১৯)

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত আরবগণ তখন হযরত শিফা (রাঃ)-এর নিকটে এসে লেখা-পড়া শিখে সমাজ পরিবর্তনে অংশ নেন। যেমন : হযরত আয়শা (রাঃ) ছোট বয়সে তার নিকটে লেখাপড়া শিখেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) কেও তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ৩৩৩)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষক হযরত শিফা (রাঃ) কে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজিত ছিলো। তিনি হযরত শিফা (রাঃ)-এর গৃহে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। এ ভক্তি-ভালোবাসাকে অত্যন্ত কদর করে হযরত শিফা (রাঃ) নিজ গৃহে মহানবী (সাঃ)-এর আরামের জন্য বিছানা ও পরিধানের কাপড় আলাদা করে গুছিয়ে রাখতেন। রাসূল (সাঃ)-এর ব্যবহৃত এ সকল কাপড়-চোপড় পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকাম তাঁর নিকট হতে জোরপূর্বক কেড়ে নিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাসূল (সাঃ) তার গৃহে আসলে উভয়ের মধ্যে কেবল শিক্ষা বিষয়ক কথাবার্তা হতো। (ইবনে আবদিল বার, ১৯৮৫ : ৩৫৮)

ইসলাম গ্রহণ ও প্রচারে মক্কায় নিজের ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পদ ত্যাগ করায় মদিনায় নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থায় নিপতিত হযরত শিফা (রাঃ)-কে খাদ্য, বস্ত্রের জন্য অন্যের সাহায্যের উপর পর্যন্ত নির্ভরশীল হতে

হয়েছিলো। খায়বার যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে গিয়ে একবার কিছু সাহায্য চাইলে খাবার না থাকাতে তাঁকে নিরাশ হতে হয়। নামাযের সময় হওয়াতে রাসূল (সাঃ) মসজিদে চলে গেলেন। শিফা (রাঃ) সেখানে অপেক্ষা না করে গৃহে ফেরার পথে কন্যার গৃহে গেলেন। জামাতাকে ঘরে দেখতে পেয়ে বকাবকি করলেন কেন এখনও সে নামাযে যায়নি। জামাতা বিশিষ্ট সাহাবি সুরাহবিল (রাঃ) বলে উঠেন, খালাজান আমার জামাটি রাসূল (সাঃ) ধার নিয়ে গেছেন। আমি আমার এই শতচ্ছিন্ন জামা পরিহিত অবস্থায় কীভাবে মসজিদে যাবো। এ ঘটনা জানতে পেরে হযরত শিফা (রাঃ) ব্যথিত হলেন। তিনি বলে উঠেন, আমি জানতাম না রাসূল (সাঃ)-এর এই অবস্থা। আমি কিছু পেতে তাকে অহেতুক কষ্ট দিয়েছি! (তালিবুল, ২০০৫ : ১৮৮)

ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করাতে তাঁকে চরমভাবে অর্থসংকটে পতিত হতে হয়েছিলো। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব তাকে ভীষণভাবে কষ্ট দিত। একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাকে অত্যন্ত সম্মান করে উপহার হিসেবে একটি পরিধেয় শীতবস্ত্র দান করলে সে চাদরটি তিনি গ্রহণ করেন। (মাবুদ, ২০১২ : ২১০) চরম দরিদ্রতা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করে তিনি সমাজদেহ হতে অজ্ঞতা নির্মূলে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়ন

তিনি চিকিৎসকও ছিলেন। যদিও তখন আরবে কোনো আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু ছিলো না। মানুষ রোগ হতে মুক্তি পেতে তন্ত্র-মন্ত্র, যাদুবিদ্যা, টোটকা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল থাকতো, যা মানুষের সুস্থ ধ্যান-ধারণা সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় ছিলো। ইসলাম-পূর্ব যুগে তিনি ভেষজ গাছ-গাছড়া হতে তৈরী ঔষধের মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা করতেন। পরবর্তীতে সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকলে এ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা সঠিক হবে কি না তা জানতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকটে যান। তিনি এ চিকিৎসা চালু রাখতে বললে শিফা (রাঃ) এ চিকিৎসা পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। পরে তাঁর নিকট হতে হযরত হাফসা (রাঃ) সহ আরও কিছু মহিলা এ বিদ্যা রপ্ত করেন। (মাবুদ, ২০১২ : ২১১)

হাদিস প্রচার

তিনি একজন প্রথিতযশা রাবি ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর কাছাকাছি থাকাতে মহানবী (সা:) হতে বেশ কিছু বিশুদ্ধ হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ছিলো বারো। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ৩৩৩)

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন

তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিলো খলিফা ওমর (রা:)-এর সময়ে মুহতাসিব বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন। তাঁর উপর অর্পিত এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পালন করে গেছেন। তাঁর কাজ ছিলো বাজার পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা তদারকি। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ৩৩৭)

তাই বলা চলে, সেই সপ্তম শতকে শতধাবিভক্ত আরব সমাজের উন্নয়নে মক্কার প্রথম শিক্ষিত ও কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মহিলা সাহাবি হযরত শিফা (রা:) নিঃস্বার্থভাবে যে শ্রম, সাধনা, মেধা ব্যয় করে গেছেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিন্তা-ভাবনায় পরিমার্জিত, চলাফেরায় দ্রুতগতিসম্পন্ন, চৌকস স্বভাবের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন হযরত শিফা (রা:) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) এর খিলাফতকালে আনুমানিক বিশ হিজরি সনে বা ৬৫৩ খ্রি: মৃত্যুবরণ করেন। (আয যিকিরলী, ১৯৮৯ : ১৬৩)

হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ (রা:) (আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক)

হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ (রা:) পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারী স্বামী আবু তালিবসহ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ ৬২২ খ্রি: হিজরতের পূর্বে মুসলমান হন। (মাবুদ, ২০১২ : ১৬৫) খুব ছোটবেলায় মহানবি (সা:) পিতামাতাকে হারিয়ে এতিম হয়ে পড়লে তাকে চাচী ফাতিমা ও চাচা আবু তালিব বড় করে তোলেন। একটা পর্যায়ে রাসূল (সা:)-এর প্রচারিত আদর্শের কারণে তাকে শত্রুরা হত্যা করতে উদ্যত হলে ফাতিমা বিনতে আসাদ নিজের পুত্র আলিকে মহানবির জন্য উৎসর্গ করেন। নিজের বিছানায় আলিকে শুইয়ে রেখে হযরত মুহাম্মদ (সা:) হযরত আবু বকরকে নিয়ে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি স্বামীর সাথে শিয়াবে আবু তালিবে গিয়েও অবস্থান নেন। (তালিবুল, ২০০৫ : ১১৬) সংসার জীবনে পুত্র আলী (রা:) ও তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রা:) কে নিয়ে

তার সুখের সংসার ছিলো। ইসলামে তাঁর অবদানের কারণে মৃত্যুর পর তাকে রাসূল (সাঃ)-এর কামিস দিয়ে দাফন করা হয়। (তালিবুল, ২০০৫ : ১৫) মদিনায় হিজরতের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুসন অজ্ঞাত।

খাওলা বিনতে আযওয়ার (আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় ৭ম শতক)

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে মক্কায় জন্মগ্রহণকারী খাওলা বিনতে আযওয়ার ইসলামে অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন। তাঁর বড় পরিচয় ছিলো তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের সেই বিপদাপদের মুহুর্তে যেভাবে শক্তিশালী শত্রুদেরকে পরাভূত করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তা ছিলো অনন্য। তিনি ভ্রাতা জিরারের সাথে পুরুষের বেশে যুদ্ধ করতেন। উভয়ে প্রায় চার/পাঁচটি যুদ্ধে একইসাথে যোগদান করেছিলেন। এ সকল যুদ্ধের বেশীরভাগই তদানীন্তন বিশ্বের পরাক্রমশালী জাতি বাইজান্টাইনদের^{১৬} সাথে হয়েছিলো। তাকে নিঃসন্দেহে ইতিহাসের একজন অন্যতম সামরিক ব্যক্তিত্ব বলা যায়। এক যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতে করতে ঘোড়া হতে মাটিতে পড়ে যান। তাকে শত্রুরা ধরে নিয়ে যায়। শত্রু শিবিরে তাকেসহ আরও নারীকে শত্রু সৈন্যরা ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে তিনি তাবুর রড দিয়ে তাদেরকে পিটিয়ে পালিয়ে চলে আসেন। এমনই অকুতোভয় নারী ছিলেন তিনি। (Khaola Bint Azwar : MNH 2014, Online mazagine) তাঁর ভাই শত্রু কর্তৃক বন্দী হলে খাওলা ভাইকে উদ্ধারের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই রোমক-বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে দুই লাখ চল্লিশ হাজার এর বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনী মুসলমানদের চল্লিশ হাজারের বাহিনীকে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ ইতিহাসে ‘ইয়ারমুক’ এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইয়ারমুক (প্রাচীন হিরোম্যাক্স) একটি নদীর নাম যার অবস্থান ছিলো বর্তমানে সিরিয়া-জর্ডান এবং সিরিয়া-প্যালেস্টাইন অধ্যুষিত এলাকায় প্রাচীন ‘জাউলান’ নামক স্থানে। এ ভয়াবহ যুদ্ধ ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলেছিলো। (আমীর, ১৯৯২ : ৩৩) এ যুদ্ধের চতুর্থ দিনে খাওলা মুসলিম সৈন্যদলের মহিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এ যুদ্ধে আঘাতজনক কারণে তিনি মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। (Khaola Bint Azwar : MNH 2014, Online mazagine)

^{১৬} . তদানীন্তন আরবের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেস্টাইন ও মিশরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য গঠিত ছিলো। (মাহমুদুল, ১৯৯০ : ১৯০)

এ যুদ্ধের মাধ্যমে সিরিয়া বিজিত হয় ও সেখান হতে বাইজান্টাইন শাসনের অবসান ঘটে। খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু উবাইদা নামক বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতির পার্শ্বে হযরত খাওলা (রাঃ)ও ছিলেন এ ঐতিহাসিক যুদ্ধ জয়ের অনন্য কৃতিত্বের অধিকারিণী। যুদ্ধ পরিচালনার মুহূর্তে তাঁর ক্ষীপ্রতা, রণ-কৌশল দর্শনে তাঁকে যোদ্ধাদের কেউ কেউ খালিদ বিন ওয়ালিদ নামেও ডাকতেন। কারণ তিনি পুরুষের বেশে মুখ ঢেকে যুদ্ধ করতেন। আর খালিদ বিন ওয়ালিদের নাম শুনলেও তাকে কখনো দেখেননি এমন বহু যোদ্ধা ছিলো মুসলিম বাহিনীতে। (Khaola Bint Azwar : MNH 2014, Online mazagine) এ যুদ্ধে রোমানদের এক লাখ চল্লিশ হাজার সৈন্য আর মুসলিম শিবিরে তিন হাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছিলো। মুসলমানদের যুদ্ধ জয়ের পশ্চাতে ছিলো শত্রুবাহিনী সৈন্য সংখ্যার দিকে দিয়ে এগিয়ে থাকলেও ইয়ারমুকের উপকূলভাগের উত্তরদিকে একটি ফাঁসের ন্যায় সমতলভূমি ছিলো যেখানে রোমকরা সুরক্ষিত ও নিরাপদ স্থান মনে করে অবস্থান নেয়। তাদের অবস্থানের খবর পেয়ে মুসলিম বাহিনী সে অনুযায়ী পরে নিজেদের সৈন্যসহ অগ্রসর হতে থাকে। আরবরা আরেকটু দূরে উজানে নদী পার হয়ে উত্তরদিকে গিরিখাতের খুব নিকটে গিয়ে অবস্থান নেয়। ইতিমধ্যে দুমাস চলে যায়। শেষ পর্যন্ত এই ফাঁসের ন্যায় দেখতে সমতলভূমি হতে বের হতে বাধ্য হয় রোমকরা আর মুসলিম বাহিনীর হাতে একের পর এক মৃত্যুবরণ করতে থাকে। সিরিয়াসহ পরবর্তীতে জেরুজালেম নগরী ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলমানদের দখলে আসে। (আমীর আলী, ১৯৯২ : ৩৪-৩৯) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য খাওলা বিনতে আযওয়ার ইতিহাসে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। বর্তমানে ইরাকের সেনাবাহিনীর মহিলা শাখার নামকরণ করা হয়েছে খাওলার নামে। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহিলাদের জন্য সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত মিলিটারী কলেজের নাম হলো ‘খাওলা বিনতে আযওয়ার ট্রেনিং কলেজ’। (Khaola Bint Azwar : MNH 2014, Online mazagine)

তাই বলা চলে, খাওলা বিনতে আযওয়ার বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাবিধানে নিয়োজিত থেকে এক ব্যতিক্রমী জীবনযাপনের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর দক্ষতা ও সাহসিকতার ইতিহাস রাজনৈতিক চিন্তাধারার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। তাকে নিঃসন্দেহে ইতিহাসের একজন অন্যতম সামরিক ব্যক্তিত্ব বলা যায়।

হযরত যয়নব (রা:) (জন্ম ৬০০ খ্রি: ও মৃত্যু ৬২২ খ্রি:)

প্রাথমিক জীবন ও সংগ্রাম

তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের নবতর সমাজ বিনির্মাণ ও সংস্কারে যেকজন ক্ষণজন্মা মহিয়সী নারী নিজস্ব কীর্তিগাঁথার জন্য স্বরণীয়, বরণীয় হয়েছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত যয়নব (রা:)। হযরত যয়নব (রা:) পৃথিবীর প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা (রা:) ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম যয়নব বিনতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। হযরত যয়নব (রা:) ৬০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (মাবুদ, ২০১২ : ১৪) তখন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর বয়স ছিলো মাত্র ত্রিশ বছর। তখনও রাসূল (সা:) ইসলাম প্রচার শুরু করেননি। যয়নবের বিবাহ হয় তাঁর খালাতো ভাই আবুল আস বিনতে রবির সাথে। (Ibn Saad, 1995 : 78) কিন্তু এই আবুল আস সহসা মুসলমান হননি। তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের বহুদিন পরে তিনি মুসলমান হন। স্ত্রী যয়নবকে তালাক দিতে তাঁর পরিবার চরমভাবে চাপ দিচ্ছিল যা নিয়ে যয়নব খুব অশান্তিতে ছিলেন।

তাঁর পিতা নবুওয়ত লাভের পর ইসলাম প্রচার শুরু করলে তাঁর শত্রুরা তার পরিবারের সাথে নির্দয় আচরণ শুরু করে। ইসলামের শত্রুরা প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সমাজে তাদেরকে হেয় করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তারা প্রথমে রাসূলের বড় কন্যা যয়নবের শ্বশুরালয়ে গমন করে ও তার স্বামী আবুল আসকে স্ত্রী যয়নবকে তালাক দিয়ে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিতে প্ররোচিত করে। এমনকি তারা বলে যে, সে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে আরও সুন্দরী নারীর সাথে তার বিবাহের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আবুল আস স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন বলে তাদেরকে স্পষ্ট বলে দেন যে, এ কাজ তিনি করতে পারবেন না। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ৬৫২)

তাঁরা পরস্পরকে নিয়ে ভালো ছিলেন। দুই ধর্মের মানুষ হিসেবে তারা বেশ কিছুদিন সাংসারিক জীবন পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের জন্য আবুল আস স্ত্রীকে বকাঝকা করেননি বা নিজের গোষ্ঠীর অন্যান্য লোকদের চাপে তাকে পরিত্যাগও করেননি, কারণ তিনি স্ত্রীকেও ভালোবাসতেন। আবার পাশাপাশি নিজের পৌত্তলিক ধর্মকেও পছন্দ করতেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা:) কেও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এতে আবুল আস-এর পরমতসহিষ্ণুতার পরিচয় মেলে। এ কারণে তাঁর শ্বশুর রাসূল (সা:) তাকে খুব পছন্দ

করতেন ও তার সাথে এ অবস্থাতেও সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। রাসুল (সা:) ৬২২ খ্রি: মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করলেও যয়নব (রা:) মক্কায় স্বামীর নিকটেই থেকে গেলেন। কেননা স্বামীর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিলো। (তাবারি, ১৩২০ হিঃ : ১৩৬) আর পৌত্তলিক ও মুসলিম ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা তখনও চালু হয়নি। তখন ইসলাম সবে প্রচারিত হচ্ছে বলে মুসলিম সমাজ সেভাবে গড়েও উঠেনি।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত যয়নব (রা:)

শুধু এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর কন্যা হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়ির বাইরে মক্কায় যয়নবের বহু শত্রু তৈরী হয়ে যায়। সমাজের স্বার্থান্বেষী, সুবিধাভোগী মানুষ মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষের বিরুদ্ধে নানারকমের ষড়যন্ত্র শুরু করে। যয়নবও তাদের অত্যাচারের মুখোমুখি হন, কিন্তু তা নিরবে সহ্য করেন শুধুমাত্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার আশায়।

এদিকে ৬২৪ খ্রি: মক্কাবাসী মুসলমানদের সাথে বদর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আবুল আস মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়ায় মক্কাবাসীর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হন। এ যুদ্ধে তিনি বন্দী হয়ে অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে মদিনায় আনীত হন। (ইবনে হাজার, ১৯৭৮ : ১২২) বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের মুক্তির জন্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করতে থাকেন। হযরত যয়নব (রা:) তখনও মক্কায় শ্বশুরবাড়িতে। তিনি স্বামীর বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনে তাঁর মহীয়সী মা হযরত খাদিজা (রা:) তাকে বিয়ের সময় যে মূল্যবান হার দিয়েছিলেন তা দিয়ে স্বামীকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তার দেবর 'আমর বিন রাবি'-এর মারফত হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দরবারে প্রেরণ করলেন।

গলার হারটি দর্শনে মুহাম্মদ (সা:)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি যয়নবের নিকটে হারটি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে আবুল আসকে বললেন তাকে এই শর্তে মুক্তি দেয়া হলো যাতে সে মক্কায় ফিরেই যয়নব (রা:)-কে কালবিলম্ব না করে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ৬৫৩)

এদিকে মক্কায় রটে গেল যে, মুহাম্মদ (সা:)-এর কন্যা মদিনা চলে যাচ্ছেন। আবুল আস মক্কায় ফিরে তার ছোট ভাই কেনানার সাথে হযরত যয়নব (রা:)-কে মদিনার উদ্দেশ্যে গোপনে পাঠিয়ে দিলেও স্বার্থান্বেষী

বদশ্বভাবের কিছু ব্যক্তি এ সুযোগকে বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য মোক্ষম মুহূর্ত ভাবলো। যয়নবকে যাত্রাপথে চরমভাবে বাধা দেবার জন্য তারা পরিকল্পনা করলো। যয়নব (রা:) হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর কন্যা বলে তাঁর উপর তাদের আলাদা নজর ছিলো।

যয়নব (রা:) যাত্রাপথে যখন জিতাওয়া নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর শত্রুরা তাদেরকে ঘিরে ধরল। শত্রুদের মধ্যে হিবার বিন আসওয়াদ হযরত যয়নব (রা:)-এর উট লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলে তিনি উট হতে মাটিতে পড়ে যান। তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। এই চরম আঘাতের সাথে সাথেই তার গর্ভপাত হয়ে যায়। (নূ'মানি, ১৯৫২ : ৫২২) পশ্চিমধ্যে তেমন শুশ্রূষাও তার কপালে জোটেনি। মদিনায় তিনি পৌঁছালেও এই আঘাতজনিত শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর সুস্থ হয়ে উঠেননি। পরবর্তীতে আবুল আস ৭ম হিজরিতে ব্যবসা উপলক্ষে মক্কা হতে সিরিয়া যাবার পথে দস্যুকবলিত হয়ে কোনোরকমে সেখান হতে পালিয়ে মদিনায় এসে পড়েন ও যয়নবের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে তাদের আবার মিলন হয়। (নূ'মানি, ১৯৫২ : ৫২২) আবুল আস মুসলমান হন।

রাসুল (সা:) নতুনভাবে তাদের বিবাহ পড়িয়ে তাঁর সাথে হযরত যয়নবের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেন। (Ibn Saad, 1995 : 83) মুসলমানরা তখন নানা নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। (নূ'মানি : ১৯৫২, ৫২৫) পরে হযরত যয়নব (রা:) মদিনায় ৬২২ খ্রি: হিজরতের পর ইস্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসুল (সা:) অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তার চক্ষু হতে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, “আমার সবচেয়ে ভালো মেয়ে ছিলো যয়নব। আমাকে ভালোবাসার কারণে তাকে কষ্ট দেয়া হয়েছিলো।” হযরত যয়নব (রা:)-এর ইস্তেকালের সময় রাসুল (সা:) মুসলিম নারীর গোসল সম্পর্কে যে নির্দেশ দেন তাতে জানা যায়, রাসুল (সা:) মূর্দার প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার অথবা পাঁচ বার ধৌত করতে বলেন ও পরে তাতে কর্পূর লাগানোর কথা বলেন। (তালিবুল, ১৯৯০ : ৮৮)

তাই বলা চলে, মানবতার সমাজ প্রতিষ্ঠা ও এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে মুহাম্মদ (সা:)-এর কন্যা যয়নবকে (রা:) যে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছিলো তা ছিলো খুব পীড়াদায়ক। এমনকি স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির সকলের সাথে আদর্শিক পার্থক্যের কারণে পিতৃপরিবার হতে বিচ্ছিন্নতা ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে যেভাবে কষ্টের সম্মুখীন হন তা ছিলো বিরল ঘটনা। এত কষ্টের মধ্য দিয়ে

জীবন অতিবাহিত করলেও শুধু মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষায় সে পথ হতে নিজেকে সরিয়ে নেননি। এমনকি এ সত্য আদর্শ ধারণ করার কারণে তাকে অকালে প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করতে হয়। তাঁর এই জীবনেতিহাস যুগে যুগে মানবতাকে উদারতা, বিপদে ধৈর্যধারণসহ অসত্য পথ পরিহারে সাহস যোগাবে। সঙ্গত কারণেই তাঁর ঘটনাবল্ল জীবন অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

হযরত রুকাইয়া (রা:) (জন্ম ৬০৩-মৃত্যু ৬২৪ খ্রি:)

হযরত রুকাইয়া (রা:) আনুমানিক ৬০৩ খ্রি: পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও হযরত খাদিজার (রা:) দ্বিতীয় সন্তান। হযরত রুকাইয়া (রা:) ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী, সুন্দরী ও শিক্ষিতা। রাসূল (সা:)-এর চাচা আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিলো। (ইবনে আবদিল বার, ১৯৮৫ : ২৯৯)

সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত রুকাইয়া (রা:)

সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হযরত রুকাইয়ার (রা:)-এর আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাকে স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে হয়েছিলো। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে তাঁর বড় বোনের স্বামী আবুল আস হতে ব্যর্থ হয়ে মক্কার কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়ার স্বামী উতবা ইবনে আবু লাহাবকে প্রস্তাব দেয়, সে যদি রুকাইয়াকে তালাক দেয় তবে কুরাইশ গোত্রে তাঁর পছন্দমত যে কেনো সুন্দরী নারীকে তার স্ত্রী হিসেবে প্রদান করা হবে। এ কাজ করতে উতবার পিতা-মাতাও চাপ প্রয়োগ করে তার উপর। বিবেকবর্জিত উতবা এতে রাজী হয়ে যায়। উতবা স্ত্রী রুকাইয়াকে তালাক দিয়ে দেয়। (ইবনে হিশাম, ১৯৮১ : ৬৫২)

উতবার পিতা-মাতা কেবলমাত্র রুকাইয়াকে তালাক দেওয়ানোর পরেও ক্ষান্ত হয়নি বরং মহানবি (সা:)-এর সাথে প্রচণ্ড বাজে ব্যবহার করতে লাগলো। এমনকি মহানবি (সা:) যখন তার চারপার্শ্বের সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করলেন তখন আবু লাহাব আপন চাচা হয়েও মহানবি (সা:) কে পাথর ছুড়ে মেরে আহত করেছিলো। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আল-কুরআনে সূরা লাহাব নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ করে

মহান আল্লাহতায়াল্লা আবু লাহাবের ধ্বংস অনিবার্য বলে ঘোষণা করেছেন। (আল-কুরআন, সূরা-১১১) উল্লেখ্য যে, 'উতবার সাথে রুকাইয়ার কেবল আকদ হয়েছিলো। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাসের পূর্বেই তাদের তালকের এ ঘটনা ঘটে। (Ibn Saad, 1995 : 87) পরে ইসলামের তৃতীয় খলিফা, মহানবি (সা:)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি হযরত উসমান (রা:)-এর সাথে রুকাইয়ার বিবাহ হয়। হযরত রুকাইয়া (রা:) ৬২৪ খ্রি: মদিনায় অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। (মাবুদ, ২০১২ : ২৯)

হযরত উম্মে কুলসুম (রা:) (জন্ম ৬০৪-মৃত্যু ৬৩১ খ্রি:)

উম্মে কুলসুম (রা:) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও হযরত খাজিদা (রা:)-এর চার কন্যার মধ্যে তৃতীয়। তিনি পিতা হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির ৬ বছর পূর্বে আনুমানিক ৬০৪ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেন। (সাদ্দ, ১৩৪১ হিঃ : ১২৯) তাঁর শৈশবকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। রুকাইয়া সহ তিনিও ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট নেতা আবু লাহাবের পুত্রবধূ। আবু লাহাবের আরেক পুত্র উতায়বার সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিলো। (Ibn Saad, 1995 : 90) তারা সব বোনই একসাথে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নবুওয়ত লাভের পর ইসলাম কবুল করেন।

তিনিও বোনের ন্যায় ইসলাম গ্রহণ করার কারণে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ির নিকটে চরম অপ্রিয় হয়ে উঠেন। কেননা তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি ইসলামি আদর্শের প্রধান শত্রু ছিলো। তাঁরা মুসলমানদের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতো। উতায়বাও ভ্রাতা উতবার ন্যায় পিতা-মাতার কথামতো স্ত্রী কুলসুমকে ইসলাম গ্রহণের কারণে তালাক দিয়ে দেয়। আবু লাহাবের পরিবার পুত্রবধূদেরকে তালাক দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি স্বয়ং মহান ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদকেও (সা:) শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে পুত্রদেরকে প্ররোচিত করে। (মাবুদ, ২০১২ : ১৮)

কুলসুমের স্বামী আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নিকটে এসে তাকে বলে যে, সে তার প্রচারিত আদর্শকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং তার কন্যাকে তালাকও দিয়েছে। মুহাম্মদ (সা:) যেন তাদের নিকটে না যায় আর তারাও আর মুহাম্মদের নিকটে আসবে না।' এ কথাগুলো বলার সাথে সাথেই সে রাসূল (সা:)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জামা ছিঁড়ে দেয়। উতায়বার

উগ্রতা দর্শনে হযরত মুহাম্মদ (সা:) চরম অপমানিত বোধ করেন। তাদের সকলের কামনা ছিলো শ্বশুর বাড়ি হতে মুহাম্মদের মেয়েরা বিতাড়িত হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসলে হযরত মুহাম্মদ (সা:) মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে তাঁর কার্যক্রম পরিত্যাগ করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সা:)-ব্যথিত হলেও আদর্শগত কারণে কন্যাদের প্রত্যাবর্তন সানন্দে মেনে নেন। পরবর্তীতে এই উতায়বা বাণিজ্য করতে গিয়ে শাম এলাকার একটি নেকড়ে দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। (মাবুদ, ২০১২ : ১৮)

পরিশেষে বড় বোন রুকাইয়া অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর পছন্দের ব্যক্তি উসমানের সাথে কুলসুমের বিবাহ দেন। আর তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দুই কন্যাকে বিবাহ করার কারণে তাকে ‘যুনুরাইন’ বলা হয়। (ইবন হাজার, ১৯৭৮ : ৩২৭-২৮) হযরত উম্মে কুলসুম (রা:) ও হযরত উসমান (রা:)-এর বিবাহিত জীবন খুব বেশী দীর্ঘায়িত হয়নি। মাত্র ছয় বছর সংসার করার পর হযরত উম্মে কুলসুম (রা:) আনুমানিক ৬৩১ খ্রি: ইস্তেকাল করেন। (মাবুদ, ২০১২ : ৩৫)

হযরত ফাতিমা (রা:) (জন্ম ৬০৫-মৃত্যু)

হযরত ফাতিমা (রা:) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও হযরত খাদিজা (রা:)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। ফাতিমা (রা:) মক্কা নগরীতে তাঁর পিতার নবুওয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে আনুমানিক ৬০৫ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (আস যুরকানী, ১৯৯৮ : ১১৯) ফাতিমা শব্দটি আরবী ‘ফতম’ শব্দমূল হতে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো রক্ষা করা। তিনি অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট, ধীর স্থির ও অপরূপ রূপের অধিকারিণী থাকায় তাঁকে ‘যোহরা’ বা ‘কুসুমকলি’ নামেও ডাকা হতো। এছাড়াও তাহেরা, মুতাহারা, রাযিয়া, যাকিয়া, মারযিয়া এবং বতুল ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিতা ছিলেন। (নাসির, ১৯৯৮, ২১) তিনি খুব ছোটবেলায় মাতা ও ভগ্নিগণের সাথেই মুসলমান হন ও বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত পিতা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সমাজ-সংস্কারের কাজে কোনো বাধা আসলে নিশ্চেষ্ট বসে থাকতেন না। ছোটবেলা হতেই তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষণ আতঙ্কে কাটতো।

তখনকার পৃথিবীর সর্বত্র পরিবারে পুত্র সন্তান কন্যাদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেত। এখনও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু কন্যা সন্তানের প্রকৃত পরিচর্যা বোধের অভাব ও সমাজে কন্যা সন্তানকে ঘৃণা করা

হতো তীব্রভাবে। নানা অজুহাতে কন্যা যুদ্ধে নিগৃহিত হতো আবার দরিদ্রতার কারণে জন্মের পর কোথাও কোথাও তাকে শিশু বয়সে মেরে ফেলা হতো। তখনকার সমাজে কন্যা সন্তানের উপর এরূপ বর্বরোচিত অত্যাচার নিয়ে খাদিজা (রা:) অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে বিবাহের পর খাদিজার চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে তারা উপযুক্তরূপে গড়ে তোলেন। তার ঔরসজাত চার কন্যা সন্তানের প্রতি তারা অত্যন্ত ভালো আচরণ করতেন। মেয়ে বলে কোনো অবহেলা তিনি পাননি। হযরত মুহাম্মদ (সা:) স্বয়ং বলেন, “কন্যাদেরকে হত্যা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা। আর ফাতিমা তো আমার কলিজার টুকরা।” (শিরওয়াইহি, ১৯৮৬ : ৩৭)

সহজ-সরল জীবনযাপন

সংসার জীবনে স্ত্রীকে পুরুষের আঞ্জাবহ না থেকে কি ভাবে পারস্পরিক সহযোগীতা-সহমর্মিতা দ্বারা জীবনকে সুখী করে তোলা যায়, হযরত ফাতিমা (রা:) এ মানসিকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এমনি পিতা-মাতার সন্তান ফাতিমা (রা:) শুধুমাত্র একজন আদর্শ মানুষ হিসেবেই তৈরী হননি বরং তিনি তদানীন্তন মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান হয়েও কখনো নিজেকে নিয়ে কোনো বড়াই, অহংকার করেননি। তাঁর মূল্যবান অলঙ্কার, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক থাকলেও তিনি কখনও সে পোশাকে সজ্জিত হতে চাইতেন না। অনুষ্ঠানাদিতে তিনি নিতান্ত সাদাসিধা পোশাক পরিধান করে যেতেন। (ইবনে কাসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০৭ : ১১১)

৬২৪ খ্রি: মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মেধাবী, সাহসী যুবক হযরত আলি (রা:)-এর সাথে হযরত ফাতিমা (রা:)-এর বিবাহ হয়। (নাসির, ১৯৯৮ : ২৩) তখন তাঁর বয়স প্রায় ষোল বছর আর হযরত আলি (রা:)-এর বয়স প্রায় বাইশ বছর। হযরত ফাতিমা (রা:) ও হযরত আলি (রা:)-এর সংসারে দারিদ্রতা থাকলেও সুখের অভাব ছিলো না। তাঁদের তিন সন্তান হলেন ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও বিবি য়য়নব। (নাসির, ১৯৯৮ : ৫৩) ইমাম হুসাইন তাঁর আদর্শবাদিতার জন্য কারবালার প্রান্তরে নিষ্ঠুরভাবে পাষণ্ড এজিদের ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারান। (মাহমুদুল, ১৯৯০ : ৩৩৬)

ইসলাম প্রচারে

হযরত ফাতিমা (রা:) ছোটবেলা হতেই মেধা, প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। যে সামাজিক পটভূমিতে পিতা হযরত মুহাম্মদ (সা:) উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করছিলেন সে সময়ে পিতার পাশে থেকে পিতাকে সহযোগীতা দানের মাধ্যমে ফাতিমা (রা:) সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ইসলাম আত্মার পরিশোধন করার শিক্ষা দিয়েছে। পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের জন্য ইবাদত একটি অত্যাবশ্যিকীয় বিষয়। মহান আল্লাহর দাসত্বই ইবাদত। এ ইবাদত কয়েক প্রকারের। ব্যক্তি জীবনে ইসলামের বুন্যাদ পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। এর মধ্যে নামাজ গুরুত্বপূর্ণ। মুহাম্মদ (সা:) প্রথম দুই বছর ৬৩২-৬৩৪ খ্রি: পর্যন্ত গোপন দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফায়তকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফায়তকারিণী নারী, আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ, আল্লাহকে স্মরণকারিণী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” (সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং ৩৫)

তখন তাঁর শত্রুরা তাকে ব্যক্তিগতভাবে নাজেহাল ও উৎপীড়ন করতো। এমনকি তার সাথে চরম অসম্মানজনক আচরণ করতেও দ্বিধা করতো না। পরবর্তীতে তারা চরম পন্থা অবলম্বন করে। একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা:) কাবা শরীফে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় মুহাম্মদ (সা:)-এর শত্রু শায়বা ইবনে রাবিআ, আবু জাহল ইবনে হিশাম প্রমুখের প্ররোচনায় উকবা নামক এক উগ্র ও উদ্ধত স্বভাবের লোক কোথা হতে উটের নাড়ি, ভুঁড়ি টেনে এনে নবীজীর গায়ের উপর ঢেলে দেয়। এমনকি সে প্রিয় নবীজীর ঘাড়ের উপর এমনভাবে পা তুলে চাপ দেয় যে, নবীজীর চোখ দুটো বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আর দূর হতে এ ঘটনা দৃশ্য দেখে ইসলামের শত্রুরা অটহাসিতে ফেটে পড়ে। তবুও হযরত মুহাম্মদ (সা:) সিজদারত ছিলেন। এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে ফাতিমা (রা:) কে তা বলা মাত্র তিনি দৌড়ে গিয়ে পিতার পিঠ হতে ময়লা সরিয়ে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেন। এ সময় শত্রুরা অটহাসিতে মেতে ওঠে।

নবীজীর প্রাণপ্রিয় কন্যা তাদের প্রতি রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে বললেন, হতভাগারা! ফাতিমা (রা:) রাসুলকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকারী দলের দিকে এগিয়ে তাদের তিরস্কার করলেন। (কাসীর, ২০০৪ : ৩য় খণ্ড, ৪৪) এ সময়ে উকবা ইবনে আবী মুইত ব্যতীত আরও অনেক শত্রু ছিলো। পরবর্তীতে এই উকবা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ধৃত হয়। তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে রাসুল (সা:) তার কৃতকর্মের বিবরণ উল্লেখ করার পর তাকে হত্যার আদেশ দেন। (ইউসুফ, ১৯৮৩ : ২৭১)

আর উহুদ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সামনের দাঁত ভেঙে যায়। তিনি শত্রুপক্ষের তরবারির আঘাতে খুব আহত হন। ফাতিমা (রা:) তা দেখামাত্রই সে রক্ত পরিষ্কার করে তাঁর নিজের হাতে তৈরী করা ঔষধ পিতার সে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিয়ে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। (কাসির, ২০০৪ : ৩৯)

তাঁর পিতা-মাতা আজীবন মানবতার বাণী প্রচার, সমাজের দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের সুরক্ষা ও তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে একটি আদর্শ জীবনের প্রতিচ্ছবি বিশ্বমানবের নিকটে উপস্থাপিত করে গেছেন। তিনিও আজীবন এ আদর্শের বাস্তবায়নে কঠিন সংগ্রাম করে গেছেন।

দানশীলতা

অতি দক্ষতার সাথে হযরত ফাতিমা (রা:) সংসার পরিচালনা করতেন। তিনি নিজস্ব মতামত প্রদানের মাধ্যমে বিবাহে মত দিলেও বিবাহের পরে কঠোর দরিদ্রতার কবলে পতিত হন। কারণ স্বামী হযরত আলি (রা:)-এর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিলো না। তবুও তিনি হাসিমুখে তা মেনে নিয়েছিলেন। সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতে করতেন। এই আর্থিক অবস্থার মধ্যেই সর্বদা মিসকিন ও নও মুসলিমদের আহ্বার করানোর চেষ্টা করতেন। এজন্য প্রায়ই তাকে অভুক্ত থাকতে হতো। তবুও হাসিমুখে তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন।

একদিনের ঘটনা, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দীর্ঘ সময় অভুক্ত ছিলেন। কোনো স্থানে মজুরির বিনিময়ে হযরত আলি (রা:) এক দিরহাম পেয়ে তা থেকে কিছু যব কিনে রাতে বাড়ি ফিরলেন। ফাতিমা (রা:) তখনই যব পিষলেন ও তা হতে রুটি বানিয়ে স্বামীকে খেতে দিলেন। আরেকদিনের ঘটনা, একদিন দুপুরের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা:) ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘর হতে বের হলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা:)-এর সাথে

দেখা হলো। তারাও অভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা:) বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ইসলামের সেবায় সকল সম্পদ দান করার ফলে তিনি দরিদ্রতার কবলে পড়েন। তারা একত্রে খেজুর বাগানের মালিক হযরত আবু আইয়ুব আনসারির বাড়িতে গেলেন। তিনি খেজুর ও খাসি জবেহ করে তাদেরকে খেতে দিলেন। এ সময় রাসুল (সা:) রুটির উপর কিছু মাংস দিয়ে ফাতিমা (রা:)-এর নিকটে প্রেরণের ব্যবস্থা নিলেন। তিনি জানালেন যে, ফাতিমা (রা:) কয়েক দিন অভুক্ত রয়েছেন। (তালিবুল, ১৯৯০ : ১০৬)

একবার বনু সালিম গোত্রের আরাবি নামক এক ব্যক্তি মুসলমান হলো। তাকে দিনের বিষয়াদি শিক্ষা দেবার পর রাসুল (সা:) তাকে একটি উটনী দেবার ব্যবস্থা করলেন। পরে রাসুল (সা:) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার মাথা ঢেকে দেবে? হযরত আলি (রা:) নিজের পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। অতঃপর রাসুল (সা:) বললেন, “তোমাদের মধ্যে কে আছে যে তার খাবারের ব্যবস্থা করবে।” হযরত সালমান ফারসি (রা:) বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে নিয়ে গৃহে গৃহে গেলেন। কিন্তু কেউ খাবার দিতে পারল না। অবশেষে হযরত ফাতিমা (রা:) তার ব্যবহার্য একটি চাদর শামউন ইহুদির নিকটে পাঠালেন ও চাদরটি রেখে নব মুসলিম ব্যক্তিটিকে কিছু দেবার জন্য বললেন। ইতিমধ্যে ইহুদি ব্যক্তিটি মুসলমান হওয়াতে সে কিছু খাবার পাঠাল ও সাথে সাথে চাদরটিও ফেরত দিল। হযরত ফাতিমা (রা:) সাথে সাথে খাবার বানালেন ও আরাবিকে খেতে দিলেন। হযরত সালমান ফারসি বললেন, এ থেকে কিছু খাবার বাচ্চাদের জন্য রেখে দিন। ফাতিমা (রা:) জবাবে বললেন, “যা আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছি, তা আমার পরিবারের জন্য জায়েজ নয়।” (তালিবুল, ১৯৯০ : ১০৬)

বিশ্ব ইতিহাসে ফাতিমা (রা:) একটি অতুলনীয় নাম। তাঁদের সন্তানেরাও ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। সত্যের প্রচারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভবিষ্যত প্রজন্মকে উজ্জীবিত করে তুলবে। তিনি আজীবন সমাজসেবা করে গেছেন। আজকের বিশ্বের চরম সংকটময় মুহূর্তে তাঁর ন্যায় দুর্লভ ব্যক্তিত্বের কর্ম জানা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তব জীবনে তিনি ছিলেন সীমাহীন ত্যাগ-তিতিষ্কার মূর্ত প্রতীক। তিনি মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে হিজরি এগারো সনে ইন্তেকাল করেন। (মাবুদ, ২০১২ : ৭৯)

মদিনার উম্মে আম্মারাহ (জন্ম ৫৮২ খ্রিঃ)

এক সংগ্রামী, সাহসী যোদ্ধা ও প্রগতিশীল নারী এ সময়ে মদিনার বুকে আবির্ভূত হন যার নাম ছিলো উম্মে আম্মারাহ। তিনি আনুমানিক ৫৮২ খ্রিঃ মদিনার বিখ্যাত খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। (জাহাবী, ১৯৭০ : ২৭৮) তাঁর পিতার নাম ছিল কা'আব ইবনে আমর। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় চাচাত ভাই য়ায়েদ বিন আছেমের সাথে। এ পক্ষে তাঁর দু'টি সন্তান ছিলো। তারা হলো 'আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হাবিব (রাঃ)। তাঁরা প্রখ্যাত সাহাবি ছিলেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর আবরাহা (রাঃ) বিন আমরের সাথে তার বিবাহ হয়। এ পক্ষে তাঁর তামিম ও খাওলাহ নামে দু'সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ইসলাম প্রচারে উম্মে আম্মারাহ

তিনি হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা হতে রাসূল (সাঃ)-এর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৬২১ খ্রিঃ মদিনা হতে বারোজন ব্যক্তি এসে মক্কার আকাবা নামক স্থানে এসে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সকল নবদীক্ষিত মদিনার মুসলমানদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য রাসূল (সাঃ) হযরত মুস'আব ইবনে উমায়েরকে মদিনায় প্রেরণ করেন। মদিনায় মুস'আবের ইসলাম প্রচারের সময় উম্মে আম্মারাহ তাঁর পরিবারসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। (হিশাম, ১৯৫৫ : ৪৩৪) মুহাম্মদ (সাঃ) তখন মক্কায় চরমভাবে অত্যাচারিত, নিগৃহিত হয়ে চলেছেন। পৃথিবীতে মানবতার শিক্ষা প্রচার ও প্রসার এ কারণে ব্যাহত হচ্ছিল। এ অবস্থায় মুহাম্মদ (সাঃ) কে এই অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে তাকে মদিনার মুসলমানরা মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত মদিনার অনুকূল পরিবেশে গমন করে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেবার পরিকল্পনা করে। এ দলে হযরত উম্মে আম্মারাহও ছিলেন। কেননা তিনিও অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় ইসলাম গ্রহণ করার পরে মানব সমাজের কল্যাণের জন্য মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রচারিত জীবনদর্শনকে নিজের জীবনে লালনসহ বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ অনুভব করেন। এই প্রত্যাশায় তিনি ইসলামের অনুশাসন সম্পর্কে দীক্ষা লাভ ও রাসূলকে (সাঃ) মক্কা হতে মদিনায় আসার আহ্বানকারী দলে নিজেকে সংযুক্ত করেন। মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় এলে তাঁর

শত্রুরা তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে সকলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে-এই ভয়-ভীতিকে অগ্রাহ্য করে মদিনার মুসলমানদের মধ্য হতে ৭১ জন পুরুষ ও ২ জন নারীর সমন্বয়ে একটি দল গোপনে তৎকালীন আকাবার নির্দিষ্ট স্থানে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সাথে মিলিত হন। (তাবারি, ১৩২০ হিঃ : ২৪৪) উক্ত সৌভাগ্যবান নারীর একজন ছিলেন উম্মে আম্মারাহ খাতুন। রাসুল (সা:) মদিনায় গমন করলে জান-মাল এবং সন্তানসহ তাকে সমর্থন করবেন বলে পুরুষদের সাথে তারাও প্রতিশ্রুতি দেন।

এ দু'জন নারী রাসুল (সা:)-এর সাথে এই বলে শপথ বা বাইয়াত নিলেন যে :

এক: আমরা এক আল্লাহতায়ালার ইবাদত করবো, অন্য কাউকেও তাঁর শরীক করবো না।

দুই: আমরা কখনও ব্যভিচারে লিপ্ত হবো না।

তিন: চুরি, ডাকাতি করবো না।

চার: আমরা কখনও সন্তান হত্যা করবো না।

পাঁচ: আমরা কাউকেই মিথ্যা ও অন্যায়ভাবে দোষারোপ করবো না।

ছয়: আমরা কখনও লোককে প্রতারিত করবো না এবং কোনো অবস্থাতেই গীবত ও চোগলখুরি করবো না।

সাত: আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ মেনে চলবো। (তালিবুল, ১৯৯০ : ৩২৩)

মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে রাসুল (সা:) যখন মহিলাদের শপথ গ্রহণ করেন তাদের উপর কিছু শর্তারোপ করেন, সেখানে সন্তান হত্যার বিষয়টিও রয়েছে। এ বিষয়টি আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “হে নবি, ইমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং অন্য পুরুষের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে নিজ স্বামীর নামে চালিয়ে দেবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন আপনি আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।”(মুমতাহিনা, ১২)

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে

উম্মে আম্মারাহ ছিলেন এমন একজন নারী যিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে মক্কার শত্রুদলের সাথে মদিনার মুসলমানদের বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর মদিনা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের শক্তি ও প্রাধান্য বহু গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এতে করে মক্কায় ইসলামের শত্রুরা রাসুল (সা:)-এর বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মদিনার ইহুদিদের মধ্যে বনু কায়নুকা ও বনু নাযির গোত্রীয় কবি কাব বিন আশরাফ মক্কায় গিয়ে উদ্দীপ্তপূর্ণ কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করে। (হিশাম, ১৯৮১ : ৭৭) আজকের সমাজে মিডিয়া যেমন সমাজের মানুষকে প্রভাবিত করে, সে সময়ে কবিরাজ সমাজে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করতো। ফলশ্রুতিতে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, ইকরাম ও খালিদ বিন ওয়ালিদ (খালিদ তখনও ইসলাম কবুল করেনি) তিন হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনার উপকণ্ঠে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে হাজির হন। এ দলে কিছু নারীও ছিলো।

সংবাদ পেয়ে রাসুল (সা:) আক্রমণ প্রতিহত করতে সেখানে ১০০ বর্মধারী ও এক হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন। তার দলে সৈন্য সংখ্যা ছিলো অপর পক্ষের তুলনায় অতি নগণ্য। হযরত আলি, হযরত আমির হামজা, হযরত আবু দুজানা, হযরত তালহা, হযরত আনাস বিন নজর, হযরত মা'আদ বিন রবি প্রমুখ রাসুল (সা:)-এর দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য কিছু নারীও তাদের সাথে যান। (কায়িম, ১৯৫০ : ৪০০)

রাসুল (সা:) উহুদ পর্বতের পাদদেশে ৫০ জন তীরন্দাজ একটি দলকে থাকতে বলেন। কোনো নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তারা যেন স্থান ত্যাগ না করেন এমন নির্দেশও দেন তাদের। যুদ্ধের প্রারম্ভে মদিনাবাসীর তীব্র আক্রমণে মক্কার শত্রুরা পিছু হটতে থাকে। শূন্য প্রান্তরে তাদের রসদপত্র ও রণসম্ভার পড়ে থাকে। এ সময়ে উম্মে আম্মারাহ (রা:) অন্যান্য নারীদের সাথে মশকে পানি ভরে সৈন্যদেরকে পান করান ও আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। (বুখারি, ২০০৭ : ৫৭৯)

এ যুদ্ধে বিজয় লাভ অনেকটা সুনিশ্চিত ভাবে মুসলিম সৈন্যের দল শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহের জন্য ছুটে আসতে থাকে। সেই সুযোগে কুরাইশ নেতা খালিদ বিন ওয়ালিদের দল মুসলমানদেরকে

পিছনদিক হতে আক্রমণ করে। এভাবে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্যের ফলে মুসলিম সৈন্যরা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। তাদের অসতর্কতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আক্রমণকারী দল। (কায়িম, ১৯৫০ : ৪২৬)

গিরিপথ দিয়ে আসা এদের আকস্মিক আক্রমণে হানযালা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আমির হামযা (রাঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। (হিশাম, ১৯৮১ : ৮০) শত্রুদের হাতে হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) নিহত হন। যিনি দেখতে অনেকটা রাসুল (সাঃ)-এর ন্যায় ছিলেন। এতে গুজব রটে যায় যে, রাসুল (সাঃ) নিহত হয়েছেন। তার নিকটে যে ১১ জন সাহাবি ছিলেন তারা শুধুমাত্র জানতেন যে, রাসুল (সাঃ) জীবিত। অন্যান্যরা শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল বলে গুজব শুনে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (হিশাম, ১৯৮১ : ৮২)

রাসুল (সাঃ) কে হত্যার চেষ্টাকারী ধৃত

শত্রুপক্ষ রাসুল (সাঃ) কে মারতে তরবারি, বাণ ও বর্শার দ্বারা তার নিকটে যাবার চেষ্টা করতে থাকে। সে মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত হযরত উম্মে আম্মারাহ দূর হতে প্রত্যক্ষ করেন রাসুল (সাঃ) শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। লৌহ শিরজ্ঞাণের দু'টি কড়া তার মুখে বসে গিয়েছে। তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েছেন। উম্মে আম্মারাহ পরে জানতে পেরেছিলেন যে, উতবা নামক এক শত্রুর নিষ্কিণ্ড লোহার আঘাতে রাসুল (সাঃ)-এর নিম্নপাটির দাঁতের ডান পার্শ্বের 'রুবাই' নামক দাঁতটি ভাঙার কারণে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

উহুদের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের মতো ভয়ঙ্কর বিপদ মুসলমানদের উপর আর নেমে আসেনি। রাসুল (সাঃ) প্রায় শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। বিশিষ্ট সাহাবিরাও শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছেন ঠিকই তবে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কার কাফিরদের আক্রমণের তীব্রতা এতো জোরালো ছিল যে, অনেক মুসলিম বীর পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের সেই কঠিন পরিবেশেও উম্মে আম্মারাহ সেখান থেকে পিছু হটে যাননি।

ইবনে কামিয়াকে পরাজিত করা

উহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে মক্কার আক্রমণকারী দলের এক অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ ইবনে কামিয়ার নামক ব্যক্তি রাসুল (সা:) কে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তাকে মারার জন্য তরবারি উঠায়। (নু'মানি, ১৯৭৮ : ১০৭) উম্মে আম্মারাহ এ অবস্থা দেখামাত্রই হাতের মশক ফেলে দিয়ে তরবারি ও ঢাল হাতে দ্রুত সেস্থলে পৌঁছে ইবনে কামিয়ার উপর তরবারি উঠিয়ে আঘাত হানলে তরবারিটা ভেঙে যায়। কারণ ইবনে কামিয়া বর্ম পরিহিত ও একজন খুব পটু অশ্বারোহী ছিলো। ফলশ্রুতিতে ইবনে কামিয়া পাল্টা আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যায়। এতে উম্মে আম্মারাহর কাঁধে মারাত্মক আঘাত লাগে। কিন্তু তিনি তাতে মোটেই দমে যাননি। ভাঙা তলোয়ার নিয়েই আবার ইবনে কামিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ইবনে কামিয়া এরপর আর সেখানে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। তখন উম্মে আম্মারাহর ক্ষতস্থান হতে দর দর করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। (নুমানি, ১৯৭৮ : ১২০-১২৫)

রাসুল (সা:) উম্মে আম্মারাহর বীরত্বপূর্ণ লড়াই প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে উম্মে আম্মারাহর কাঁধের ক্ষতে পট্টি বেধে দেন এবং কয়েকজন সাহসী সৈন্যদের নাম উচ্চারণ করে বলেন, আল্লাহর শপথ, আজ উম্মে আম্মারাহ তাদের সবার চেয়ে বেশি বিক্রম প্রদর্শন করেছেন!

উম্মে আম্মারাহ তাঁর নিজ পুত্র অকুতোভয় সাহসী নেতা আবদুল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তিনিও মায়ের মতই সাহসী ছিলেন। রাসুল (সা:) তাকে তার মা উম্মে আম্মা'রাকে সাহায্য করতে নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ দৌড়ে মায়ের নিকটে এসে তরবারির কোপে তাঁর মা যাকে ভূপাতিত করেছিল সে ব্যক্তিকে নিহত করলেন। এই মুহূর্তে এক শত্রু ছুট করে এসে আবদুল্লাহর বাম হাতে আঘাত করে তাকে আহত করলেন। তার হাত দিয়ে অঝোরে রক্ত বরতে লাগলো।

তা দেখে উম্মে আম্মারাহ বিন্দুমাত্রও হা-হুতাশ করলেন না। তিনি নিজের কোমরে ব্যাণ্ডেজের জন্য থাকা সাদা কাপড় টুকরো ছিঁড়ে পুত্রের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে নির্ভীকভাবে বললেন : যাও আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করো। (নুমানি, ১৯৭৮ : ১৫০)

রাসুল (সা:) তার তেজস্বিতা ও বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে তাকে প্রাণভরে দোয়া করলেন। কিছুক্ষণ পরে আরেকজন শত্রু সৈন্য এসে উম্মে আম্মারাহর উপর চড়াও হলে রাসুল (সা:) তাকে সতর্ক করে বললেন, এই নরাধমই তার পুত্রকে আঘাত করেছিলো। উম্মে আম্মারাহ পুত্রের আঘাতকারীর উপর প্রচণ্ডভাবে তরবারি চালিয়ে তাকে কেটে দু' টুকরো করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে রাসুল (সা:)সহ আহত অন্যান্য সৈন্যরা উম্মে আম্মারাহকে সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন।

একটু সুস্থতা অনুভব করলে একটি ঢাল সংগ্রহ করে উম্মে আম্মারাহ কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। আরেক অশ্বারোহী রাসুল (সা:)-এর দিকে অগ্রসর হলে তাকেও উম্মে আম্মারাহ তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেন। শত্রুরা বার বার রাসুলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আর তিনি অন্যান্য অটল সাহাবীদের সাথে মিলে তীর ও তরবারি দিয়ে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এরই মধ্যে আরেক শত্রু সৈন্য উম্মে আম্মারাহর মাথার উপর তরবারি চালিয়ে দিলে উম্মে আম্মারাহ নিজের ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করে শত্রু সৈন্যের পায়ের উপর তরবারি দিয়ে এমন তীব্র আঘাত হানলেন যে, সে ঘোড়াসহ ভূপাতিত হলো। (নুমা'নি, ১৯৭৮ : ১৮৫)

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও রাসুল (সা:) উম্মে আম্মারাহর বীরত্বের কাহিনী উপস্থিত সকলকে বর্ণনা করেন।

তাই উহুদ যুদ্ধে উম্মে আম্মারাহ একজন নারী হয়েও অসীম সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করে যেভাবে মদিনার সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী দলের সাথে চরম বিপর্যয়রোধ করেছিলেন, তা চিরস্মরণীয়। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাকে যথার্থভাবেই তাকে 'খাতুনে উহুদ' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি উহুদ যুদ্ধ ছাড়াও বাইয়াতে রিদওয়ান, খায়বারের যুদ্ধ, উমরাতুল কাদা এবং হুনাইনের যুদ্ধেও অংশ নেন। এক বর্ণনামতে, তিনি মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলের সাথী ছিলেন। (নুমা'নি, ১৯৭৮ : ১৯০)

ভণ্ড নবিদের দমনে

উহুদ যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করা ছাড়াও ভণ্ড নবিদের দমনে উম্মে আম্মারাহর ভূমিকা ছিলো অসাধারণ। রাসুল (সা:)-এর ইন্তেকালের পর মদিনা রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা ধ্বংসে লিপ্ত হলো এক শ্রেণির দুষ্কৃতিকারী। বিশেষত একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী ব্যক্তি ইসলামকে হেয় ও অপ্রিয় করতে

নিজেদেরকে নবি হিসেবে পরিচয় দিয়ে দল গঠন করতে থাকে। তখন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আবু বকর সিদ্দিক (রা:) দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর (৬৩২-৬৩৪ খ্রি:) স্বল্পকালীন শাসনকালের বেশিরভাগ সময় স্বধর্ম ত্যাগের বা রিদ্দা যুদ্ধে পরিপূর্ণ ছিলো।

ভণ্ড নবি মুসায়লামা ছিলো সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহী। সে ভণ্ড নবি সাজাহকে বিবাহ করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। (হিশাম, ১৯৮১ : ৭৭) এদের দমনের জন্য সংঘটিত হয় ভণ্ড নবি মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে ইতিহাসের অন্যতম ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। আরবের অংশবিশেষের নব্যদীক্ষিত মুসলমানগণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, সময় সংকীর্ণতা ও অন্যান্য প্রতিকূলতাবশত ইসলামের মর্মবাণী নিরঙ্কুশভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম না হওয়ায় মুসায়লামার দলে ভিড়তে থাকে। মুসায়লামা নির্যাতন, ধোঁকাবাজি ও উল্টাপাল্টা প্রচারণা চালিয়ে দল ভারী করতে থাকে। এভাবে তার দলে চল্লিশ হাজার ব্যক্তি যোগদান করে। হযরত আবু বকর (রা:)-এর খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে উম্মে আম্মারাহর অপর পুত্র হাবিব বিন যায়েদ (রা:) মক্কা-মদিনার পার্শ্ববর্তী নগর আম্মান থেকে মদিনায় আসছিলেন। পথিমধ্যেই মুসায়লামার অনুচরেরা তাকে জোর করে আটকিয়ে মুসায়লামার নিকটে নিয়ে যায়। মুসায়লামা জোরপূর্বক হাবিব (রা:) কে তার অনুসারী বানানোর চেষ্টা করে। শেষে ব্যর্থ হয়ে তাকে হত্যা করে। (হিশাম, ১৯৮১ : ৮৩)

উম্মে আম্মারাহ নিজের সন্তানের এই মর্মান্তিক ও নির্যাতনমূলক মৃত্যুর সংবাদ শুনে ব্যথিত হলেও সত্যের পথে তাঁর এই মহান আত্মত্যাগে গর্বিতবোধ করলেন ও মুসায়লামার এই কাপুরুষোচিত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন।

মুসায়লামাকে দমন

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) মুসায়লামাকে দমনের জন্য নতুন করে সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করলেন। ইতিমধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ^{১৭} মুসলমান হওয়ায় ইসলামের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পায়। তাকে

^{১৭}. খালিদ বিন ওয়ালিদ ৫৯২ খ্রি: মক্কার কুরাইশ বংশের বনু মাখযুম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হৃদয়বিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন। ভণ্ড নবিদের দমন ছাড়াও আল-হিরা, ইরাক, দামেস্ক, রোমান, সিরিয়া বিজয়ে তিনি সফল সেনানায়ক ছিলেন। তিনি জীবনে একশ'তটিরও বেশি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাকে বিশ্ব ইতিহাসের একজন অপরাহেয়, শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি বলা যেতে পারে। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান ইবনে খালিদও একজন সফল সেনানায়ক ছিলেন। তিনি খলিফা ওসমানের শাসনামলে এমেসার

সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করে ৪ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী ইয়ামামায় প্রেরণ করেন। প্রায় বার্বক্যে উপনীত উম্মে আম্মারাহও (রা:) বয়সকে উপেক্ষা করে খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীতে যোগ দিলেন। ওদিকে মুসায়লামার চল্লিশ হাজার বিশাল সৈন্যের বিপরীতে মুসলমান বাহিনী সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলো। এই অনুপাত ছিলো ৪:১। কিন্তু মুসায়লামার বিশাল বাহিনী খালিদ বিন ওয়ালিদের ক্ষুদ্র বাহিনীর রণকৌশলের নিকট টিকতে পারল না। মুসায়লামার বাহিনী প্রাথমিকভাবে পরাজিত হলো।

মুসায়লামার পুত্র সুরাহবিল তখন যুদ্ধের গतिकে সপক্ষে টানার জন্য সৈন্যদের নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করতে থাকে। তারা জাহিলি যুগের মানসিকতা জাগ্রত করে নতুন গতিতে মুসলমানদের উপর হামলা করে। শত্রু সৈন্যের প্রচণ্ড হামলা ও সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমান সৈন্যরা কিছুটা পর্যুদস্ত অবস্থার সম্মুখীন হলো। বহুসংখ্যক কোরআনে হাফিজ এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন স্ব স্ব গোত্রে বিভক্ত হয়ে স্বীয় পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যাতে তিনি বুঝতে পারেন কোন দলের সৈন্য ইসলামের রক্ষার জন্য বেশি সক্রিয়। এ পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়।

মদিনা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হলে মুসায়লামার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে মুসায়লামা নিজস্ব বাহিনীসহ পার্শ্ববর্তী একটি সুরক্ষিত বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী আক্রমণে মুসায়লামার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুসলিম বাহিনী বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উম্মে আম্মারাহ যেহেতু প্রথম হতে যুদ্ধ করে আসছিলেন। তিনি মনে মনে সুযোগ খুঁজছিলেন কখন পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ আসল। তিনি দূর হতে মুসায়লামাকে দেখলেন। যখন তিনি শত্রুবৃহ ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন কোনো এক শত্রু সৈন্যের তরবারির আঘাতে তার শরীর হতে একটি বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতেও তিনি দমে যাননি। এই আঘাতপ্রাপ্ত শরীরের একটি বাহু নিয়েই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাই প্রবল মানসিক শক্তির কাছে শারীরিক দুর্বলতা যে হার মানে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন তিনি।

গভর্নর ছিলেন। এই জনপ্রিয় সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ফ্রিগেটের নাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ দেয়া হয়েছে। (Encyclopaedia of Britanica online Retrived 17 October, 2006, p-499)

ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর প্রায় ১২০০ সৈন্য শহীদ হয়েছেন। তবুও ইম্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে উম্মে আম্মারাহ মুসায়লামার কাছাকাছি পৌঁছলেন ও মুসায়লামাকে বর্শা নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কোন দিক হতে দু'টি তরবারি এসে মুসায়লামার উপরে নিক্ষিপ্ত হলো। তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ঘোড়ার নিচে পড়লো। উম্মে আম্মারাহ এদিক ওদিক তাকিয়ে পার্শ্বে পুত্র আবদুল্লাহ এবং বিশিষ্ট যোদ্ধা ওয়াহসীকে দেখতে পেলেন ও বুঝলেন এটা তাদেরই কাজ। তাই যুদ্ধের চরম মুহূর্তে একটা হাত হারিয়েও যুদ্ধের ময়দান হতে পিছু না হটে সত্যের পথে অবিচল থেকেছেন। তার এই বীরত্বগাঁথা সত্যাত্মবোধী জাতিকে নব প্রেরণালাভে উদ্দীপ্ত করে। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা:) ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শরীরে ১২ টা ক্ষত হয়েছিলো। সেনাপ্রধান খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা:) শীঘ্রই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। সকলের শুশ্রূষার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, কিন্তু একটা হাত চিরদিনের জন্য হারালেন।

মুসলিম বিশ্বে এই মহিয়সী নারী বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত ওমর (রা:)-এর শাসনামলে এক যুদ্ধে প্রাপ্ত গানিমতের মালামালের মধ্যে একটি মূল্যবান দোপাট্টা বা ওড়না ছিলো। এ ওড়নাটি কে পাবে এ প্রশ্নে একেকজন একেকরকম মতামত দিলেন। কেউ বললেন, খলিফা ওমর (রা:)-এর স্ত্রী কুলসুম বিন আলিকে দেওয়া হোক। হযরত আলি (রা:) সে কথা উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন এটা হযরত উম্মে আম্মারাহরই প্রাপ্য। কেননা ইসলামে তার অবদান অন্যান্যদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। (নুরুন্নাযমান, ১৯৯৭ : ১৮৮)

হযরত সুফিয়া (রা:) (জন্ম সন অজ্ঞাত, আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক)

হযরত সুফিয়া (রা:) মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রাসুল (সা:)-এর আপন ফুফু ছিলেন। তাঁর জন্ম সন জানা যায়নি। তিনি ৬২৭ খ্রি: সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে তিনি তরুণী ছিলেন। তাঁর প্রাক-ইসলামি যুগে হারিছ ইবনে হারবের সাথে বিবাহ হয়। এ পক্ষে তার এক ছেলের জন্ম হয়েছিল। হারিছ আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে রাসুল (সা:)-এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা:)-এর ভ্রাতা আওয়াম ইবনে

খুওয়াইলিদের সাথে পরবর্তীতে তাঁর বিবাহ হয়। এ পক্ষে যুবাইর, সায়িব ও ‘আবদুল কা’বা- নামে তাঁর তিন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায়

আরও অসংখ্য নারী নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র মদিনা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে মক্কার কুরাইশরা যখন রাসুল (সাঃ)-এর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করছিল, তখন এ কথা শুনে মুসলমানগণ হতবিহ্বল হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রাসুল (সাঃ)-এর ফুফু হযরত সুফিয়া (রাঃ) মুসলিম সেনাদলকে সুসংগঠিত করে যুদ্ধ ময়দানে ফিরিয়ে আনেন।

খন্দকের যুদ্ধে (৬২৭ খ্রিঃ)ও এই সাহসী বীর নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই যুদ্ধে রাসুল (সাঃ) মদিনা শহরের তিন দিকের অরক্ষিত স্থানে পরিখা খননের পর রাসুল (সাঃ) মদিনার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ মদিনার বিশ্বাসঘাতক ইহুদি সম্প্রদায় বনু কুরাইযার শত্রুতা হতে নারী ও শিশুদের হেফাজত করার জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেন। (হিশাম, ১৯৮১ : ২১৬) তিনি তাদেরকে মদিনায় ‘আতাম’ নামক একটি দুর্গে স্থানান্তর করেন। রাসুল (সাঃ) হযরত হাসসান বিন সাবিতকে (রাঃ) এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। হাসসান ব্যতীত আর একটি পুরুষও সেখানে উপস্থিত ছিলো না। এই দুর্গটি ছিল বনু কুরায়যার ইহুদিদের মহল্লাসংলগ্ন। এই সুযোগে তাদের একটি দল কেল্লার দিকে অগ্রসর হলো। এক ইহুদি দুর্গ আক্রমণের সুবিধা বোঝার জন্য দুর্গের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ঐ সময়ে রাসুল (সাঃ)-এর ফুফু হযরত সুফিয়া (রাঃ) দুর্গের উপর হতে তা দেখে হযরত হাসসান বিন সাবিতকে (রাঃ) ঐ গুপ্তচর লোকটিকে হত্যা করার জন্য বললেন। তখন হাসসান বিন সাবিত অপারগতা প্রকাশ করলে হযরত সুফিয়া (রাঃ) নিজেই গুপ্তচরটিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দুর্গের একটি খুঁটি উঠিয়ে ইহুদির মাথার উপর এতো জোরে মারলেন যে, গুপ্তচরটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুফিয়া (রাঃ) হাসসানকে লাশের মাথা কেটে আনতে বললেন। তাতেও সে অক্ষমতা প্রকাশ করলো। অগত্যা হযরত সুফিয়া (রাঃ) নিজেই তা করলেন ও মাথাটি দুর্গের উপর হতে নীচে শত্রুবাহিনীর সামনে ফেলে দিলেন। গুপ্তচরের মাথা দেখে ইহুদিরা ভীত হয়ে পড়লো। তারা ভাবল, ভিতরে বহু সৈন্য আছে। শত্রুরা ভয় পেয়ে পলায়ন

করলো। এভাবে সুফিয়া (রা:) সেদিন প্রতিরক্ষায় সাহসী ভূমিকা না রাখলে ফলাফল ভিন্নরূপ হতে পারতো।

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল (আবির্ভাবকাল খো: রাশিদিন)

৬২২ খ্রিস্টাব্দে সাম্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মদিনা রাষ্ট্রে যে কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো, সেখানে মদিনাবাসী উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল এক প্রত্যয়ী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি এ রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিধানে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুসন জানা সম্ভব হয়নি। তিনি খলিফা হযরত আবু বকর (রা:), খলিফা ওমর (রা:)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মুসলিম নারীদের ধর্মীয় কার্যাবলী প্রশিক্ষণে এগিয়ে এসেছিলেন যা ছিলো যুগোপযোগী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে তিনি নিজ ঘরে সর্বপ্রথম মহিলাদের নামায় প্রশিক্ষণের জন্য জামাআতের ব্যবস্থার জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষণ ও একজন মুয়াজ্জিন নিয়োগ করে নামাযের সময় হলে আযান দেবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “যারা সৎকর্ম করবে ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতিদান বিন্দুমাত্র কম হবে না।” (নিসা, ১২৪)

তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন উম্মে ওয়ারাকার সামাজিক উন্নয়নে আরও বড় কৃতিত্ব ছিলো, তিনিও হযরত হাফসা (রা:)-এর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে লিখিত কুরআন নিজের নিকটে সংরক্ষণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা:) পরে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করতে তার নিকটে সংরক্ষিত লিখিত কুরআনের কপি মিলিয়ে নিয়েছিলেন। (মাবুদ, ২০১২ : ১৮০) তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে আহত সৈন্যদের ব্যাণ্ডেজ বাধা, রোগীদের ঔষধসহ সেবাপ্রদান ও খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

উম্মে হারাম (রা:) (আবির্ভাবকাল খো: রাশিদিন)

মদিনার উম্মে হারাম যিনি স্বামী উবাইদা ইবনে আল সামিতের সাথে ৬৩৬ খ্রি: পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদগার্দ তৃতীয় এর সাথে মুসলিম আরব বাহিনীর সংঘটিত কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (মাবুদ, ২০১২ : ১৫৩) এ যুদ্ধে পারস্যের এক লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিরিশ হাজারের মুসলিম বাহিনী অবতীর্ণ

হয়। (Tabari, 1993 : 165) যুদ্ধে আহত মুসলিম সৈন্যদের জন্য দুরের কুপ হতে মশকে করে পানিটানাসহ সেবা-শুশ্রূষার কাজে সহযোগিতাদান করতেন উম্মে হারাম। এমনকি তিনি সর্বপ্রথম একজন মুসলিম মহিলা নৌসেনা হিসেবে এ যুদ্ধে অংশ নিয়ে শ্বেতসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। (মাবুদ, ২০১২ : ১৫৬) এছাড়াও তাঁর বাড়ি মদিনার অন্যতম মসজিদ কুবার পার্শ্বে অবস্থিত থাকায় সেখানে নামায আদায় করতে গেলে রাসূল (সা:) তার বাসায় গিয়ে প্রায়ই বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। (তালিবুল, ২০০৫ : ২৬০) তাই বিশ্ব সভ্যতায় উম্মে হারাম (রা:)-এর কৃতিত্ব ছিলো অনন্যসাধারণ ও অভূতপূর্ব।

চতুর্থ অধ্যায় : উমাইয়াদ ও আব্বাসিদ শাসনামলে নারীর মূল্যায়ণ

- হযরত যয়নব (রাঃ)
- হযরত খনসা বিনতে আমার ইবনে আশ-শারিদ
- জুবাইদা বিনতে জাফর ইবনে মনসুর
- সৈয়দা হুর
- সুতাইতা আল মহামালি
- দাইফা খাতুন
- শাজারুদোর

চতুর্থ অধ্যায় : উমাইয়া ও আব্বাসিদ শাসনামলে নারীর মূল্যায়ণ

এ অধ্যায়ে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও মিশরের ফাতিমীয় শাসনামলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মুসলিম নারীর কৃতিত্ব ও গৌরবগাঁথা সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। এ সময়ে অসংখ্য যোগ্যতাসম্পন্ন নারী ইসলাম প্রচার ও বিশ্বব্যাপী এর বিস্তারে যে রক্তক্ষয়ী ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত যয়নব (রা:) (জন্ম ৬২৬ খ্রি:)

উমাইয়া যুগে একজন সাহসী নারী তাঁর তেজোদ্দীপ্ত কর্ম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সবিশেষ নিবেদিত ছিলেন, তিনি হলেন হযরত যয়নব (রা:)। তিনি মদিনায় ৬ হিজরির ৫ জমাদিউল আউয়াল মোতাবেক খ্রিস্টীয় ৬২৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। (তালিবুল, ১৯৯০, ৪০৭) তিনি হযরত আলি (রা:) ও হযরত ফাতিমা (রা:)-এর তৃতীয় সন্তান ছিলেন। আদর করে নানা হযরত মুহাম্মদ (সা:) তার নাম রাখেন যয়নব। হযরত হাসান (রা:), হযরত হুসাইন (রা:) তাঁর আপন বড় ভাই ছিলেন। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। তিনি বাল্যকাল হতেই ভাইদেরকে আগলিয়ে রাখতেন। উপযুক্ত বয়সে তাঁর চাচাতো ভাই ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে বিবাহ হয়। তাদের উম্মে খাতুন নামে এক কন্যা এবং আলি, আয়ুন, মুহাম্মদ এবং আব্বাস নামে চারজন পুত্র ছিলো। (Belgrami, 1986 : 134)

হযরত আলি (রা.) কন্যা যয়নব ও তাঁর স্বামীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি ৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন। পরে তিনি রাজধানী মদিনা হতে কুফায় স্থানান্তরিত করলে হযরত যয়নব (রা:) স্বামী-সন্তানসহ পিতার সাথে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান

সমাজে মানবতার শিক্ষা প্রচারসহ অন্যান্যের প্রতিকার ও প্রতিরোধে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্ভীক হৃদয়ের অধিকারী হযরত যয়নব (রা.)-এর তীব্র প্রতিবাদ ও জ্বালাময়ী ভাষণ ছিলো অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজ সংস্কার

মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারে প্রভূত ভূমিকা রাখেন। কুফার জনগণ শিক্ষিত হযরত যয়নব (রা:) কে কাছে পেয়ে অতি উৎসাহে তাঁর গৃহে উপস্থিত হতো। তিনি অত্যন্ত সুমধুর ভাষায় জোরালো যুক্তি দিয়ে মানুষকে কুরআন-হাদীস চর্চায় আগ্রহী করে তুলতেন। একদিন তাঁর পিতা হযরত আলি (রা:) কন্যার তেজস্বী বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি তখন আল-কুরআনের সূরা কা-হা-ইয়া-ছা-এর ব্যাখ্যা করছিলেন যা তাঁর পিতাকে সন্তুষ্ট করে। তিনি তাঁর সংগ্রামী চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ ও সুপ্রশস্ত মনোভাবের কারণে বৃহত্তর জনগণের অন্যতম পথ প্রদর্শকে পরিণত হন। তাঁর খ্যাতি ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুফার বাইরের এলাকা হতেও জনগণ তার নিকটে এসে জীবনকে নতুন ছাঁচে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠে। (তালিবুল, ১৯৯০ : ৪০৮)

সংস্কৃতির উন্নয়ন

তিনি সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন। খুব ছোটবেলা হতেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয়। তাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে নানা হযরত মুহাম্মদ (সা:) অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। একদিন তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তখন তার নানা জীবিত ছিলেন। এ অবস্থায় তার মাথার কাপড় পড়ে গেলে রাসূল (সা:) তার ওড়না উঠিয়ে দিয়ে বললেন, “বেটি! আল্লাহর কালাম খালি মাথায় পড়তে নেই।” তিনি ও তার ভাই হুসাইন একদিন খুব মারামারি করছিলেন। তা দেখে রাসূল (সা:) বলে উঠলেন, মারামারিতে আল্লাহতায়াল্লা অসন্তুষ্ট হন। উভয় শিশুর অন্তরই তখন কেঁপে উঠল এবং তারা আর মারামারি করবেন না এ শপথ বাক্য পাঠ করলেন। (তালিবুল, ১৯৯০ : ৪০৬) তাদের মাতাও এতে খুব খুশি হন। এভাবে ধীরে ধীরে হযরত যয়নব (রা:)-এর পুরো পরিবার মানব সেবার নিঃস্বার্থ আদর্শে উজ্জীবিত হন। তাদের পারিবারিক শিক্ষা ছিলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক মর্যাদা পুণরুদ্ধার

তখন এমন একটা যুগ ছিলো যে, মানুষ অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত চিন্তা-ভাবনা হতে মুক্ত হতে জীবনের সকল পর্যায়ে সুশিক্ষার অনুকরণে নিজেদেরকে ক্রমাশয়ে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির

হঠাৎ অবনতি ঘটে। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এই নারী তদানীন্তন সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শঠতা, কপটতা, নিষ্ঠুরতা চলছিল সেসবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অবতীর্ণ হন।

জনগণের মর্যাদা ও হত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাসূল (সা:)-এর আদর্শের ধারক বাহক তাঁর পরিবারের সদস্য হযরত হুসাইন (রা:), হযরত যয়নব (রা.) এর দুই পুত্র আয়ুন ও মোহাম্মদ, কুফার আমীর যিয়াদ কর্তৃক হুসাইন পুত্র জয়নুল আবেদীনকে ফাঁসি দেওয়া ছাড়াও এ পরিবারের আরও বহু সদস্যকে পাষ, নিষ্ঠুর ক্ষমতালোভী ইয়াযিদ ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার প্রান্তরে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে। পরে উল্লাসে মত্ত ইয়াযিদের দরবারে হযরত যয়নব (রা:) প্রবল ঘৃণায় ইয়াযিদের অপকর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেন। কারবালা হতে ইয়াযিদের দরবারে হযরত যয়নবসহ আর এগারো নারীকে এক শিকলে বেঁধে এখান ওখান হতে এলোমেলোভাবে ঘুরিয়ে হাজির করার আগে হযরত হুসাইন (রা:) এর কর্তিত মস্তক পেশ করা হলে সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকনে নিজের অজান্তেই যয়নব (রা:) ফরিয়াদ করে বলে ওঠেন ; হায় আমার প্রিয়! হায় মক্কা তনয়ের' হৃদয়ের ফসল! হায় মুস্তাফা তনয়ার পুত্র। হযরত যয়নব (রা:) এর হৃদয়বিদারক আত্মচিন্তাকারে মুহূর্তের মধ্যে দরবারের সকলের হাসি-আনন্দ নিভে যায়।

তিনি মুহূর্তে শোককে শক্তিতে পরিণত করে বাঘের মতো গর্জে উঠে বললেন, আমাদেরকে এই হালে ফেলে ও মুঠোর মধ্যে পেয়ে বোধহয় মনে করছিস যে, পৃথিবীর সবকিছু থেকে আমাদের বঞ্চিত করে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত লাভ করেছিস। আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমার দৃষ্টিতে তোর মতো কাপুরুষ আর কেউ নেই। তোর এক কড়ি মূল্যও আমার নিকটে নেই। (আল-লুহুফ, ১৯৭৬ : ১৩৩)

অতঃপর হযরত যয়নব (রা:) ও ইয়াযিদের মধ্যে কিছুক্ষণ বাকযুদ্ধ চলে এবং এ বাকযুদ্ধে ইয়াযিদ চরমভাবে লাঞ্চিত হয়। (Husayan Ibn Ali, Wikipedia) সিরিয়ার এক লোক ইমাম হুসাইনের (রা.) কন্যা ফাতেমা ইবনে হুসাইনকে দাসী হিসেবে পাওয়ার জন্য ইয়াযিদের কাছে অনুরোধ জানায়। এতে ফাতেমা ভয় পেলে হযরত যয়নব (রা:) তাকে সাজ্বনা দিয়ে বলেন; শান্ত হও; এ হওয়ার নয় ; এমনকি ইয়াযিদও তোমাকে দাসী বানাতে পারবে না। এতে ইয়াযিদ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, চাইলে সে ফাতেমাকে দাসী বানাতে পারে।

কিন্তু যয়নব দৃঢ়তার সাথে বলেন, তা পারবে না সে। পরবর্তীতে সিরিয় লোকটির দুহাত অবশ হয়ে যায় এবং সেখানেই সে মারা যায়। (ইবনে তাউস, ১৯৯৮ : ২৬০)

ভীত ইয়াজিদ তখন হযরত যয়নব (রা:), হযরত হুসাইন (রা:) এর অতিশয় সুন্দরী, যুবতী কন্যা সাকিনাসহ তাদের পরিবারের অন্যান্য ধৃত নারী ও শিশুদেরকে মদিনায় পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তাই বলা চলে, মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারে হযরত হুসাইন (রা:)-এর বীরত্বের আভা যার উপর বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল তিনি হলেন তাঁর বোন হযরত যয়নব (রা:)। রাজনীতির এই মহাদুর্যোগে হযরত যয়নব (রা:)-এর পুত্র ও ভ্রাতারা সমাজের বৈষম্য, অসাম্যের বিরুদ্ধে মানুষের ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জীবনদান করে যে নযীর স্থাপন করে গেছেন তা বৃথা যায়নি। তাদের এ আত্মত্যাগ যুগে যুগে পথদ্রষ্ট মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে হযরত যয়নব (রা:)

ইসলামের এ নতুন সমাজে মানুষের দরিদ্রতা ও অভাব ছিলো প্রকট। তখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তাকে পরিবার হতে বের করে দেয়া হতো। তিনি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে সচেষ্ট ছিলেন।

স্বামী বড় ব্যবসায়ী হওয়াতে জীবনে অর্থ-সম্পদের কোন অভাব তাদের ছিলো না। ঘরে চাকর-চাকরানী থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বহস্তে সংসারের সকল কাজ করাসহ অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে জীবন অতিবাহিত করতেন। ঘরে আসবাবপত্র বলতে তাকিয়া (শোবার স্থান), সামান্য তৈজসপত্র ভিন্ন তাদের আর কিছুই ছিলো না। অর্থসম্পদ জমা করে না রেখে তারা তা দান করে দিতেন। তারা এত বেশি দান করতেন যে, দান পাওয়ার অযোগ্যরাও তাদের নিকট হতে দান পেয়ে যেত। যে কেউ অর্থ চাইলেই সে আর তাদের নিকট হতে নিরাশ হতো না। (তালিবুল, ১৯৯০ : ৪১০) এ বিষয়ে কেউ কিছু বললে তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ বলে উঠতেন, সৃষ্টিকর্তা আমাকে সম্পদ দান করেছেন যেন আমি অপরের জন্য কিছু করতে পারি। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছুই রাখতেন না তারা। এজন্য হযরত যয়নব (রা:)-এর স্বামী আবদুল্লাহ সমাজে ‘দয়ার সাগর’ বা দানশীল ব্যক্তি হিসেবে সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। (Belgrami, 1986 : 134)

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেওয়া এই মহান মানুষদেরকে কি ভয়ঙ্করভাবেই না কারবালার প্রান্তরে অত্যাচারী, পাষণ্ড ইয়াজিদ ও তদীয় দোসররা শেষ করার চেষ্টা করে কিন্তু তারা নিঃশেষিত তো হনইনি বরং স্বকীয় মর্যাদায় আদর্শ হয়ে পৃথিবীতে অমর হয়ে রয়েছেন। কারবালার বিয়োগান্তিক ঘটনার পর মুসলিম বিশ্বে শিয়া নামে একটি মুসলমান দল বা গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। ইরানে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে।

হযরত খানসা বিনতে আমার ইবনে আশ-শারিদ (মৃত্যু ৬৬৩ খ্রিঃ)

উমাইয়া শাসনামলে হযরত খনসা (রাঃ) বিনতে আমার ইবনে আশ-শারিদ নামক এক নারী সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়নে বহুমুখী অবদান রেখেছিলেন। আরবে তিনি কবি হিসেবে এতো সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে তাঁর সুখ্যাতি আরবের বাইরেও প্রচারিত হয়েছিলো। এমনকি তিনি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে যুদ্ধে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে ইতিহাসে এক আলোচিত নারী হিসেবে চিহ্নিত।

হযরত খনসা (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম ছিলো ‘তুমাদির’। ছোটবেলা হতে তিনি অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন বলে সকলে তাকে খানসা নামে সম্বোধন করতো যার অর্থ হলো বন্যাগাভী বা হরিণী। (তালিবুল, ১৯৯০ : ২০৯) তিনি আরবের নজদ এলাকায় একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত রুচিশীল ও সৌখিন ছিলেন। একটু প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে তাঁর অভিভাবকরা তাঁর স্বগোত্রের রাওয়াহা ইবনে আবদুল উযযার সাথে বিবাহ দেন। প্রথম স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তিনি মিরদাস ইবনে আবি আমরকে বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষে তাঁর আবদুল্লাহ ও দ্বিতীয় পক্ষে ইয়াযিদ, মু’আবিয়া এবং উমরি নামে এক কন্যা ছিলো।

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে ৬৩৬ খ্রিঃ পারস্যের সাথে মুসলিম বাহিনীর এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তদানীন্তন আরবের ইরাকের মধ্যে অবস্থিত কাদেসিয়া নামক অঞ্চলে এ যুদ্ধ হয়েছিলো বিধায় এটি ইতিহাসে কাদেসিয়া যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত। এ যুদ্ধে তিনি নিজের পুত্রসহ অংশগ্রহণ করে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। এটি ব্যতীত আরও কিছু যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি সরকার হতে বৃত্তিধারী ব্যক্তি ছিলেন। তা ছিলো বার্ষিক দুইশত দিরহাম। (তালিবুল, ১৯৯০ : ২১৬)

তাঁর স্বামী মিরদাস ছিলো অমিতব্যয়ী। সে নিজের সম্পদ নষ্ট করে ফেলে। হযরত খানসা (রাঃ)-এর আর্থিক দৈন্যতা দেখে তাঁর ভাই সাখার নিজের অর্ধেক সম্পদ বোনকে উপহার হিসেবে দেন। আবারও সে সম্পদ মিরদাস নষ্ট করলে পুনরায় সাখার স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও নিজের অবশিষ্ট সম্পদ বোনকে দান করেন। কিন্তু এতেও তার সংসারে সুখ প্রতিষ্ঠিত হলো না। মিরদাস মারা যান। ইতিমধ্যে হযরত খানসা (রাঃ) একজন কবি হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করেছেন। পরবর্তীকালে তার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল বড় ভাই সাখার এক গোত্রীয় যুদ্ধে মারা গেলে ভাই এর বিচ্ছিন্নতায় হযরত খনসা (রাঃ) একের পর এক মরসিয়া বা গীতি কবিতা রচনা করতে থাকেন। ভাব-বিন্যাস ও রচনশৈলীর কারণে এ মরসিয়াগুলো সেকালের সাংস্কৃতিক অঙ্গণে জনপ্রিয় হয়। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮৬ : ১০২)

এভাবে হযরত খানসা (রাঃ) মানুষের নিকটে একজন পছন্দের কবি হওয়ার কারণে আরবে যে সকল কবিতার আসর বসতো তাতে এসে উপস্থিত হতেন। আর লোকজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর আবৃত্তি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতো। আরবে প্রতি বছর যে আন্তর্জাতিক মেলা ওকায় মেলা অনুষ্ঠিত হতো তাতে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। উটের পীঠে বসা অবস্থায় লোকজন তাকে ঘিরে ধরতো আর তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সকলকে শুনাতেন। (মাবুদ, ২০১২ : ২২৬-২৭) তাঁর এই অনন্য প্রতিভার জন্য তিনি উমাইয়া যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উমাইয়া যুগের আরেক কবি জারিব (মৃত-১১০ হিজরি) পর্যন্ত সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খানসাকে স্বীকৃতি দান করেন। আর বর্তমানকালের মিসরীয় পণ্ডিত ড. উমার ফাররুখ খনসার কাব্য প্রতিভা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা হলো : খানসা সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তাঁর কবিতা সবই খণ্ড খণ্ড। অত্যন্ত বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, সূক্ষ্ম, শক্ত গঠন ও চমৎকার ভূমিকা সম্বলিত তাঁর কবিতায় গৌরব গাঁথার প্রাধান্য অতি সামান্য। যতটুকু আমরা দেখেছি, বিশেষত তার দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি যে দুঃসহ ব্যথা পান সেজন্য মরসিয়ার প্রাধান্য অনেক বেশী। (মাবুদ, ২০১২ : ২২৮) এই কীর্তিমতী নারী এক মতে হিজরি ২৪ সন মোতাবেক ৬৪৪-৪৫ খ্রি: অথবা আরেক মতে, তিনি হিজরি ৪২ সন মোতাবেক ৬৬৩ খ্রি: মৃত্যুবরণ করেছিলেন। (মুসলেহউদ্দীন, ১৯৮৬ : ১০২)

জুবাইদা বিনতে জাফর ইবনে মনসুর (মৃত্যু ৮৩১ খ্রিঃ)

ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় খিলাফতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিলো। এ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে খলিফাদের সুযোগ্য স্ত্রী, কন্যারাও এগিয়ে এসেছিলেন। তন্মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রিঃ) এর কন্যা খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদা বিনতে জাফর ইবনে মনসুর। তাঁর জন্মতারিখ জানা যানা যায়নি তবে আনুমানিক মৃত্যুসন পাওয়া গেছে। তিনি ৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। (হাসান, ২০০৪ : ১৯৭) জুবাইদা ছিলেন আব্বাসীয় শাসকদের রাজকন্যাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তাঁর জন্মের সময়ে আব্বাসীয় শাসনামলের স্বর্ণযুগ চলছিলো। তাঁর পিতা, পিতামহ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলো। এই বিদূষী, বুদ্ধিমতী নারীর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিলো অপারিসীম। তিনি স্বামী খলিফা হারুন-অর-রশীদ অপেক্ষা একবছর বয়সে বড় ছিলেন। খলিফা সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। (Saudi Aramco world, vol-67 : 45)

সঠিক জলসেচ করে জনগণের প্রয়োজন লাঘবের জন্য তাঁর গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে আরও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। এ এলাকা ছিলো মরুময়। পানির উৎস থাকলেও তা জনকল্যাণে ব্যবহার করার জন্য তিনি চিন্তা করেন। সম্রাজ্ঞী জুবাইদা প্রতিবছর হজ্জ পালন করতে বাগদাদ হতে মক্কায় গমন করতেন। তিনি তাঁর পঞ্চম বারের হজ্জ পালন করতে গেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে ব্যাপক। পানির কষ্টে অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের ন্যায় তিনিও পেরেসান ছিলেন। তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন যে, পানির সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি তিরিশ লাখ দিনার অর্থদান করে মক্কা হতে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ঝরণা হতে খাল কেটে মক্কা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করে হজ্জযাত্রীসহ জনগণের পানির কষ্ট লাঘব করেন। এটি নহরে জুবাইদা নামে পরিচিত, যার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। সম্রাজ্ঞী জুবাইদার এই বিশাল কর্মযজ্ঞ তদানীন্তন সময়ে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলো। এ সংস্কার কার্যক্রম এখনও তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে যা অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। (Saudi Aramco, 2016 : 46)

সৈয়দা হুর (জন্ম আনু: ১০৪৮ অথবা ১০৫২ খ্রি: ও মৃত্যু ১১৩৮ খ্রি:)

মুসলিম জাতির আলোচিত নারীগণের ইতিহাস অনুসন্ধান সৈয়দা হুর নামীয় এক মহিয়সী নারীর কথা জানা যায়, যিনি সমাজ উন্নয়নে বহুমুখী অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বংশ পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তিনি নারী হয়েও তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র ইয়েমেনের^{১৮} শাসক হন। তাঁর জন্ম হয়েছিলো হেজাজ বা আরবে ৪৪০ মতান্তরে ৪৪৪ হিজরি সন মোতাবেক ১০৪৮ অথবা ১০৫২ খ্রি:। তাঁর প্রকৃত নাম হলো ‘আরওয়া’। কিন্তু তিনি প্রতিপালিত হন ইয়েমেনের রাজপ্রাসাদে। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, তিনি নিজ এলাকা হতে শিশুবস্থায় অপহৃত হয়ে ভাগ্যক্রমে ইয়েমেনের রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পান। ইয়েমেনের রাণী আসমা বিনতে শিহাব এর উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও যত্নে মেধাবী আরওয়া একজন চৌকষ নারী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকেন। (Hambly, 1999: 117-130) তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বলে রাজপ্রাসাদের সবাই তাকে হুর নামে ডাকতেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, আধ্যাত্মিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুর্যের কারণে পরিণত বয়সে তাঁকে ইয়েমেনের শাসক আল সুলাইহি পুত্র আল মুসতানসির আহমেদ আল মুকাররম এর সাথে ১০৮৬ খ্রি: বিবাহ দেন। ১০৩৮ খ্রি: এতদাঞ্চলে উত্তর আফ্রিকা হতে আগত ইসলাম প্রচারক আলি বিন আবদুল্লাহ আল-জায়াহির মাধ্যমে শিয়া মতাদর্শের বিস্তৃতি ঘটে। তাঁর অনুগত সহযোগি আলি বিন আবদুল্লাহ আল সুলাইহি এখানকার শাসক হন। (Ali, 1992 : 78) পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে সৈয়দা হুর এখানে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলার প্রয়াস পান।

রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

সৈয়দা হুর ইয়েমেনের সমাজ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী মুকাররম কোন এক যুদ্ধে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় অসমর্থ হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রের এই দূর্যোগময় মূহুর্তে সৈয়দা হুর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১০৮৪ খ্রি: তাঁর শ্বশুর আল-সুলাইহি যুদ্ধে নিহত হলে সৈয়দা হুর সভাসদগণের বিশেষ বিবেচনায় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন চালু করেন। ইয়েমেন তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া মতাদর্শে

^{১৮} . ইয়েমেন ও তায়েফ ছিলো প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত দক্ষিণ আরবের দেশ। হিয়াযী আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন আদনান। তিনি হযরত ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম (আ:) এর ৪০ তম অধঃস্তন পুরুষ। আদনান হতে ইয়েমেনের বিখ্যাত এডেন নগরীর নামকরণ করা হয়।

বিশ্বাসী মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পায়। এর পশ্চাতে সৈয়দা হুর এর অবদান থাকলেও তিনি জোরপূর্বক জনগণের উপর এ মতবাদ চাপিয়ে দেননি। জনগণ স্বেচ্ছায় এ মতবাদে দীক্ষিত হতে থাকে। সৈয়দা হুর তাঁর আচরণের মাধ্যমে জনগণের অন্তর জয় করেন। (Ali, 1992 : 100)

রাজধানী স্থানান্তর এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন

ক্ষমতা প্রাপ্তির পর তিনি শাসনকার্যের সুবিধার্থে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ইয়েমেনের তৎকালীন রাজধানী হিসেবে সানা'র যাত্রা তাঁর শশুর আলি বিন আবদুল্লাহ আল-সুলাইহির সময়ে শুরু হয়েছিল। হুর শাসনকার্যের সুবিধার্থে 'দুযিবলা' নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি 'দুযিবলা'কে শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এখানে একটি সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পাশাপাশি মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেন। তখনকার যুগে মসজিদ ও মাদরাসা ছিলো জ্ঞান বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু হলে তারই তৈরীকৃত কোন এক মসজিদের পাশে তাঁকে সমাধিস্থা করা হয়। তবে তাঁর মৃত্যুর পর সানা পুনরায় ইয়েমেনের রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়। (Lakeland, 1993 : 139-58)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসার সম্প্রসারণ

তাঁর উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। সুদূর অতীতকাল হতে ভারত থেকে আরব বণিকদের মাধ্যমে হাতির দাঁত, মশলা দ্রব্য ও নানাবিধ বাণিজ্য-সামগ্রী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ইউরোপে প্রেরিত হতো। লোহিত সাগর পথে মিশরের সিন্ধ রুট ব্যবহার করে আরবীয় বাণিজ্য জাহাজ গুজরাটের মালাবার দ্বীপপুঞ্জে আসতো। তাঁর সময়ে এ বাণিজ্যিক লেনদেন আরও বৃদ্ধি পায়। (Doftary, 2005 : 227)

সাংগঠনিক দক্ষতা

সৈয়দা হুরের সাংগঠনিক প্রতিভা দেখে মিশরের খলিফা আল-মুসতানসির তাকে মিশরের ফাতিমীয় রাজবংশের ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত করেন। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে মিশরের পরিবর্তে ইয়েমেনকে ধর্মীয় এ মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। (Hamdani, 1934 : 307-324)

সৈয়দা হুর্ নিজ রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ মতাদর্শের প্রচারকার্যে সফলতা লাভের পর ১০৬৭-৬৮ খ্রি: ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল প্রেরণের নামে ভারতের গুজরাটে একটি প্রচারকদল প্রেরণ করেন। এ দলটি গুজরাটে ব্যাপক প্রচারণা চালালে স্থানীয় দলিত ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশ এ মতাদর্শ গ্রহণ করেন, যা প্রচার কার্যে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দেয়। (আরনল্ড, ২০০০ : ৩৯)

৫৩২ হিজরি মোতাবেক ১১৩৮ খ্রি: তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই ইয়েমেন হতে প্রায় একশত বছরের সুলাইহিদ রাজবংশের অবসান ঘটে। (Hamdani, 1934 : 330) নারী স্বাধীনতা ও মুক্তির সেই কঠিন সময়ে ফাতিমীয় প্রচারণা ও ধর্মীয় মতাদর্শ বিভাগের প্রধানের মর্যাদা প্রাপ্তি ছিলো এই দীর্ঘজীবী মহিয়সী নারীর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সুতাইতা আল মহামালি (মৃত্যু আনু: ৯৩৭ খ্রি:)

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক হতে পৃথিবীতে নতুন করে বস্তু ও জগৎ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ শুরু হয়। এ সময়ে বহু বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নারীরাও যোগ দেন। তেমনি একজন ছিলেন ইরাকের সুতাইতা আল মহামালি। যিনি খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষার্ধ্বে বাগদাদে বিজ্ঞান চর্চায় ব্রতী হন। তাঁর পূর্ণ নাম আমাত আল ওয়াহিদ সুতাইতা আল মহামালি। তিনি বাগদাদের একটি ইরানি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত জন্মতারিখ জানা যায়নি। তাঁর পিতা আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন একজন প্রথিতযশা বিচারক ও লেখক ছিলেন। (Khatib, 1931: 370) সুতাইতা আল-মহামালি পিতার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াও আবু হামজা বিন কাশেম, ওমর বিন আবদুল্লাহ আজিজ আল হাশিমি প্রমুখ বিখ্যাত শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন।

গণিত শাস্ত্রের উন্নয়ন

তিনি গণিত শাস্ত্রের বিকাশে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। পাটিগণিতের পর্যায়ক্রমিক যোগ-বিয়োগ বিষয়ক সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন তিনি। এমনকি তিনি বীজগণিত সম্পর্কীয় দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করেছেন যা দ্বারা মানব প্রজন্ম ভীষণভাবে উপকৃত হয়। (Faraj, 1904 : 161-202) বিজ্ঞান চর্চা ব্যতীত তিনি আরবী সাহিত্য, হাদিস শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইতিহাসবিদ ইবনে আল-

জাওযি, ইবনে আল-বাগদাদি এবং ইবনে খাতিব তার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী এই নারী মানব সভ্যতার বিকাশে সুদূরপ্রসারী অবদান রেখে ৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
(Khatib, 1931: 401)

ইসমাত-আদ-দিন খাতুন (১১৮৬ খ্রি:)

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে প্যালেস্টাইনে ইসমাত-আদ-দিন খাতুন এর জন্ম। তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত। ইসমাত খাতুন শব্দের অর্থ হলো অভিজাত মহিলা। তাঁর পিতা মুইন উদ্দিন উনুর উত্তর আফ্রিকার ফাতিমীয় খিলাফতের অধীনে থাকা শাম বা সিরিয়া নামক রাষ্ট্রের রাজধানী দামেস্কের (শাসনকাল আরম্ভ ১১৩৮ খ্রি:) আমির ছিলেন। (Humphreys, 1994 : 43)

রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা

তখন বিশ্বে ধর্ম নিয়ে সৃষ্ট তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এতে সমগ্র আরব, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিশেষত তিন শতাব্দী ধরে খ্রিস্টান-মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ 'ক্রুসেড' এর কারণে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়।

এ কঠিন যুদ্ধের ডামাডোল যখন চলছিলো তখন তিনি ছিলেন সিরিয়ার রাজকুমারী। সে সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল, আলেপ্পো ও মসুল শহর ক্রুসেডার কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মুসলমানদের হস্তচ্যুত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তাঁর পিতা মুইনউদ্দিন আলেপ্পোর শক্তিশালী শাসক বীর যোদ্ধা নুর উদ্দিন জঙ্গির (১১৪৬-৭৪ খ্রি:) সহায়তা কামনা করেন। নুর উদ্দিন জঙ্গি ইসমাত খাতুনের পিতার অনুরোধে এডিসা পুনরুদ্ধারসহ ক্রুসেডারদের আক্রমণ হতে সিরিয়াকে রক্ষা করেন। এটি ছিল দ্বিতীয় ক্রুসেড (১১৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। এ যুদ্ধের পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নুর উদ্দিন জঙ্গি অনিন্দসুন্দরী রাজকুমারী ইসমাত খাতুনকে বিবাহ করেন। (William, 1943: 395) সমাজ, রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য ইসমাত খাতুন এ বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণেই দামেস্কের উত্তরাঞ্চল, আলেপ্পো, মসুল আবারও নুর উদ্দিন জঙ্গির শাসনাধীনে আসে। কিন্তু ঘন ঘন যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে ইসমাত খাতুনের স্বামী নুর উদ্দিন জঙ্গি ১১৭৪ খ্রি: কোন এক যুদ্ধের আঘাতজনিত কারণে মারা যান।

ত্রুসেডার আমালরিককে দমন

স্বামীর মৃত্যুর পরে ক্ষমতা ইসমাত খাতুনের হাতে আসে। ক্ষমতা গ্রহণের পরে ইসমাত খাতুন ত্রুসেড দমনে আত্মনিয়োগ করেন। সেনানায়ক ও শাসক নুর উদ্দিন জঙ্গির মৃত্যুর সাথে সাথেই ত্রুসেডাররা নতুন করে জেরুজালেমের খ্রি: শাসক প্রথম আমালরিক এর নেতৃত্বে সিরিয়ার 'বেনিয়াস' শহর অবরোধ করে। সিরিয়ার সিংহাসনে আসীন রাণী ইসমাত খাতুন ত্রুসেডারদের হতাতে তাদেরকে উৎকোচ গ্রহণের অনুরোধ করেন। রাজা আমালরিক সিরিয়ার কাগারে বন্দী তাঁর বিশজন খ্রি: সৈন্যকে মুক্তিদান ও নগদ অর্থ গ্রহণ সাপেক্ষে প্রায় দুই সপ্তাহ পর অবরোধ প্রত্যাহার করলে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব রক্ষা পায়। এভাবে তিনি সুকৌশলে বহিঃআক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করেন। (Humphreys, 1994 : 60)

রাজনীতি চর্চা ও গাজি সালাউদ্দিন আইয়ুবী (শাসনকাল : ১১৭৪-১১৯৩ খ্রি:) এর সাথে বিবাহবন্ধন

নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসমাত খাতুন পরবর্তীতে প্যালেস্টাইন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের শাসক ও ত্রুসেড বিজয়ী সেনাধিনায়ক গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে ১১৭৬ খ্রি: বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গাজি সালাহউদ্দিন সিরিয়াকে ফাতিমীয় খিলাফতের অধীনতা হতে মুক্ত করেন। (হাসান ও কাদের, ২০১২ : ৭৯) ইসমাত খাতুন সিরিয়ার শাসক হিসেবে সিরিয়াতে বসবাস করতেন আর গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী প্যালেস্টাইন অঞ্চলের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জেরুজালেমে থাকতেন। কিন্তু তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১১৮৬ খ্রি: রাণী ইসমাত খাতুন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর সহযোগিরা স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ অসুস্থ সুলতান গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নিকটে গোপন রাখেন। প্রায় তিনমাস এ সংবাদ গোপন রাখা হয়। এই সময়ে তিনি পূর্বের মতোই প্রিয়তমা পত্নীকে উদ্দেশ্য করে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। পরিশেষে তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন। ইসমাত খাতুনকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের 'জামা-আল-জাদিদ' নামক এলাকায় সমাধিস্থ করা হয় যার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। (Malcom & Jackson, 1982 : 135)

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক

তিনি বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন। মানুষের উন্নতি ও মুক্তির অন্যতম শর্ত হচ্ছে শিক্ষা-এটি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত মাদরাসার নাম ছিলো ফিরদাউস।

(Malcom & Jackson, 1982 : 167)

পরিশেষে বলা যায়, তিনি তদানীন্তন রাজনৈতিক সমস্যা উপলব্ধি করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সৃষ্ট সহিংসতা দূর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হন।

দাইফা খাতুন (মৃত্যু আনু: ১২৪২ খ্রি:)

খ্রিস্টীয় এয়োদশ শতকে উত্তর আফ্রিকার মিশরে দাইফা খাতুন নামীয় এক খ্যাতিমান মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ফাতেমীয় সুলতান আল-আদিল এর সুযোগ্য কন্যা ছিলেন। তাঁর জন্মতারিখ জানা যায়নি। ১২১২ খ্রি: খালাতো ভাই গাজি সালাইউদ্দিন আইয়ুবির পুত্র আয জহির গাজির সাথে তাঁর বিবাহ হয়। জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এই বিয়ের মাধ্যমে দুই পরিবারের মধ্যে বিরাজিত দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। (Ruggles, 2000 : 21)

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ

তিনি প্রথমে ছিলেন রাজকুমারী, পরবর্তীতে হলেন প্যালেস্টাইনের রাজবধু। পারিবারিক কারণ ও নিজস্ব যোগ্যতায় এই বিদুষী নারী প্রথম হতেই রাজকার্যে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর স্বামী আয যহির গাজি ১২১৬ খ্রি: অকালে মৃত্যুবরণ করলে তিনি নাবালক পুত্র আল-আজিজ মুহাম্মদ এর পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু আপনজনদের মৃত্যু যেন তার পিছু ছাড়ে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে পুত্র মুহাম্মদের মৃত্যু ঘটলে সকলের অনুরোধে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার নিয়ে সুলতানা উপাধি গ্রহণ করেন। (Humphreys, 1977 : 266)

শাসন সংস্কার

শাসক হিসেবে তিনি অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারীনি ছিলেন। তিনি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য ও বিশ্বস্ত মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন, যার দায়িত্বে ছিলেন জামাল আদ-দিন আল কিফতি, ইকরাম আদ-দৌলা, ইকবাল আয জাহিরি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। শেষোক্তজন প্রথম জীবনে তাঁর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর উপদেষ্টা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন শামস-উদ্দিন লুলু আল আমিনি, ইয়উদ্দিন উমর আল-মাযালি। সরকারি সকল আদেশ, নিষেধ তাঁর চূড়ান্ত অনুমতিতে পাশ হতো। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যে

আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। মিশর ও সিরিয়ার দুই শাসকও তাঁর মতের বিরোধীতা করার সাহস পাননি। নাতি আন-নাসির ইউসুফ এর সময়েও তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর নাতি ছিলেন তখন মাত্র সাত বছরের বালক। (Humphreys, 1999 : 206)

নারী শিক্ষার প্রসার

নারী শিক্ষার উন্নয়নে সিরিয়ার আলেপ্পোয় বাব আল মাকাম জেলায় রাণী ইসমাত-আদ-দিন খাতুন যে ফিরদাউস মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন তা রাণী দাইফা খাতুন পূর্ণ:সংস্কার করেন, যার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। (Humphreys, 1977 : 163) কুটনৈতিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ এই রাণী ৬৪০ হিজরি মোতাবেক ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (Humphreys, 1977 : 263)

শাজারুদ্দোর

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর আফ্রিকার মিশরসহ সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিতে শাজারুদ্দোর (شجر الدر) ছিলেন বিশেষভাবে পরিচিত এক নারী। শাজারুদ্দোর শব্দের অর্থ মুক্তাবৃক্ষ। তিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাসী হিসেবে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর হেরেম হতে রাজকীয় উপটৌকন হিসেবে মিশরে আসেন ও যোগ্যতাবলে আইয়ুবি রাজমহলে খ্যাতি অর্জন করেন। তখন মিশরের শাসনক্ষমতায় ছিলেন সুলতান আস-সালিহ আইয়ুব (শাসনকাল ১২৪০-৪৯ খ্রি:)। সুলতান সালিহ আইয়ুব, জাতিতে তুর্কি মতান্তরে আর্মেনিয়ান জাতিভুক্ত শাজারুদ্দোর এর প্রতি আকর্ষিত হন। তাঁর গর্ভে সুলতানের ঔরসজাত খলিল নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। খলিলের উপাধি ছিলো আল-মালিক আল মনসুর। খলিলের জন্মের পর সুলতান শাজারুদ্দোরকে বিবাহ করে তাকে আল-মালিক ইসমাত আদ্দিন উম্মে খলিল উপাধি দেন। তাঁর পুত্র খলিল অসুস্থতাজনিত কারণে মাত্র পনের বছর বয়সে মারা যান। (কাদের ও হাসান, ২০১২ : ৯৭) পরবর্তীতে নিজ যোগ্যতাবলে শাজারুদ্দোর একজন দূরদর্শী, প্রজ্ঞাবান মুসলিম শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রশাসনিক দায়িত্বপালন

ক্রুসেড এর কারণে তখন পৃথিবী অশান্ত হয়ে পড়েছিলো। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক Gibbon বলেন, “ খ্রিস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে।” (The Crusades, 1870 : 90) মিশরের রাণী শাজারুদোর এ চরম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতি গঠনে এগিয়ে আসেন। আস-সালেহ আইয়ুব সপ্তম ক্রুসেডে ১২৪৯ খ্রি: খ্রিস্টানদের নিকট থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। তখন খ্রিস্টান অধিপতি ফ্রাঙ্ক রাজা নবম লুই ২৮০০ জন ফরাসি নাইটসহ ইংল্যান্ড, সাইপ্রাস ও সিরিয়া হতেও বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রো অভিযান করেন। এটি ছিলো অষ্টম ও সর্বশেষ ক্রুসেড। ১২৪৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজধানী কায়রো হতে দূরে দামাইতা শহরের কাছাকাছি ‘আশয়ুম তানা’ নামক স্থানে ক্রুসেডারদের সাথে মিশরীয় বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধে সুলতান সালেহ আইয়ুব জয়ী হলেও মনসুরিয়া শহরে যুদ্ধাবস্থায় আহত হয়ে ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। (ফিদা, ৬৮-৬৪৭ হিঃ : ৮৭) এহেন বিপজ্জনক অবস্থায় মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভেবে রাণী শাজারুদোর প্রায় চারশত মামলুক অমাত্যবর্গের মতামত নিয়ে সুলতানের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন। একই সাথে রাজকীয় দূত রাজধানী হতে দূরে অবস্থানরত সুলতানের পুত্র তুরান শাহকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানানো ও রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিতে গমন করেন। একই সাথে সুলতান সালিহ আইয়ুব রোগাক্রান্ত বলে রাজ্যময় প্রচার করে রাণী শাজারুদোর শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। (Maqrizi, 2012 : 444)

ক্রুসেডারদের দমন

সুলতানের মৃত্যু সংবাদ শাজারুদোর দামিয়েতায় অবস্থানরত শত্রু রাজা নবম লুইয়ের নিকটে গোপনের শত চেষ্টা করলেও তার নিকটে এ সংবাদ চলে যায়। রাজা লুই স্বীয় ভাই পৌতো (Pouto) রাজ্যের কাউন্ট আল-ফোনসো (Alfonso) কে সাথে নিয়ে ১২৪৯ সালের মে মাসে অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে পুনরায় বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিশর অভিযান করেন। তখনও তুরান শাহ রাজধানীতে পৌঁছেনি (কাদের ও মাহমুদুল হাসান, ২০১২ : ৯৮) খ্রিস্টান বাহিনীর কিছু অংশ নীল নদ হতে বের হওয়া আশয়ুম খাল (বর্তমান নাম আল বাহর আল শাহর) অতিক্রম করে মিশরীয় ক্যাম্প গাইয়েলা নামক স্থানে আক্রমণ করে,

যা ছিলো মুসলমানদের ঘাটি মনসুরিয়া শহর হতে মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত। মিশরীয় বাহিনীর সেনাপতি আমির ফকির উদ্দিন খ্রিস্টানদের পরিচালিত আকস্মিক এ আক্রমণে নিহত হন। সংবাদ পেয়ে রাণী মিশরীয় বাহিনী নিয়ে তা প্রতিরোধে অগ্রসর হন। তিনি শত্রুদের মস্তকের জন্য রাজ্যে পুরস্কারও ঘোষণা করেন। এছাড়াও আল-মনসুরিয়া শহরে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য, নীল নদ হতে নির্গত ক্ষুদ্র খাল দিয়ে যাতে আর খ্রিস্টানরা পার না হতে পারে সেজন্য নিজেদের সীমানায় নদীতীরে সুরঙ্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। যুদ্ধে উভয়পক্ষের ভিতর তুমুল গোলাগুলি হলেও শেষপর্যন্ত খ্রিস্টান বাহিনী মিশর দখলে ব্যর্থ হয়। (Cart & Petry, 1990 : 250) রাণী এই অভিযানের মাধ্যমে কেবল নিজ সাম্রাজ্যকেই রক্ষা করেননি বরং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম শাসনকে অনিবার্য পতন হতে রক্ষা করেন।

চার মাস পরে তুরান শাহ এসে রাণীর সাথে যোগ দেন। তিনি প্রথমে পিতার প্রতিষ্ঠিত শহর ‘আল-সালহিয়া’ (Al-Salhia) পৌঁছে সিংহাসনে সমাসীনের ঘোষণা দেন। রাজধানী কায়রোতে গমনের সময়ও তাঁর ছিলো না। পরে জুন মাসে তুরান শাহ আল-মনসুরিয়া শহরে আগমন করলে সেখানে অবস্থানরত শাজারুদ্দোর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দেশময় প্রচার করেন। তুরান শাহের প্রত্যাবর্তনে মুসলিম বাহিনীতে নতুন করে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এ সময়ে আল-মনসুরিয়া শহর হতে মুসলিম বাহিনী নদী পাড়ি দিয়ে ক্রুসেডারদেরকে ‘ফারিসকুর যুদ্ধে’ পরাজিত করে রাজা নবম লুইকে গ্রেফতার ও কারাবন্দী করেন। (মাকরিযি, ২০১২ : ৪৪৯)

তুরান শাহের সাথে বিরোধ

তুরান শাহ সমগ্র মিশরে নিজের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাণী শাজারুদ্দোর এর বিশ্বস্ত সকল মামলুক কর্মচারীদেরকে সরিয়ে দিয়ে সেস্থলে নিজ অনুগত লোকদেরকে নিয়োগ দেন। এমনকি তিনি রাণীকে তাঁর মৃত পিতার দেয় সমুদয় অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার ফিরিয়ে দিতে বলেন। রাণী সৎ পুত্র তুরানশাহের এই ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। মামলুকরাও ক্ষুব্ধ হয়। এই হিংসা-বিদ্বেষ মিশরে বিয়োগান্তক অবস্থার সৃষ্টি করে। তুরান শাহ এক পর্যায়ে মামলুক প্রভাবশালী কর্মচারী ফকিরশাহ এর নিয়োগ করা আততায়ীর হাতে ১২৫০ সালের ২ মে নিহত হন। (Cart & Petry, 1990 : 252)

ক্ষমতা গ্রহণ

তুরানশাহের মৃত্যুর দিনই রাণী শাজারুদ্দোর মামলুকদের সমর্থনে মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, যা গাজী সালাউদ্দীন আইয়ুবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবি বংশের পতন ঘটায় ও মামলুক বংশের শুভ সূচনা করে। (মাকরিযি, ২০১২ : ৪৫২) তাই শাজারুদ্দোরকে মামলুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তিনি হলেন এ বংশের প্রথম শাসক। তাঁর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন ইমাজুদ্দিন আইবক যিনিও একজন মামলুক ছিলেন। মামলুক শব্দের অর্থ হলো ক্রীতদাস।

উপাধি গ্রহণ

শাজারুদ্দোর ক্ষমতা হস্তগত করার পর রাষ্ট্রীয় উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি কখনও নিজেকে ‘আল-মালিকা আল-মুসলিমীন ইসমাত-আদ-দীন উম্মে খালিদ’ কখনও নিজেকে ‘ওয়ালিদ আল-মালিক আল-মনসুর খালিদ আমির আল-মুমিনীন’ বলে পরিচয় দিতেন। জুমার নামাজের সময় তাঁর নামে খোতবা দেয়া হতো। এ সময়ে তাকে ‘উম্মে আল-মালিক খালিদ’ (খালিদ আল মালিকের মা) এবং ‘সাহেবাত আল-মালিক আস-সালিহ’ নামে সম্বোধন করা হতো। তিনি সুলতানা শাজারুদ্দোর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। সুলতানা কোন আরবি শব্দ ছিলো না। সুলতানের নারীবাদী শব্দ হলো সুলতানা। ইউরোপিয়ানগণ তাকে এই নামে অভিষিক্ত করেছিলেন। তাদের ঐতিহাসিকগণ তাঁকে সুলতানা হিসেবে পরিচিত করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। তাদের দৃষ্টিতে সুলতান হলো পুরুষবাচক শব্দ আর এর নারী শব্দ হলো সুলতানা। তাঁর সময়ের মুদ্রায় অবশ্য সুলতান শব্দটি লেখা হতো। (Cart & Petry, 1990 : p-253)

নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন

তিনি স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে সমগ্র সাম্রাজ্যে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। মুদ্রায় উৎকীর্ণ থাকতো মুস্তামিয়া আল-সালিহাহ আল-মুসলিমিন ওয়াদিত আল-মালিক খালিদ আমির আল-মুমিনিন। তাঁর নামের শিরোনাম ছিলো শাজারুদ্দোর। এছাড়াও আব্বাসীয় খলিফার নাম তাঁর মুদ্রায় লিপিবদ্ধ ছিলো। যেমন আবদুল্লাহ বা আল-মুনতাসির বিল্লাহ। (মাকরিযি, ২০১২ : ৪৬০)

ক্রুসেড বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ

শাজারুদ্দোর শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মিশরে তাঁর তিন মাসের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সুকৌশলে দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরীয় উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তাররত ক্রুসেডারদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে বন্ধ করতে তিনি সক্ষম হন। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মকে কেন্দ্র করে চলমান ভয়াবহ রক্তাক্ত সংঘর্ষ আপাতত বন্ধ হয়। সুলতানা আমির হুসাম উদ্দিনকে মানসুরার কারাগারে বন্দী রাজা লুই এর নিকটে পাঠিয়ে পূর্ব নির্ধারিত সন্ধি মঞ্জুর করান। এর মাধ্যমে তিনি দেশের সার্বভৌমত্বসহ জনগণের জীবন, মাল রক্ষা করতে যেমন সমর্থ হন, একই সাথে যুদ্ধবন্দীদের সাথে যুদ্ধচুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহানুভবতার পরিচয় দেন। কেননা তখন মামলুকরা যুদ্ধবন্দী খ্রিস্টানদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছিলেন। সুলতানার এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জাতাইতার পূর্ণগঠনে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে খ্রিস্টান বাহিনী জীবন্ত অবস্থায় ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়। (মাকরিষি, ২০১২ : ৪৮০-৪৮০) খ্রিস্টান বাহিনীর প্রতি তার এই মহানুভবতা চিরতরে ক্রুসেড বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি যে মামলুক বংশের শাসন শুরু করেন, তা মিশরে সূদীর্ঘ আড়াইশত বছর স্থায়িত্ব লাভ করে।

শেষ জীবন

রাণী শাজারুদ্দোরের শেষ জীবন সুখের ছিলো না। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ও দ্বিতীয় স্বামী আইবকের অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে তিনি দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েন। শাজারুদ্দোরকে ১২৫৭ সালে কায়রোতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। (Cart & Petry, 1990 : 272) তাঁর অরক্ষিত মৃতদেহ হতে দামী মুক্তাখচিত পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত চুরি হয়ে যায়। পরে তাকে আত-তুলুন মসজিদের নিকটে সমাধিস্থ করা হয়। ‘ট্রি অব লাইফ’ (Tree of life) কথাটি চমৎকার লিপিশৈলীতে উৎকীর্ণ আছে তাঁর সমাধি গাত্রে।

পরিশেষে বলা যায়, রাণী শাজারুদ্দোর তাঁর গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দ্বারা কারাগারে বন্দী শত্রুদেরকে কৌশলে বুঝিয়ে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে নিজ দেশে স্থানান্তর করে সাম্রাজ্যের জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। এর ফলে সূদীর্ঘকাল ধরে চলা ধর্মযুদ্ধও বন্ধ হয়। তার এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যুগে যুগে অনুকরণীয়।

পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার

পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রকৃষ্ট নর-নারীদের সমানভাবে স্বর্গীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে মুমিন বা ঈমানদার নর-নারীগণ ছিলেন সর্বদাই সমান। পবিত্র কোরআনে লিঙ্গভেদে মুমিন নর-নারীর জন্য সমান বিধান বিধৃত হয়েছে। যেমন ইসলামে পবিত্র কাবা গমনাগমনের সুবিধা পুরুষের ন্যায় নারীকেও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটি স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, ইসলামে নর-নারী ধর্মীয়, সামাজিক এবং আর্থিকভাবে স্বাধীন সমমর্যাদার অধিকারী। প্রখ্যাত সুফী ও চিন্তাবিদ জালালুদ্দীন রুমী যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, মহিলারা হলেন আল্লাহর জ্যোতিতে সৃষ্ট জীব (A Ray of god)। আরও এক ধাপ এগিয়ে মহানবি (সাঃ) বলেন যে, জান্নাতের সিঁড়ি হলো মাতৃসেবা অর্থাৎ “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত” নির্ধারিত-এ কথা হাদিস হতে প্রমাণিত।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে ৬১০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মুসলিম নারীদের অবদান বিধৃত হয়েছে। এ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের আলোচিত নারীরা পুরুষের পাশাপাশি যাবতীয় প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তাদের সেই সাফল্যগাঁথা ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। ইসলাম প্রচার-প্রসার, পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ভূমিকা পালন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসার প্রচলন, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বিচরণসহ সর্বক্ষেত্রে তারা সর্বমুখী কর্মতৎপরতা চালিয়েছিলেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অসংখ্য আলোকিত নারী এ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন যাদের অবদান সীমিত হলেও সমাজ-রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে তা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কোনোদিক দিয়েই পিছিয়ে ছিলো না। কিন্তু ইতিহাসে তাদের ভূমিকা বা অবদানের অবমূল্যায়নের কারণে সঠিক তথ্য পুনরুদ্ধার ও তা উপস্থাপন করাই ছিলো আমার গবেষণাকর্মটি পরিচালনার উদ্দেশ্য।

এসব আলোচনা ফুঁটিয়ে তুলতে গিয়ে নারীরা প্রাচীন বিশ্বে গড়ে উঠা বিভিন্ন সভ্যতায় যে নানামুখী বৈরীতা অতিক্রম করেছিলেন, তা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছি। তাই এই গবেষণার শুরুতে প্রথম অধ্যায়ে

মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামি যুগের মহিলাদের কথা বিবৃত করা হয়েছে এবং সেখানে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, আরব ভূখন্ড, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে নারীদের অবস্থা ছিলো খুবই শোচনীয়। তারা সমাজে ভূত্বের বেশি মর্যাদা পেতো না। এছাড়া তাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো। তাদের দুর্দশার কাহিনী ছিলো অবর্ণনীয়। এজন্য ইতিহাসবিদগণ এ সময়কালকে ‘জাহিলিয়াতের যুগ বা অন্ধকারময় যুগ’ বলে অভিহিত করে থাকেন। আরব-ভূখন্ড ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানেও সামাজিক মর্যাদা আরবের অনুরূপ ছিলো। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, প্রাক-ইসলামি যুগে সেমিটিক জাতির মধ্যে মানুষেরা তাদের মহিলাদের উপর সমান অধিকার বা সমান মর্যাদার অধিকারী করে তোলেননি, বরং কঠোর অনুশাসন, নিষ্পেশন, দেশজ লোকাচার ও ধর্মাচারের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য; হযরত মুহাম্মদের আগমন তথা ইসলামের উন্মেষ ঘটলে নারীদের এ অবস্থানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়ে এক সামাজিক সভ্যতার আগমন ঘটে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন এবং পবিত্র কোরআনের প্রচলনের ফলে নব্য মুসলিম সমাজের মধ্যে এক ব্যাপক সংস্কার বা পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনে জোরালো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম মহিলাদের পূর্বতন অবস্থানের মাধ্যমে মুসলিম মহিলারা দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্তি পেয়ে ইসলামের প্রভাবে স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকারের আলোয় আলোকিত হতে থাকে এবং এটা লক্ষ্য করা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়, পবিত্র খলিফাদের শাসনামলে মুসলিম মহিলারা ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে নিজেদের গুণাবলী, মর্যাদা ও গুরুত্বের পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামের ইতিহাসে নারীর আর্থ-সামাজিক রূপরেখা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন ও প্রচলন করে আধুনিক বিশ্বকে এক দিশা দেখিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মপ্রচারক, শাসক, বিচারক এবং ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার এক বিশ্বজনীন আদর্শের প্রতিক। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর আদর্শ, মহানুভবতা, সর্বগুণান্বিত চরিত্র-মাধুর্য ইসলামের ইতিহাসে চির অমলিন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের যোগ্যতা অনুসারে মর্যাদা দিতেন। এতে মহিলারা উৎসাহিত হয়ে তাদের স্বকীয়তার প্রমাণ দিয়েছেন।

সেইসব নারীদের অন্যতম হযরত আবু ফুকায়হা (রা.), হযরত লুবিনা (রা.), হযরত যুনায়েবা (রা.) দাস হওয়া সত্ত্বেও যুগের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্দয়তার মুখোমুখি হয়েও সফলতা অর্জন

করছিলেন। যেমন হযরত ফুকাইহার (রা.) পায়ে তাঁর মনিব সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া দড়ি বেধে ও বুকে ভারী পাথর তুলে দিয়ে মরুভূমির উত্তপ্ত বালু ও প্রস্তর খন্ডের উপর দিয়ে তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকদেরকে আদেশ দিতেন। (নুমানী, ১৯৭৮ : ২৩১) হযরত ফাতিমা (রা.) (মৃত্যু ৫১ হি.) নামের আরেক নারী আল-কুরআন এতো সুমধুরভাবে তেলাওয়াত করতেন যে, এর প্রভাবে তাঁর ভ্রাতা হযরত ওমর (রা.)-এর ন্যায় তেজস্বী ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। (আব্দুল মাবুদ, ২০১২ : ১৭৬) তেমনিভাবে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্বপালনসহ, শিক্ষা প্রসার, রাসূলকে (সা.) হিজরতে সহযোগিতাদানের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই বলা চলে, সমাজ-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা, সাম্য-মৈত্রীর পুত ধারা প্রচলনের কারণে তখনকার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্ব আলোকউদ্ভাসিত হয়ে উঠে। (নুরুল, ১৯৭১ : ২১)

তাদের আত্মত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টা, পদ্ধতি, গৃহীত আদর্শ বিশ্বে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলো। সমস্যার কথা বলতে গেলে তা সমাজ হতেই উদ্ভব হয় এবং এর সমাধান সমাজেই নিহিত থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মহীয়সী নারীগণ পরবর্তীকালে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হন। এরই প্রেক্ষাপটে পরবর্তীকালে অসংখ্য নারী স্ব স্ব ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণে স্বকীয় মর্যাদায় বিভূষিত হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় খলিফা মামুনের (সিংহাসনারোহণ ৮৩০ খ্রি.) স্ত্রী বোরান, খলিফা আল-মাহদীর (৭৭৫-৭৮৬ খ্রি.) কন্যা উলাইয়া শাসনকার্য পরিচালনাসহ শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে তদানীন্তন বিশ্বে আদর্শস্বরূপ ছিলেন। মেয়েদের ব্যবহার্য নকশা করা ওরণার প্রচলনের মাধ্যমে তিনি আজও জনপ্রিয়। (হিটি, ২০০৯ : ২২৩)

পবিত্র খলিফাদের শেষ খলিফা হযরত আলি (রা:)-এর ইন্তেকালের (৬৬১ খ্রিস্টাব্দ জীবনাবসান) পর মুআবিয়া খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর সময় হতেই ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিকরা উমাইয়া যুগ হিসেবে অভিহিত করে। মুআবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর সময়ে কারবালার প্রান্তরে মহররম মাসে হযরত আলি (রা:)-এর পুত্র হযরত হোসেনের বাহিনীর সাথে এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধকে দু'পক্ষই গণতন্ত্রের পূর্ণরূপ ও ইসলামের রক্ষার্থে যুদ্ধ বলে দাবি করেন। এই যুদ্ধে হযরত হযরত হোসেন (রা.)-এর বাহিনী এজিদের নিকটে মর্মস্পর্শী যে, প্রত্যেক মুসলমান মনে করেন যে, প্রতি বছর মহররম আসলেই ইসলাম জাগরিত হয়। এইসব হৃদয়বিদারক ঘটনা বাদ দিলে এটা প্রমাণিত যে,

উমাইয়াদ শাসকেরা ইসলামের মূল ধারণা থেকে কখনও কখনও বিচ্যুত হয়েছিলেন, কিন্তু ইসলাম প্রচারের আদর্শ ও মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন। এই অভিসন্দর্ভে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, উমায়্যেদ শাসনামলেও মুসলিম মহিলাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ধারা অব্যাহত ছিলো।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে বাগদাদ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরে পরিণত হয়। এই সময়ে আব্বাসীয় শাসকদের সাম্রাজ্যের সীমানা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আব্বাসীয় শাসকদের অবদান বহুলভাবে স্বীকৃত। এই সময়ে মুসলিম নারীরা ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্যতা, স্বকীয়তা, পারদর্শিতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাই আলোচিত (৬১০-১২৫৮ খ্রি.) নারীগণ আজ হতে চৌদ্দশ বছর পূর্বে একটি শান্তিপূর্ণ জীবনাদর্শ বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করে গেছেন যা আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য বাতিঘরের মতো। স্বরণীয় সে সকল নারীর অনুসৃত আদর্শ বিশ্বের সর্বযুগে অনুকরণীয় মানুষের জন্য এবং সমাজের সকল বৈরিতা মুছে ফেলে নতুনভাবে সমাজ-রাষ্ট্রকে টেলে সাজাতে উৎসাহিত করেছিলো। সেই সুদূর অতীত হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারীদের অগ্রগতি, সামাজিক নানান প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সুস্থ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের সাথে মিলে নারীর নিজস্ব সম্মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমার বিশ্বাস এ গবেষণা কর্মটি পাঠ করে নতুন গবেষককুল এবং শিক্ষকমহল নতুন তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হবেন ও আরও ব্যাপকভাবে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হতে অনুপ্রাণিত হবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল করীম (২০০৩ খ্রি:) : (সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আল-বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (২০০৭ খ্রি:) : সহীহ আল বুখারি, ১-১০ খণ্ড [অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ], ইফাবা, ঢাকা।

আল-বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (১৩৮৭ হিঃ) : সহীহ আল বুখারি, ১ম খণ্ড, মাকতাবাতুর রহীমিয়া, দেওবন্দ।

অরুনিমা রায়চৌধুরী (২০১৫ খ্রি:) : আধ্যাত্মিকতা ও নারী ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ শ্রী সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

অনিরুদ্ধ রায় (২০১৬ খ্রি:) : মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।

অধীর চন্দ্র সরকার ও নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকার (১৯৮৫ খ্রি:) : মনুসংহিতা, দীপালী বুক হাউস, কলকাতা।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (২০০৩ খ্রি:) : মুসলিম সমাজ এবং এই সময়, দ্বিতীয় খন্ড (সম্পাদনায় মইনুল হাসান), সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোম্পানী সোসাইটি লিমিটেড, কলকাতা।

আজগর, মুহাম্মদ আলী খান (২০০৩ খ্রি:) : আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আত তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (১৯৯১ খ্রি:) : সুনান আল তিরমিযী, ইউ এ ই : দারুস সালাম, সারজা।

আত তিরমিযী (১৪২৪ হিঃ) : সুনান আত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, দারুল ইশাআতিল ইসলামিয়া, কলিকাতা।

আব্দুল্লাহ, আবু সাইদ মোহাম্মদ (১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ খ্রি:) : ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

আবুবকর মো: জাকারিয়া মজুমদার ও মো: আবদুল কাদের (২০১৪ খ্রি:) : তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। ঢাকা।

আবদুর রহীম, স্যার (১৯৮৫ খ্রি:) : মোহামেডান জুরিসপ্রুডেন্স (অনুবাদ গাজী শামসুর রহমান), ইসলামী আইন তত্ত্ব, ইফাবা, ঢাকা।

আব্দুল মাবুদ, মুহাম্মদ (২০১৪ খ্রি:) : আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

আব্দুল মাবুদ, মুহাম্মদ (২০১২ খ্রি:) : আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, ৬ষ্ঠ খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমর ইবনে কাছীর, (১৪২০ হি:) : তাফসীরুল কুরআনুল আজিম, দারুলততাইয়্যিব লিননাশরে, মাউকাউত ফাহাদ, সৌদিআরব।

আবু শুককাহ, আবদুল হালীম (১৯৮৭ খ্রি:) : রসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা, ২য় খন্ড, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটস, ঢাকা।

আবু শুজা শিরওয়াইহি ইবনে শাহেবদার আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খিতাব (১৯৮৬) : ৫ম খন্ড, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

আমজাদ, এস এম (২০০৭ খ্রি:) : সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন যুগ, সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা।

আমীর আলী, সৈয়দ (১৯৯৬ খ্রি:) : দ্য স্পিরিট অব ইসলাম (অনুবাদ ড. রশীদুল আলম), মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা।

আমীর আলী, স্যর সৈয়দ (১৯৯২ খ্রি:) : এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস (অনুবাদক হাবিব আহসান ও সম্পাদনায় ডক্টর ওসমান গনি), প্রথম সংস্করণ, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা।

আয-জাহাবী (১৯৭০ খ্রি:), সিয়রু আ'লাম আন নুবালা, ২য় খন্ড, আল-মুওয়াসসাতুর রিসালা, বৈরুত

আয-জাহাবী. আল-ইমাম (১৩৬৭ হিঃ) : তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো।

আয যিকিরলী (১৯৮৯ খ্রি:) : আল-আলাম আন নিসা, ২য় খন্ড, দারুল ইলম লিল মালাইন, বৈরুত।

আলি ইবনে আবি বকর আল-হাইছামী (১৪০৮ হি:) : মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ৮ম খন্ড, দারুল রিয়াদ লিততুরাহ, কায়রো।

আল-বালায়ুরী (১৯৩৭) : কিতাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, দারুল মায়ারিফ, মিশর।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (১৯৬৬) : উমদাতুল কারী, খন্ড, দারুল ফিকর, বৈরুত।

আলী আজগর খান, মোখলেছুর রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান (২০১০ খ্রি:) : মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ (সম্পাদনায় ড. মুহম্মদ মুদাসসির রহমান), বুকস প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী।

আল-গালিব, মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ (২০১৬ খ্রি:) : সিরাতুর রাসূল (সা:), হাদীস ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আলাউদ্দিন আলি আল মুত্তাকী (১৯৮৫ খ্রি:) : কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, মুওয়াসসাতাতুর রিসালা, বৈরুত।

আল-হালাবী, শায়খ 'আলী ইবনে বুরহানুদ্দীন (১৩৩৮খ্রি:) : আস-সিরাতুল হলবীয়া, ১ম খন্ড, আল-মাতবা'আতুস সা'আদাহ, মিশর।

আল-বালায়ুরি (১৯৩৭ খ্রি:) : কিতাব আল-আশরাফ, ১ম খন্ড, দারুল মায়ারিফ, মিশর।

আল মুসতাশারা হাসান হাফনাভী (১৯৭৫ খ্রি:) : মাকানাতুল মারআতি ফিল ইসলাম, দারুল বাশীর, আল মারআতু লাদাল ইয়াহুদ, কায়রো।

আল-মাসউদী (১৯৯৮ খ্রি:) : মরুজুয যাহাব ওয়া মা'আদিনিল আরাব, (সম্পাদিত আবুল হাসান আলী ইবনে হুসাইন), মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত।

আলীম, এ কে এম আব্দুল (১৯৯৭ খ্রি:) : ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আশরাফউদ্দিন আহমেদ (২০০৩ খ্রি:) : মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস (১২৫৮-১৮০০), চয়নিকা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

আরাবী, ইবনুল (১৯৩৪ খ্রি:) : শারাহ, তিরমিযী, ৮ম খন্ড, মিশর।

আরনল্ড, টি ডাবলিউ (২০০০ খ্রি:) : ইসলাম প্রসারের ইতিকথা (বাংলা অনুবাদ আবদুর রাকিব), মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা।

আস যুরকানী, আবদুল আযীম (১৯৯৮ খ্রি:) : মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন, ২য় খন্ড, দারুল ইয়াহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, কায়রো।

আহমদ, মাজাহারউদ্দীন ও মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন (২০০৩ খ্রি:) : উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা (রা:), সালাউদ্দিন বইঘর, ঢাকা।

আহমদ সালাবী (১৯৮৪ খ্রি:) : আদইয়ান হিন্দ আল-কুবরা, মাকতাবাতুন নাহদাহ, মিশর।

ইবনে আসির, আল ইজ্জাদীন (১৯৯৫ খ্রি:) : *আল কামিল ফিত তারিখ*, ৫ম খন্ড, : মাতবা'আতুশ শরকিল ইসলামিয়া, কায়রো।

ইবনে আসির, আল ইজ্জাদীন (১৩১৪ হিঃ) : *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, ৫ম খন্ড, দারুল ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী।

ইউসুফ আল-কানখালুবি (১৯৮৩ খ্রি:) : *হায়াতুস সাহাবা*, দারুল কলাম, বৈরুত।

ইউসুফ ইসলামী (১৯৯৫ খ্রি:) : *মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার* (অনুবাদ : আবদুল কাদের)। আধুনিক প্রকাশনী। ঢাকা।

ইউসুফ, (১৯৮৪ খ্রি:), *মহাশত আল কুরআন কি ও কেন?*, খুলনা: খেলাফত পাবলিকেশনস।

ইঞ্জিল শরীফ। বাংলা অনুবাদ ১ম খন্ড। মথি ১-১৭।

ইবনে আবদিল, বার (১৯৮৫ খ্রি:) : *আল-ইসতিয়াব*, ৪র্থ খন্ড, মুওয়াসসাতাতুর রিসালা, বৈরুত।

ইবনে কাসীর, আবুল ফিদা হাফিজ আদ দামেশকী (র:) (২০০০ খ্রি:) : *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, *ইসলামের ইতিহাস : আদি অন্ত*, ২য় খন্ড, (অনুবাদে মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, বোরহানউদ্দীন, সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন) ইফাবা, ঢাকা।

ইবনে কাসীর, আবুল ফিদা হাফিজ আদ দামেশকী (র.) (২০০৭ খ্রি:) : *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া বা ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত*, চতুর্থ ও সপ্তম খন্ড, (অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, মাওলানা বোরহান উদ্দীন, সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী)। ইফাবা।

ইবনে কাসীর (১৯৭৮ খ্রি:) : *আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়াহ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত।

ইবনে মাজাহ (২০০৯ খ্রি:), *সুনান ইবনে মাজাহ*, ৫ম খন্ড, দারুস সালাম, মিশর।

ইবনে সাদ, শেখ আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ (১৩২১ হিঃ) : *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, ৫ম খন্ড, দারু সাদির, লাইডেন।

ইবনে সাদ, শেখ আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ (১৯৯৫ খ্রি:) : *আত-তাবাকাত আল-কুবরা* অষ্টম খন্ড। (translated by Bewly, the woman of Medina) Toha publishing press. London.

ইবনে হাজার, আল-আসকালানী, (১৯৭৮ খ্রি:) : *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, ৪র্থ খন্ড, ৮ম খন্ড, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

ইবনে হাজার, আল আসকালানী, (২০০০ খ্রি:) : *ফাতহুল বারী*, ৮ম খন্ড, দারুত তাকওয়া লিন নাশয়ি ওয়াত তাওয়া, কায়রো।

ইবনে হাজার, আল আসকালানী, (১৪০৪ হিঃ): *আত-তাহযীবুত তাহযীব*, ১৩শ খন্ড, দারুল ফিকর, বৈরুত।

আল-মুসনাদ, ইবনে হাম্বল, ইমাম আহমদ (১৯৬৭ খ্রি:) : ৪র্থ খন্ড, ৬ষ্ঠ খন্ড, মাতবা'আতুশ শরকিল ইসলামিয়া, কায়রো।

ইবনুল কায়িম আল-জওয়িয়া (১৯৫০ খ্রি:) : *যাদুল মা'আদ*, মাতবা'আ মুসতাফাল বাবিল হলবী, মিশর।

ইবনে হিশাম (১৯৮১ খ্রি:) : *আল-সীরাহ আন-নাবাবিয়া*, ১ম খন্ড, : দারু ইহইয়া আত-তুরাহ আল আরাবী, বৈরুত।

ইবনে হিশাম (১৯৫৫ খ্রি:) : *আস সিরাতুল নববিয়াহ*, ১ম খন্ড, মাতবাআ মুসতাল বাবিল হলবী, মিশর।

ইবরাহীম, আনীস ও অন্যান্য (১৯৭২ খ্রি:) : *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, আল মারআতু লাদাল ইয়াহুদ। কায়রো।

ইবনুল জওয়ী, আবদুর রহমান (১৯৫৯ খ্রি:) : *কিতাবুত তানবীহ ওয়াল ইশরাফ*, মাতবা'আতুত তওফীকিল 'আসরিয়া, মিশর।

ইমাম তিরমিযী (১৯৯৬ খ্রি:) : *জামে আত-তিরমিযী* (অনুবাদ ও সম্পাদনায় মুহাম্মদ মুসা), ৪র্থ খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

ইমাম তিরমিযী (১৯৯৭ খ্রি:) : *জামে আত-তিরমিযী* (অনুবাদ ও সম্পাদনায় মুহাম্মদ মুসা), ৪র্থ খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আবুল হুসাইন (র:) (২০০২ খ্রি:) : (সম্পাদনা : মুহাম্মদ মূসা)। [অনুবাদ-মোজাম্মেল হকা, সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, ইফাবা। ঢাকা।

ইমাম মালিক, ইবনে আনাস (১৯৭৭) : *মুয়াত্তা ইমাম মালিক* (সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ), ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

ইসহাক ওবায়দী (১৯৯৭ খ্রি:) : *যুগে যুগে নারী*, শান্তিধারা প্রকাশনী, শিক্ষা প্রকাশনালয়, বাজার ও বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

ইসলাম, মো: শফিকুল (১৪০৬ হিঃ/২০০৫ খ্রি:) , *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, ইফাবা, ঢাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯৮৬ খ্রি:) : (সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ) ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা।

উমরী, সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার (১৯৯৭ খ্রি:) : ইসলামী সমাজে নারী, (অনুবাদ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

এ. এম. আমজাদ, ড. (২০০৭ খ্রি:) : সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন যুগ, সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা।

এ. কে. এম শাহনাওয়াজ (২০০৩ খ্রি:), বিশ্ব সভ্যতা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

কাউসার, এম এ (২০১২ খ্রি:), মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাদের ও হাসান. সৈয়দ মাহমুদুল (২০১২ খ্রি:) : উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস, জাহানারা বুক হাউস, ঢাকা।

কল্যাণী বন্দোপাধ্যায় (১৯৯৮ খ্রি:) : ধর্ম ও নারী সেকাল ও একাল, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

কল্যাণী বন্দোপাধ্যায় (২০১২ খ্রি:) : নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আলোর দিশা, নারায়ণ প্রিন্টিং, মুক্তারামবাবু লেন। কলকাতা।

খনার কৃষি ও ফল সংক্রান্ত বচন (২০০৭), নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, (প্রকাশনা স্থান : স্যার সৈয়দ রোড), মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

খনার বচন, ইন্টারনেট।

খনার ৫০ : নারীশক্তি ও সত্যের জয়, প্রথম আলো, ১৭/০৫/২০১৫।

খালেক, আব্দুল (১৯৯৯ খ্রি:) : নারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, বাংলাদেশ।

খালেদা নাসরীন (২০০৫ খ্রি:) : বাংলাদেশের সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গাজী শামসুর রহমান (১৯৮৫ খ্রি:) : ইসলামী আইনের ভাষ্য, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।

জোয়ার্দার, সফিউদ্দীন (১৯৭৮) : আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জেসমিন আরা বেগম (১৯৯৬ খ্রি:) : বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, এমফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪) : ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। বাড পাবলিকেশনস। ঢাকা।

তালিবুল হাশেমী (২০০৪) : বিশ্বনবী (স) ও চার খলিফার জীবনী (অনুবাদে মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ নুর উদ্দীন) আল-হেরা প্রকাশনী, ঢাকা।

তেসলিম চৌধুরী (২০০৪ খ্রি:) : ভারতের ইতিহাস আদিমধ্য যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ ৬০০-১৫৫৬, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।

তাহের, মো: আবু (২০০৮ খ্রি:) : ইসলামের সামাজিক ইতিহাস *Social history of Islam*, কবির পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

নাদভী, সাইয়িদ সুলায়মান আলী (১৪০১ হি/১৯৮১ খ্রি:) : নবীই রহমত, দারুল উলূম, লাখনো।

নূ'মানী, শিবলী (১৯৫২ খ্রি:) : সীরাতুননবী, ১ম খন্ড, মাতবা'মারিফ, আযমগড়, দিল্লী। ভারত।

নুরুল করীম (১৯৭১ খ্রি:), ইসলামী আদর্শবাদের সংক্ষিপ্ত মর্মকথা, কবীর আবু দাউদ এণ্ড ব্রাদার্স, ঢাকা।

নারীর ৭১ ও যুদ্ধপরবর্তী কথ্য কাহিনী (২০০১ খ্রি:) : সম্পাদনায় আইন ও সালিস কেন্দ্র (আসক), মানবাধিকার সংস্থা, ঢাকা।

নাসির হেলাল (১৯৯৮ খ্রি:) : বিশ্বনবীর পরিবার বা আহলে বাইত, খন্দকার প্রকাশনী, ঢাকা।

নুসরাত ফাতেমা (বৈশাখ-চৈত্র ১৪২০/২০১৩-২০১৪) : মুঘল হারেমের নারীদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড (১৫২৬-১৭০৭), সাতচল্লিশ বর্ষ (সম্পাদক : মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ড. ও এ কে এম গোলাম রব্বানী, ড.), ইতিহাস বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাজিল (১৩৬৭ হিঃ) : সহীহুল বুখারী, ১ম খন্ড, আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, দেওবন্দ।

বেগম রওশন আরা (১৯৯৩ খ্রি:) : নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বীণা রায় (২০১১ খ্রি:) : ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা, ফর্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

- বায়হাকি (১৯৯৪ খ্রি:) : *সুনানুল-বায়হাকী আল-কুবরা*, ১ম খন্ড, মাকতাবাতু দারিল-বায, মক্কা ।
- বায়হাকী (২০০২ খ্রি:) : *সুনান আল কুবরা বায়হাকী*, দার আল কুতুব আল ইলমিয়াহ, বৈরুত ।
- ফিওদর করোভকিন (১৯৮৬) : *পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ* (সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত), (অনুবাদ হায়াৎ মাবুদ) প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা ।
- ফাতেমা ইয়াসমীন (২০০৬) : *ইসলাম ও নারী : একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা* (৬৬১ খ্রী. পর্যন্ত) *পর্যালোচনা*, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।
- ফজলুর রহমান খাঁন, ড. (১৯৮২) : *সমাজ ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।
- মুতাহহারী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা (২০০৪ খ্রি:) : *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদ এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর), ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা হতে প্রকাশিত ।
- মনুসংহিতা* (১৯৯৩ খ্রি:) : বঙ্গানুবাদ শ্রীমৎফুল্ল কভট্ট-কৃত-টীকয়া বঙ্গানুবাদেন সমেতা, ভট্ট পল্লী-নিবাসী-পতি প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চগনন তর্করত্ন সম্পাদিত, প্রাক কখন ও মনুসংহিতা পরিচয়, মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ।
- মনুসংহিতা* (১৯৯৯ খ্রি:) : ভূমিকা অনুবাদ টীকা সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।
- মনজুরুল আলম খান (১৯৭৭ খ্রি:) : *সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।
- মানে ইবনে হাম্মাদ আল-জুহানী (১৪১৮হিঃ) : *আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব ওয়াল আহযাব আল-মুআসারাহ*, দারুল নাদওয়াতুল আলামিয়াহ, রিয়াদ ।
- মরিস বুকাইলি (১৯৯০খ্রি:) : *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, সাহিত্যমালা, ঢাকা ।
- মরিস বুকাইলি (১৯৮৬ খ্রি:) : *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, (অনুবাদ : আখতার-উল-আলম), ইফাবা ।
- মুল্লা, মজদুদ্দীন (১৯৫৭ খ্রি:) : *সীরাতে মুস্তফা*, মাকতাবা উসমানিয়া, দিল্লী ।
- মুসলেহউদ্দীন, আ ত ম (১৯৮৬ খ্রি:) : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ।
- মুসতাফা আস সিবায়ী, ড. (১৯৯৮ খ্রি:) : *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ।
- মুস্তাফা ইবনে আবদুল্লাহ (১৯৯২) : *কাশফুয-যুনুন*, ১ম খন্ড, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ।

মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ (১৯৯২খ্রি:) : কুরআন পরিচিতি, নুবালা পাবলিকেশনস, ঢাকা।

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ (২০১৪ খ্রি:) : আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, ৫ম খন্ড, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ (২০১২ খ্রি:) : আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ তাকী উসমানী (১৯৯৩ খ্রি:) : উলুমুল কুরআন, কুতুবখানা নাযিমীয়াহ, দেওবন্দ।

মুহাম্মদ নুরুজ্জামান (১৯৯০ খ্রি:) : সংগ্রামী নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

মুহাম্মদ শামসুল হুদা (১৯৯৫ খ্রি:) : নারীর অধিকার ও মর্যাদা, আশরাফিয়া বইঘর। ঢাকা।

মাহবুবা রহমান (২০১০ খ্রি:) : কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ নূর নবী (২০০৯) : মুসলমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪০০-১২৫৮), বিনুক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন (১৯৯৮ খ্রি:) : হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ।

মাহমুদুল হাসান, খন্দকার (২০০০ খ্রি:) : হিব্রু থেকে ইহুদি, কথা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুল হালিম (১৯৮১ খ্রি:) : গ্রিক দর্শন ; প্রজ্ঞা ও প্রসার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মাহমুদুল হাসান (২০০৬ খ্রি:) : মানব সভ্যতার ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা।

মাহমুদ শামসুল হক (২০০০ খ্রি:) : নারীকোষ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ কাসেম (১৯৮৫ খ্রি:) : ফিনিশিয়া থেকে ফিলিপাইন, সাহিত্যমালা, ঢাকা।

মুহসেন আবুল কাসেমী, তারিখে যাবানে ফারসি (১৩৭৮ সৌরবর্ষ) : ফারসি ভাষার ইতিহাস, কেতাব খানেয়ে যছরি, ইরান।

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী (২০০৯ খ্রি:) : ভারত ইতিহাসে নারী, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা।

রেবতী বর্মণ (১৯৯২ খ্রি:) : সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, প্রকাশ ভবন, ঢাকা।

রেবেকা সুলতানা (২০১০ খ্রি:) : বৌদ্ধ দর্শনে মানবতাবাদ, এমফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রুবেন, লেভী (১৯৯৫ খ্রি:) : সোস্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম (অনুবাদে গোলাম রসুল), মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা।

রুশদী, এ এফ এম আবদুল মজীদ (২০০৮), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), ইফাবা।

রহমান, শেখ লুৎফর (১৯৯০ খ্রি:) : ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
শ্যামুয়েল।

রহীম, আবদুর (২০০৮) : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।

রহমান, নুরুর (১৯৭৭) : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা:), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

শিকদার, মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ (২০০৪ খ্রি:) : হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃস্টবাদে মুহাম্মদ (সা:) ও নারী (প্রকাশক আসাদ বিন হাফিজ), একুশে বইমেলা, ঢাকা।

সান্তার, মো: আবদুস (২০০৪ খ্রি:) : বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ইফাবা, ঢাকা।

সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (১৯৫১ খ্রি:) : সীরাতুননবী, আযমগড়, মাতবা মা'আরিফ, দিল্লী।

সৈয়দ, আলী আহসান (১৯৯৪ খ্রি:) : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসসালাম, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ড. (২০১২) : ইসলামের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরি, ঢাকা।

সাইদ আনসারী (১৩৪১ হিঃ) : সিয়রুল সাহাবিয়াহ, আজমগড়, দিল্লী।

সাইয়েদ ইবনে তাউস (১৯৯৮) : কারবালা ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ:)-এর শাহাদাত, আল-হোসেইনী প্রকাশনী, ঢাকা।

স্যার আর্নল্ড. টমাস ও আলফ্রেড গিলম (২০০০) : পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম *The legacy of Islam* (অনুবাদে নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৯ খ্রি:) : *মনুসংহিতা ভূমিকা অনুবাদ টীকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, কলকাতা।

সালেহা বেগম (২০১৩) : *পথিকৃৎ মুসলমান নারী*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

সুলাইমান ইবনে আহমদ আত-তিবরানী (১৯৮৫) : *আল-মু'জামুস-সগীর*, ১ম খন্ড, আল-মাকতাবাতুল-ইসলামি, দারু 'আম্মান, বৈরুত ;

হিট্রি, ফিলিপ কে (২০০৩ খ্রি:) : *আরব জাতির ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা।

হাবিব, ইরফান (২০১৫ খ্রি:) : *মানুষ ও পরিবেশ ভারতবর্ষের বাস্তবতান্ত্রিক ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা।

হামিদা রহমান (১৯৯৬ খ্রি:) : *অধিকার আন্দোলনে নারী সমাজ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ, ড. (২০০১ খ্রি:) : *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হালিম, আব্দুল ও নুরুল্লাহর বেগম (২০০৮ খ্রি:) : *মানুষের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হাশেমী, তালিবুল (২০০৫ খ্রি:) : *মহিলা সাহাবী*, অনুবাদ-আবদুল কাদের, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

হাসান, মোস্তফা রশিদুল (২০০৪ খ্রি:) : *বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস (অনূদিত)*, ২য় খণ্ড, (সম্পাদনায় : ফ্রান্সের জুললাবুম ও মন্টেন, এ্যাডওয়ার্ড), খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।

হোসেন, দেলোয়ার ও সিকদার, আবদুল কুদ্দুস (২০০৮ খ্রি:) : *সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা।

শিরওয়াইহি, আবু শুজা ইবনে শাহরদার (১৯৮৬ খ্রি:) : *আল-ফিরদাউস বিমাছুরিল খিতাব*, ৫ম খণ্ড, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত।

শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার ও জাহান আরা বেগম (১৪০৫ বঙ্গাব্দ) : *নারীশিক্ষা : উদ্ভব ও বিকাশ [প্রাচীনকাল-বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্বকাল]*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, ড. (২০০১ খ্রি:) : *প্রাচীন ভারতে নারী*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, উন্নয়ন পদক্ষেপ পত্রিকা, ঢাকা হতে প্রকাশিত।

স্ত্রী জাতির অবনতি (১৯৯৯, মার্চ) রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর প্রথম খন্ড, (সম্পাদনায় : আব্দুল মান্নান, সৈয়দ ও অন্যান্য) ।

সিরাজাম মুনীরা (১৯৯২ সাল), ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা ।

সৈয়দ, আলী আহসান (১৯৯৪ খ্রি:) : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসসালাম, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ।

সূয়ুতী, জালাল উদ্দীন (১৯৫১) : আল ইকতান ফী উলুমিল কুরআন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, মিশর ।

হিট্টি, ফিলিপ. কে. (২০০৩ খ্রি:) : আরব জাতির ইতিহাস প্রাক ঐতিহাসিক যুগ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত (সম্পাদনায় তন্ময় ভট্টাচার্য), মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা ।

হিট্টি, পি. কে. (২০০৯ খ্রি:) : আরবের ইতিহাস (দ্য হিস্ট্রি অব দ্য এরাবস), [ভূমিকা ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও খন্দকার মাহমুদ-উল-হাসান কর্তৃক গ্রহিত], জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২০০২ খ্রি:) : বৌদ্ধধর্ম (সম্পাদনায় ড. বারিদবরণ ঘোষ) বইমেলা, কলকাতা ।

হাসান, মোস্তফা রশিদুল (২০০৪ খ্রি:) : বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস (অনূদিত), ২য় খণ্ড, (সম্পাদনায় : ফ্রান্সের জুললাবুম ও মন্টেন, এ্যাডওয়ার্ড), খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা ।

হোসেন, আনোয়ার (২০০৯ খ্রি:) : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ।

মানবজাতির পাপে পতন । ৩য় অধ্যায় । শ্লোক-১১ ।

আদি পুস্তক । মনুস্মৃতি ।

ট্রিবিউন, (২৪/০৭/১৭) : বাংলা অনলাইন পত্রিকা, ঢাকা ।

চাণক্যনীতি ।

স্ত্রী জাতির অবনতি (১৯৯৯, মার্চ) : রোকেয়া রচনাবলী, মতিচূর প্রথম খন্ড, (সম্পাদনায় : আব্দুল মান্নান, সৈয়দ ও অন্যান্য), ঢাকা ।

Abul-Faraj Abdur rahman b. Ali ibn al-Jawji (1904) : *Al-muntazam fil- tarikh*, vol-14, : Dairat al-maarif al-Suthmaniya, Hydrabad.

A. Christensen. Die Iranier (1933) : *Kulturgeschichte des Alten Orients*, Handbuch der Altertumswissenschaft : Munich.

Al-Fassi, Haton (2007) : *Women in Pre-Islamic Arabia*, Nabataea, British Archaeological Reports International Series. British Archaeological Reports.

Al Hamdani, H.F (1934) : *the letters of Al-Mustansir Billah*``Bulletin of the school of oriental and African studies-7, Oxford university press, England.

Al-Khatib Baghdadi (1931) : *Tarikh Baghdad*, vol.6, happiness press, Cairo.

Al-Maqrizi, Ahmed Ibn Ali (2012) : (ed : Karl Stowasser), *Medieval Egypt (Al-Khitat)*, Georgetown University library, USA.

Al Tabari (1901) : *Tarikh Al-Rasul wa al Muluk*, commonly called *Tarikh al-Tabari* (tra. Franz Rosenthal, the history of al Tabari, vol-1, state university of New York, USA.

Armsstrong Karen (1991), Muhammad : *A bibliography of the Prophet*, A Phonix press paperback (First published by Victor Gollancz), Great Britain.

Ameer Ali, Sir syed (1996) : The spirit of Islam [অনুবাদ ড. রশীদুল আলম, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম], মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা ।

Asgar Ali (1992) : *The rights of Woman in Islam*, Stearling publishers, New Delhi.

Batuta, Ibn (1942) : *Travels in Asia and Africa (1325-1254)* translated and selected by H.A.R. Gibb, with an introduction and notes, oriental books reprint corporation, New Delhi.

Bauman, Richard (1992) : *Women & politics in ancient Rome*, Oxford university, Routlege, New York.

Beckwith, Chrisopher (2009) : *A history of central Eurasia from the Bronze age to the present*, Oxford University press, London.

Beck lois & Keddie Nikki (1978) : *Women in the Muslim world*, Harvard university press, London.

Bertram, James (1877) : *Flagellation & the Flagellants (A history of the Rod)*, William Reeves, London.

Bible 1973 : Genesis 3 : 16, New York.

Joseph Blackmore, Josiah & Moorings (1987) : *Portuguese Explanation & the writings of Africa*, University of Minnesota press, USA.

Boat wright & Mary (2005) : *A brief history of the Roman,s*, Oxford university , Routlege, New York.

Boyce, Mary (2001) : *Zorostrians : their religious beliefs and practices*. Routledge, New York.

Burns, Edward McNall & Ralph, Philip Lee (1961) : *World civilization*, vol-1, Oxford university press, London.

Cart & Petry (1990) : *The Cambridge history of Egypt, volume one (Islamic Egypt, 640-1517)*, Cambridge University press, USA.

Chronicles of Seert, 58; 146-7; cf. Fowden.

Cotterell, Arthur (1998) : From Aristotle to Zoroaster, exercised by the Persian king's mother were set by the monarch himself, Free Press, New York.

D.G. Hogarth (1922) : *Arabia*, Oxford at the clarendon press, London.

Diakonoff, I. M. (1985) : "Media", The Cambridge History of Iran 2 (Edited by Ilya Gershevitch ed.), Cambridge University Press, USA.

Doftary. F (1971) : *The Ismailis : their history & doctrines*, Cambridge university press, USA.

Donald C. Richter (1971) : *The position of women in classical Athens, the classical Association of the Middle West and South*, (editor JP Groenewald, University of stellenbosch, Stellenbosch.

Durant, William (1942) : *The story of civilization*, vol-1, our oriental heritage, New York.

Ehsan, Yarshater (1989) : *Persian or Iran, Persian or Farsi*, Iranian studies, vol. xx11 no.1.

Ehsan, Yarshater (1983) : *Cambridge history of Iran the Seleucid, Parthian and Sasanians periods*, USA.

Encyclopaedia of Britanica. Vol.5

Erich F Schmidt (1931) : *The Treasury of Persepolis and Other Discoveries in the Homeland of the Achaemenians*, The University of Chicago press : Chicago, Illionois, USA.

Edger Litt (1961) : *Jewish Ethno-Religious involvement and political liberation*, Special forces, 39 (4), USA

Edward G. Browne (1977) : *A literary history of Persia*, Cambridge University press, London (reprint).

Edward Gibbon (1870) : *The crusades*, Bibliolife publishers, London.

Edward Gibbon (1973) : *Fall of Roman empire*, Vol-2. Frederick Warne, London.

Fichbein, Michael (1997) : tra: Franz, *The history of al-Tabari*, vol-8 : *The victory of Islam*, State university of Islam.

Hamadan- *Wikipedia* (<https://en.m.wikipedia.org>)

Hambly, Gavin R.G. (1999) : *Women in the Mediaval Islamic world : Power, Patronage and Piety*, St. Martin's Presss, New York.

Hans Hehr (1980) : *A dictionary of modern written Arabic*, Beirut.

Humphreys, Robin Stephen (1977) : *From Saladin to the Mongols, the Ayyubids of Damascus 1183-1260*, Suny press, London .

Hermitage Museum (1987) : St.Petersburg Russia, Inv.GL. 987; cf. *Gignoux and Gyselen*.

Humphreys, Robin Stephen (1999) : *Between Memory and desire: the middle East in a troubled age*, University of California Press, USA.

Herodotus (1930) : *The histories*, 1 volume. The library of Alexandria : USA.

Hitti, Philip (1969) : *Makers of Arab History*, Macmillan & co.Ltd. Great Britain.

Humphreys, Robin Stephen (1994) : *Women as Patrons of religious architecture in Ayyubid Damascas*, vol.11, Muqarnas, London .

Ibn Ishhaq's (1981) : *Sirat Rasulullah* (the life of Muhammad a translation of Sirat Rasulullah with introduction and notes by A Guillaume), Oxford university press, New York.

Ibn Saad (1995). Eight volume, *At-Tabaqat Al-Qubra (the woman of Medina)*. translated by Bewly, Toha publishing press, London.

Idem (1997) : "Women's Robing in the Sasanian Era," *Iranica Antiqua* 32.

Earnest E. Harzfield (1992) : *A new inscription of xerxes from Persepolis, the oriental institute of the university of Chicago studies in ancient oriental civilization, the University of Chicago press, Chicago, Illinois.*

Isidore Epsteir (1966) : *Judism A historical presentation*, Penguin books, Baltimore, Maryland.

J. Wellhausen (1927) : *the Arab Kingdom and its fall*, translated by Margaret Graham Weir. Pub : university of Calcutta.

Jacob Hoschander (1923) : *The Book of Esther in the Light of History*. Oxford University Press, London.

Josephus, Ant. Jud.

K. D. Irani, Morris Silver (1995) : *Social Justice in the Ancient World*, Greenwood Publishing Group, Lahore.

Khawla Bint Al Azwar (2001) : *Warriers, Famous Arab woman*, Islam Religion, Horse Animal, MNH Jordan, November 2014.

K.M. Ashraf (1994) : *The life & conditions of Hindustan*. (অনুবাদ তপতী সেনগুপ্ত হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্যা), পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ।

Lakeland, M J (1993) : *The forgotten queens of Islam*, Cambridge university press, USA.

Lapidus, Ira. M (1988) : *Islam, politics and social moments*, American philoshopical society, USA.

Liddell & scott (1882) : *Lexicon of the Greek language*, Oxford University press, London.

Lings, Martin (1983) : *Muhammad : His life based on the earliest sources*. The Islamic texts society, New Delhi.

Malcom C Lyons & D.E.P. Jackson (1982) : *Saladin :The politics of the Holy war*, Cambridge Univer sity press. London.

Mary R. Lefkowitz, Maureen B. Fant (2005) : *Women's life and Rome*, Johns Hopkins University press, USA.

Maria Brosius (1998) : *Women in ancient Persia (559-331 BC)*, Oxford University press, London.

Mansoori, Firooz (2008) : *Studies in History Language and Culture of Azerbaijan (in Persian)*, Tehran : Hazar-e Kerman.

M. Garrison and M.C, Root (1987) : *Seals on the Persepolis Fyortification Tables*. vol. 1 Images of Heroic Encounter. Oriental Institute publications 117 : Chicago.

Macler (1904) : *Histoire Shapur Shahbazi, A (2005) Sasanian dynasty*, Encyclopaedia Iranica, Online edition. Retrived 13 April 2014. Paris.

Mary R. Lefkowitz & Maureen B. Fan (2005) : *Women's life in Greece and Rome*, John Hopkins University press, UK.

Melammed Rene & Livine (2009) : *Women in medieval Jewish societies* (ed. Frederik E Greenpahn). New Work University press, New Work.

Muhammad Ali (1959) : *The religion of Islam*, Ahmadiyya Anjuman publisher house, Lahore, Pakistan.

Muhammad Ali (1991) : *Early Caliphate*, Lahore.

Muhammad Kutub (1977) : *Islam the misunderstood Religion, down to A.D I.I.F.S.O 1397-1977*. International Islamic Federation of Student organizations, Germany.

Plato, *Alc.* I 121C-123 CD.

Plato (1871) : *The dialogues of Plato* (Cratylus). Transtated by Jowett, Benjamin, Macmillan & co, New York.

Plutarc, Vit. Artax, I.

Pospishil, Victor (1975) : *Divorce & Marriage*, London.

Rachal Adler (1999) : *Engendering Judism*, Beacon press, Boston.

Rahim Abdur (1961) : *Mohammadan jurisprudence*, Pahil publications, Karachi.

Richard A Fletcher (2006) : *Moorish in Spain*, university of California press, USA.

R N Frye (1984) : *The History of Ancient Iran*, Handbuch der Alter tums wissen schaft : Kulturgeschichte des Alten Orients 3/7 : Munich,

Rose, J. (1998) : “*Three Queens, Two Wives, One Goddess : The Roles and Images of Women in Sasanian Iran*,” in *Women in the Medieval Islamic world : Power, patronage and piety*, (ed. G. Hambly), New Middle Ages 6, New York.

Robert Gob (1968) : *Sasanian Numismatics*, Original. Brunswick, USA.

Ruggles, D. Fairchild (2000) : *Women, Patronage, and Self-Representation in Islamic societies*, Suny press, London .

S. Khuda Baksh (1980) : *The Arab civilization* (Translated from the German Joseph Hell), Idarahi Adabiyah, Delhi.

Al-Tabari, Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir (1901) : *Tarikh-al-Rasul-ul-Mulk* (ed. Gorge), State university of New York press.

Saudi Aramco world (2016), vol-67, Januay-February, no-1,page-45.

Schmitt, Rudiger (1987). 'Aryans' Encyclopaedia Iranica. Roulledge & Kegan Paul : NewYork.

Shanar, Donald W (1969) : *A Christian view of Divorce*, Leiden.

Porada (1962) : The queen was better known as Shala and the Elamites were partly Semitic-speaking,*The Art of Ancient Iran : Pre-Islamic cultures*. Eds. Cf. E., New York.

The history of Al-Tabari (1993) : *The challenges to the Empires* (translated by Khalid Yahhia), Suny press, New York.

Toran Shahrani Bahrami (2008) : *The social position of women in old Persia* (tra. Vida Bahrami Keyani)-Sydney studies in religion : Open journals online.

T.W.Wallbank, Taylor & Baily (1972) : *Civilization past & present*, Vol-1.Scotland : Forestman com.

Vincent, A, Smith (1981) : *The oxford history of India*, Oxford university press : London.

Reynold Alleyane Nicholson (1966), *A Literary history of the Arabs*, The syndicate of the Cambridge university press, UK.

Sir Thomas Arnold & Alfred Guillaume (2000) : *The legacy of Islam*, the oxford university press, London.

Vincent, A, Smith (1981) : *The oxford history of India*, Oxford university of press, London.

W. Durant (1942) : *The Story of Civilization*, vol. 1. Our Oriental Heritage : [The version apparently derives from a Farsi translation of Durant's work, Eds.] New York.

Wherry, Rev. E. M (1882) : *A comprehensive common arary on the Quran conpraising sales translation and preliminary Discourse*, Houghton, Miffon and company, Boston.

William of Tyre (1943) : *A history of Deeds done of beyond the sea*. Trans E A Babcock & AC Krey, vol.2, Colombia university press,USA.

Young, T. Cuyler (1997) : "Medes", in Meyers, Eric M.,*The Oxford encyclopedia of archaeology in the Near East*. Oxford University Press, London.

Yas Thomas (1991) : *The division of the sexes in Roman law*.`In a history of womens from ancient goddesss to Christians Saints, Harvard Univetsity press.

WWW.livius.org.

Ctesias FGrH 688 F13 ; *Xen. An.* 2.4.8; *Plut. Art.* 27.7; *Diod. Sic.* 14.26.4 ; cf. Brosibus, 1996.

English-Bangla dictionary (2011) : Bangla Academy, Dhaka.

WWW.The rights of women according to Roman law.

<http://populy.us/single-blog/biday-hajj>)

International journal of Middle East studies

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (২০১৪) : বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মে ২০১২।

মুয়াল্লাকাত, বয়ত নং ৪৬,৫৩,৫৫ ও ৫৬।

